শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান

শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স প্রাইভেট্ লিমিটেড
বোম্বাই • কলিকাতা • মাদ্রাজ • নয়াদিল্লী

ওরিয়েন্ট লংম্যান্স প্রাইভেট্ লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩
নিকল রোড, ব্যালার্ড এষ্টেট্, বোম্বাই-১
ক্যানসন্ হাউস, ২৪।১,আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী
৩৬-এ মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ-২
গানফাউণ্ড্রী রোড, হায়দ্রাবাদ
১৭ নাজিমুদ্দিন রোড, ঢাকা

লংম্যান্স গ্রীন এণ্ড কোং লিমিটেড
৬-৭ ক্লিফোর্ড ষ্ট্রীট, লণ্ডন ডব্লিউ-১
এবং
নিউ ইয়র্ক, টরোন্টো, কেপটাউন ও মেলবোর্ণ

প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৬০

দাম—তিন টাকা পঁচিশ নয়াপয়সা

মুদ্রাকর : শ্রীভোলানাথ বোস, বোস প্রেস
৩০, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা-৯

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ নন্দী

অগ্রজপ্রতিমেষু—
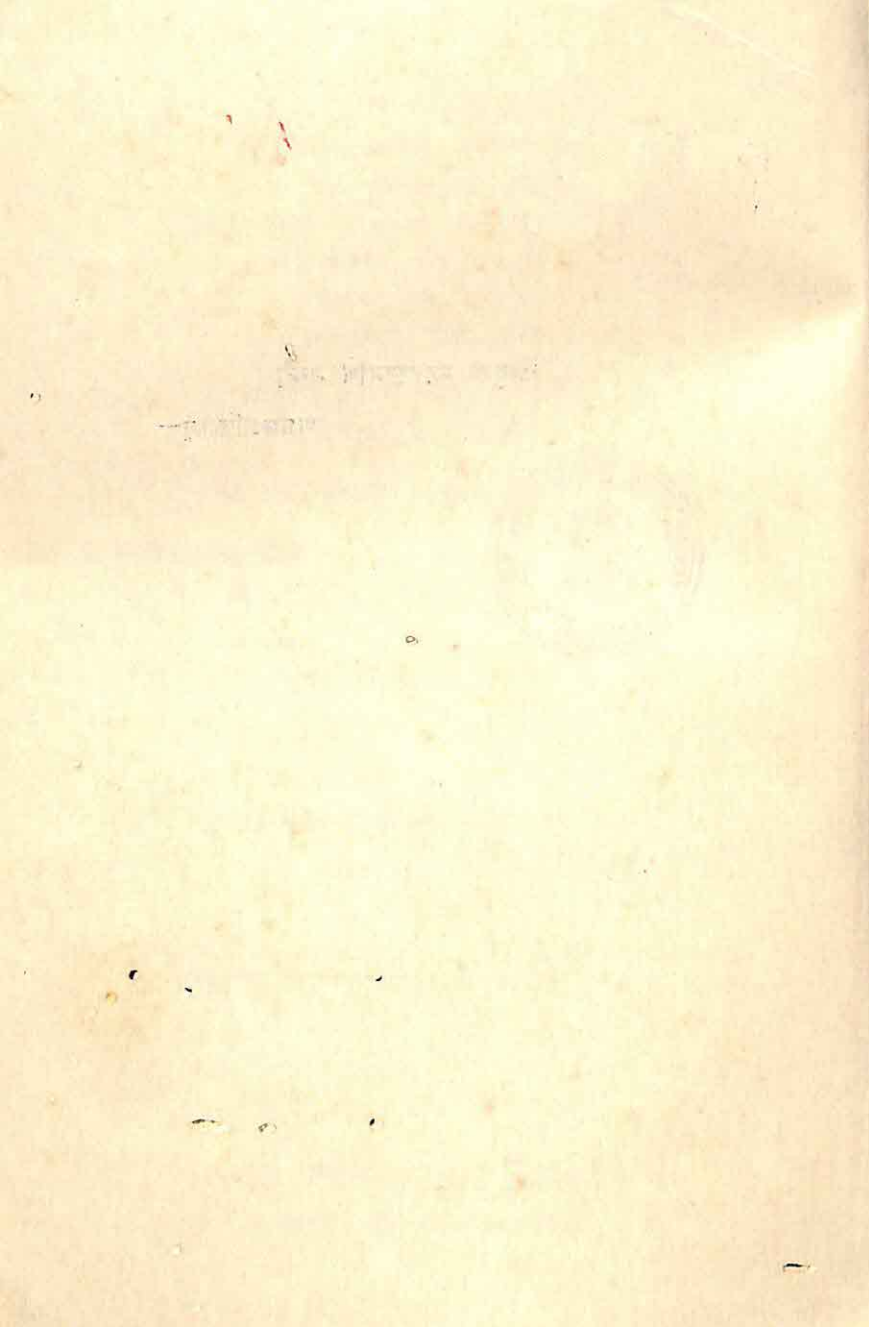
মুখবন্ধ

শাসন-ও-শোষণ-মুক্ত সমাজ গঠন ছিল গান্ধীজীর লক্ষ্য। সেইজন্য তিনি স্বাধীন ও স্বাবলম্বী গ্রাম-সমাজের কল্পনা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, এই সমাজ স্বাধীন হবে এবং সেই স্বাধীনতার ভিত্তি হবে স্বাবলম্বনের উপর। স্বাবলম্বী গ্রাম-সমাজ তার প্রয়োজনীয় অন্ন ও বস্ত্রের জন্য কারও উপরে নির্ভর করবে না। গ্রামের খাদ্য তো গ্রামে উৎপন্ন হবেই, গ্রামের পরিধেয়ও গ্রামেই প্রস্তুত হবে।

আমাদের প্রাচীন গ্রাম-সমাজে তাই ছিল। তখন কৃষির মতই চরকা ভারতের পল্লীজীবনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। গ্রামের অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা কৃষি ও চরকার ভিতর দিয়েই হত। আজ কৃষি ছাড়া গ্রামের কথা যেমন আমরা ভাবতে পারি না, তখনকার দিনে চরকা ছাড়াও গ্রামের কথা আমরা ভাবতে পারতাম না। ইংরেজের বস্ত্রব্যবসায়ের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে চরকা ক্রমে ক্রমে দেশ থেকে লোপ পেয়ে যায়।

আমাদের ছেলেবেলাতেও আমরা জায়গায় জায়গায় চরকা দেখেছি। সেখানে বাড়িতে বাড়িতে কার্পাসের চাষ ছিল, বাড়িতে বাড়িতে চরকা ছিল। মেয়েরা সূতা কাটত, সেই সূতায় গৃহস্থের প্রয়োজনীয় কাপড় তৈয়ারি হত। আমি একদিন একজন গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যে বাড়িতে মেয়েরা সূতা কাটতে জানে না সে বাড়িতে লোকেরা কি পরে? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যে বাড়িতে মেয়েরা রান্না করতে জানে না সে বাড়িতে লোকেরা কি খায়? তখন রান্না করার মতই সূতা কাটা মেয়েদের নিত্য কর্মের মধ্যে গণ্য ছিল। কোন মেয়ে রান্না করতে

জানে না এটা যেমন কল্পনা করা যেত না, কোন মেয়ে সূতা কাটতে জানে না এও তেমনই কেউ কল্পনা করতে পারত না।

গান্ধীজী এই লুপ্তপ্রায় চরকাকে আবার গ্রাম-সমাজে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। শুধু যে গ্রামের শিল্পব্যবস্থায় তিনি চরকাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন তাই নয়, গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থায়ও তিনি চরকাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন।

পৃথিবীর সকল দেশেই আজ শিল্পশিক্ষাকে শিক্ষার একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে গ্রহণ করা হয়েছে। মস্তিষ্কের শিক্ষাই শিক্ষা নয়, মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য হাতপায়ের শিক্ষারও প্রয়োজন। শিল্পশিক্ষার ভিতর দিয়ে এই শিক্ষা যেমন হয় আর কোনভাবে তেমন হতে পারে না। তাই সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাতেও শিল্পশিক্ষার স্থান করা হয়েছে। শিল্প-শিক্ষার উপরেই শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা হচ্ছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে শিল্পকে গ্রহণ করা হবে তার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা দরকার। সেই শিল্পের ভিতরে নানারকমের কাজ থাকবে, যেন ছেলেদের কাছে সেটা একঘেয়ে মনে না হয়। সেই শিল্প শেখা সহজ হবে এবং সেই শিল্পের জন্য এমন পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে না যা ছাত্রেরা করতে পারবে না। সেই শিল্প বেশি ব্যয়সাধ্য হবে না এবং সে শিল্পকর্ম সকল সময়ে ও সকল জায়গাতে করা সম্ভবপর হবে। সেই শিল্প থেকে এমন জিনিস তৈয়ারি হবে, যা শুধু সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়, যা ছাত্রদের প্রতিদিনের ব্যবহারে লাগবে এবং সেইজন্য তাদের মনে একটা আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারবে। এই দিক্ থেকে শিক্ষা-শিল্প হিসাবে বস্ত্র-শিল্পের উপযোগিতা অন্য অনেক শিল্পের চেয়েই বেশি।

গান্ধীজী যখন বস্ত্রশিল্পকে শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কথা বলেন তখন এ সব কথাই তিনি চিন্তা করেছিলেন; কিন্তু তার চেয়েও বেশি

চিন্তা করেছিলেন তাঁর পরিকল্পিত সমাজগঠনের জন্য এর উপযোগিতা। ছাত্রদের তিনি তাঁর আদর্শ সমাজের যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, এবং তার জন্য জীবনের প্রথম থেকেই তিনি তাদের নিজ নিজ প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্রের বিষয়ে স্বাবলম্বী করতে চেষ্টা করেছিলেন।

গান্ধীজীর প্রবর্তিত শিক্ষা স্বাধীন ভারতের জাতীয় শিক্ষারূপে গৃহীত হয়েছে এবং বস্ত্রশিল্পকে এই শিক্ষার প্রধান শিক্ষাশিল্প স্বরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

শিল্পের ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তুই জায়গাতেই আজ সূতাকাটার একটা স্থান হয়ে গেছে। এই সূতাকাটার কাজ ভাল করে করতে হলে কার্পাস সম্বন্ধে এবং সূতাকাটার যন্ত্র ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যে জ্ঞান প্রয়োজন সে জ্ঞান অনেকেরই নাই। সেইজন্য তুই ক্ষেত্রেই সূতাকাটার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। যন্ত্রের মত গতানুগতিক্রমে কাজ করা শিল্পের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক নয়। উৎপাদনের পরিমাণবৃদ্ধির জন্য এবং উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ সম্পাদনের জন্য বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিল্পের অনুশীলন করতে হবে। তা না হলে সেই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা কোনদিনই সম্ভব হবে না। শিল্পকে শিক্ষার মাধ্যমস্বরূপে ব্যবহার করতে হলে তো তার সম্বন্ধে সব কিছু ভাল করে জানতেই হবে। তা না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাকে সার্থকভাবে ব্যবহার করাই যাবে না।

এ সম্পর্কে ভাল বইয়ের একান্ত প্রয়োজন। অন্যান্য ভাষায় এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বই আজকাল লেখা হয়েছে। কিন্তু বাঙলা ভাষায় এ বিষয়ে ভাল বই একরকম নাই বললেই হয়।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ গান্ধীজীর অনুরাগী এবং তাঁর আদর্শে বিশ্বাসবান। অপরদিকে তিনি নানাপ্রকার শিক্ষাশিল্পে বিশেষজ্ঞ শিল্পী। তিনি নিষ্ঠা-সহকারে এইসব শিল্প শিক্ষা করেছেন। তিনি তাঁর এই বইখানিতে তুলার

চাষ এবং স্থতাকাটার সম্বন্ধে নানারকম তথ্যের সমাবেশ করেছেন। এ তাঁর বই-পড়া বিদ্যা নয়, তাঁর দীর্ঘ শিল্পী ও শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতার ফল। শিল্পের ক্ষেত্রেই হোক আর শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক, যাঁরা স্থতাকাটার কাজ করবেন বইখানি তাঁদের খুবই কাজে লাগবে।

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য

ভূমিকা

কৃষিযুগের মধ্যেই বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় সর্বত্র যন্ত্রযুগ আসিয়া পৌছিয়াছে। এখনকার জগতের বড় সমস্যা উভয়যুগের সামঞ্জস্য বিধান। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে আজ এইটাই সমাজে ও রাষ্ট্রে সকলের চেয়ে বড় সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী যখন ১৯৩৭ সালে বুনিয়াদি শিক্ষা ও নঈ তালিমের প্রবর্তন করেন তখন সমন্বয়ী পদ্ধতিতে সামগ্রিক শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, প্রাচীন পুঁথিগত শিক্ষার সহিত বর্তমানের কর্মজাত শিক্ষার মিলন ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন কাঠের কাজের সহিত সমন্বয় করিয়া কিরূপে এই নূতন ভাবের শিক্ষাব্যবস্থা করিতে হইবে তাহার বিধি-বিধান প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহকে আহ্বান করিয়াছিলেন ও তাঁহার সহায়তার কাঠের কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয়ী পদ্ধতিতে সামগ্রিক পাঠ্যক্রমের রূপ কি-রকম হইবে তাহা নির্ধারিত হইয়াছিল। আজও মোটামুটি সেই পাঠ্যক্রম চলিয়া আসিতেছে।

বর্তমান গ্রন্থে বন্ধুবর শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ কার্পাসশিল্পে এই সমন্বয়ী পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়া সেখানে কি-ভাবে সামগ্রিক পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা যায় তাহারই বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে আলোচনা করিবার তাঁহার চেয়ে অধিকতর যোগ্যতা আমাদের দেশে কম লোকেরই আছে। তিনি কৈশোরে নিজের পিতার কাছে এই নূতন শিক্ষাধারায় দীক্ষিত হইয়া যৌবনে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী দুই জনেরই নিকট অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। পরে বিদেশে শিক্ষা লাভ করিয়া এবং সারা জীবন এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করিয়া তাঁহার নিজ মতবাদ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুদৃঢ় করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আজ

তাঁহার সারা জীবনের অভিজ্ঞতপ্রসূত দৃষ্টি লইয়া কার্পাসশিল্প কিভাবে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত ও বিশদ বিবরণ লিখিয়া তিনি তাঁহার ঋণ শোধ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও ঋণী করিয়াছেন। ইহার জন্য দেশবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। আমি এই সুযোগে আমাদের দেশের শিক্ষকসমাজের পক্ষ হইতে তাহাকে অভিনন্দন জানাইয়া সানন্দে এই ভূমিকার উপসংহার করিলাম।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

বিনয় ভবন, শান্তিনিকেতন
অক্টোবর, ১৯৫৯

গ্রন্থকারের নিবেদন

এই গ্রন্থে শিক্ষামূলক শিল্প বা শিক্ষাশিল্পের অগ্রদূত ও প্রবর্তকদের শিক্ষাদর্শন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কার্পাস-বিজ্ঞানের স্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

শাস্ত্রোক্ত পঞ্চঋণের মধ্যে গুরুঋণ অন্যতম। এই ঋণ অপরিশোধ্য। তথাপি গুরুর আদেশ পালন করিলে কিয়ৎ পরিমাণে ইহার লাঘব হয়। এই গুরুবাক্য প্রতিপালনের প্রেরণা হইতে বর্ত্তমান গ্রন্থের সূত্রপাত। এই গ্রন্থ-রচনার একটি ইতিহাস আছে। তাহা কেবল ব্যক্তিগত জীবনের অধ্যায়মাত্র নহে, পরন্তু ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসের সহিত তাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত।

১৯২১ সালের দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে আমি জাতীয় বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে আসি। ঐ সময়েই খাদির প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হই। তখন রাজনৈতিক উত্তেজনাই সমধিক ছিল। সেই সময়ে কংগ্রেস কর্তৃক চরকার পুনঃপ্রবর্তন হয়। সেই জন্য চরকা বা সূতাকাটাকে এখনও অনেকে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসী আন্দোলনের সহিত অবিচ্ছেদ্য বলিয়া জানেন। প্রকৃত পক্ষে চরকা আমাদের দেশের এক অতি প্রাচীন সম্পদ। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে চরকা আন্দোলনের ব্যাপক বন্যার সময় আমি বিদেশে শিক্ষাশিল্পচর্চায় নিযুক্ত ছিলাম। সেইখানেই সূতা কাটা ও বয়নশিল্পের শিক্ষানৈতিক মূল্যের প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। সেই সূত্রেই ১৯৩৪ সালে বয়নকার্যে পারদর্শিনী সুইডেনের দুইজন বিখ্যাত মহিলাকে বিশ্বভারতীতে প্রেরণ করি। আমি ১৯৩৬ সালের শেষ-

ভাগে দেশে ফিরিয়া অবধি শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি। অত্যাবশ্যক দেশীয় শিল্পসমূহকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহারের উপায় অন্বেষণ করিতেছি এমন সময় ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধা শহরে এক শিক্ষাসম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ পাই। জাতির জনক স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর এই আহ্বানে সম্মেলনস্থলে উপস্থিত হইতে হইল। তিনি সেইখানে বুনিয়াদি শিক্ষাপরিকল্পনা উপস্থাপিত করিলেন। ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে এই ঘটনা চিরস্মরণীয়। শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন পদ্ধতি প্রবর্তনের সূচনাতেই ইহার সহিত যুক্ত হইলাম।

বুনিয়াদি শিক্ষাপরিকল্পনায় চরকা ও তকলিতে সূতাকাটা এক নূতন অর্থ ও সম্ভাবনা আনিল। এতদিন যাহা ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের অঙ্গমাত্র, বুনিয়াদি পরিকল্পনায় তাহাই হইল দেশের সার্বজনীন শিক্ষার অপরিহার্য ভিত্তি। কার্পাসশিল্পের এবংবিধ ব্যবহারের মূলে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিক অর্থনীতি জড়িত কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই পুনঃ-প্রবর্তন ব্যাপারে গান্ধীজীর সক্রিয় ভূমিকা থাকায় কার্পাসশিল্প শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনেরই পরিপূরকরূপে গণ্য হইতে লাগিল। ফলে যান্ত্রিক ভাবে সূতাকাটার ব্যাপারটাকে অনেকেই বুনিয়াদি শিক্ষার দিনকৃত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেন। কার্পাসশিল্পের ইতিহাস জানা না থাকায় এই ভ্রান্ত ধারণার সম্পূর্ণ নিরসন আজও হয় নাই।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সূতাকাটার যে ভূমিকাই থাকুক না কেন শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। গান্ধীজীর নিকট থাকিয়া বুনিয়াদি শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার কালে এই সত্য বারংবার উপলব্ধি করিয়াছি। শিক্ষাক্ষেত্রে সূতাকাটার নীরস যান্ত্রিকতা আশঙ্কা করিয়াই তিনি সূতাকাটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত কার্পাসশিল্পকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শিখাইবার উপর জোর দিয়াছিলেন। কেবল সূতাকাটার মাধ্যমেই তকলি ও চরকার

শিক্ষা সম্পূর্ণ নহে। সূতার সহিত কার্পাসের চাষ, তুলার গুণাগুণ, কার্পাস শিল্পের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ইহা না জানিলে এই শিক্ষাশিল্পের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে, সৃজনী শক্তির বিকাশে সহায়তা করে না, সূত্রউৎপাদনে প্রগতি আনে না। ফলে ইহার নৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল্যও স্বীকৃত হয় না। যে কোনো শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সেই শিল্পের প্রত্যক্ষ ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ অপরিহার্য এবং সেই শিল্পশিক্ষা সূত্রেই দেশের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় সাধিত হইতে পারে। হস্তশিল্পের সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে জড়িত অধীত বিষয়ের জ্ঞানের সমন্বয়ই বুনিয়াদি শিক্ষার মূল লক্ষ্য। আবার কোনো শিল্পই এককভাবে স্বয়ংপূর্ণ নহে। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে পরস্পরের আন্তর্যোগ আছে, সেই কারণেও কোনো শিল্পকেই বিচ্ছিন্নভাবে দেখা চলে না। এ বিষয়ে গান্ধীজীর সহিত আলোচনা হইলে তিনি কার্পাসশিল্পের বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ ও প্রয়োগে উৎসাহ দেন। সেই উৎসাহই আমাকে এই গুরুদায়িত্ব বহনে নিযুক্ত করিয়াছে। তাহার পর হইতে দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশের বিভিন্নস্থান পরিভ্রমণ এবং বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন ও আলোচনাপূর্বক তথ্যাদি সংগ্রহে তৎপর হই। এমনইভাবে কার্পাসশিল্পের বিস্তৃত ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। এই ইতিহাস ও বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া বিদ্যালয়ে সূতাকাটা শিক্ষা কেবল অসঙ্গত নয়, অসম্ভবও বটে।

কোনো শিল্পকর্মের জ্ঞানার্জন বা পদ্ধতিনিরূপণ বস্তু ও পরিবেশ নিরপেক্ষ নয়। শিল্পকে বাস্তব পরিবেশগ্রাহ্য করিয়া তুলিবার প্রেরণায় আমি ১৯৪৪ সালে আমার স্বগ্রামে এক পল্লী-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করি। উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, পল্লীতে শিল্পের পরিবেশ রচনার দ্বারা অতি সহজেই গ্রাম্যজীবনে শিল্পশিক্ষার বিস্তার সম্ভব।

এই গ্রন্থে আমাদের এই বৃহৎ দেশের প্রাচীন কার্পাসশিল্পের সরঞ্জাম ও

উপকরণাদির আলোচনা করা হইয়াছে। সরঞ্জামের বিবর্তন আলোচনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র শিক্ষায়তন, কারণ ইহা দুইটি শিক্ষানৈতিক উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। একপক্ষে ইহা সরঞ্জামাদির জ্ঞানকে পুষ্ট করিয়া তোলে, ইহাদের উৎকর্ষসাধনে চিন্তাকে উদ্বোধিত করে, আর অপরপক্ষে এরূপ নৃতাত্ত্বিক আলোচনা দেশের কার্পাসশিল্পের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্পর্কে চিত্তকে সজাগ করিয়া তোলে।

নিজের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া এই গ্রন্থের শেষাংশে শিল্পশিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীর কাজের মাননিরূপণপদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এই পদ্ধতির প্রতি আমি বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। শিক্ষাশিল্পের ক্ষেত্রে মামুলি পরীক্ষাপদ্ধতি একেবারেই অচল। কোনো একটি বিষয়ে অপটু শিক্ষার্থীকে মাত্র একদিনের পরীক্ষায় একেবারে অকৃতকার্য বলিয়া বাতিল করা অসঙ্গত। ইহা জাতীয় ক্ষতির কারণ ঘটায়। বিদ্যার্থীর দৈনন্দিন কাজকে ভিত্তি করিয়া সচল দৃষ্টিভঙ্গীতে নূতন পরীক্ষাপদ্ধতি প্রণয়ন এখন প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য হওয়া আবশ্যক।

এই গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহের কাজে যাঁহাদের সান্নিধ্য ও অভিজ্ঞতা আমার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করিতে সাহায্য করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে নিখিলভারত কাটুনি সঙ্ঘের পরলোকগত কৃষ্ণদাস জাজু ও নালওয়ারী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য বিনোবা ভাবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; তালিমি সঙ্ঘের শ্রীযুক্তা আশাদেবী ও শ্রীআর্যনায়কমের নামও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। শিক্ষাব্রতী ডক্টর জাকির হোসেনের উৎসাহ ও উপদেশ আমার অন্তরে সর্বদা প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের সাহচর্যে আমার চিন্তাধারা নানাভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ নালওয়ারী আশ্রমবাসীদের নিকট অবস্থান করিবার সময় আমি তকলি বিষয়ে বিশদ বিচার করিবার সুযোগ পাইয়াছি। বিভিন্ন চরকা ও তকলিতে কর্তিত সূতার মান নির্ণয় এবং প্রত্যক্ষ গবেষণার কাজে আমার প্রধান সহযোগী ছিলেন শ্রীবিনোবার আদর্শে

অনুপ্রাণিত আমার পরলোকগত অনুজ ভক্তেশ্বর সিংহ। তাঁহার সানন্দ সহযোগ ভিন্ন আমার পক্ষে একা এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর হইত না। আজ তাঁহাকেও স্মরণ করি।

১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির খসড়া প্রস্তুত করি। আমি তখন নঈতালিম-ভবনে কর্মরত ছিলাম। তাহার পর কয়েকবার কর্মস্থান পরিবর্তন, দেশবিভাগ এবং আমার অসুস্থতার দরুণ গ্রন্থরচনার কাজ প্রায় বন্ধ থাকে। তাহা ছাড়াও দেশের তৎকালীন অবস্থায় এজাতীয় কাজের যোগ্য আশ্রয়ভূমি আমার জীবদ্দশায় আসিবে কিনা সে বিষয়ে মনে সংশয় দেখা দিত। কিন্তু সেই হইতে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পরে আজ স্বাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে সেই কাজের বহুতর সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সূতাকাটা আজ শিক্ষাশিল্প (Educational craft) হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। সামগ্রিকভাবে শিল্পশিক্ষাও সরকারী শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাইয়াছে। পনেরো ষোলো বৎসর পূর্বে যে কাজ কয়েকজন মাত্র উদ্যোগীর ব্যক্তিগত গবেষণার বিষয় ছিল, আজ তাহাই এতদ্দেশীয় শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত হইয়াছে এবং বহু বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমেও সম্মানের স্থান পাইয়াছে। ইহা দেখিয়া আজ নিজের শ্রম সার্থক ভাবিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেছি। কিন্তু যাঁহার প্রত্যক্ষ নির্দেশ এই গ্রন্থ রচনার কারণ-স্বরূপ সেই বাপুজির হস্তে ইহা তুলিয়া দিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ অনুভব করিতেছি। তবুও এই গ্রন্থ শিক্ষাব্রতীদের উপকারে আসিবে এবং অচিরে এই শিল্পশিক্ষাবিজ্ঞান দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থান করিয়া লইবে এই বিশ্বাসে আমার এই অর্ঘ্যখানি সহৃদয় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করিলাম।

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সহজবোধ্য করার মানসে তক্‌লি, চরকা প্রভৃতির ফটোগ্রাফ ও রেখাচিত্রাদি দেওয়া হইয়াছে। মগন সংগ্রহালয়ের অনুমতিক্রমে

প্রাচীন কয়েকটি চরকার ফটো লওয়া হইয়াছে। আমার প্রাক্তন সহকর্মী শ্রীসত্যেন ভাই বিভিন্ন ভঙ্গীতে তকলি চালনা কালে তাঁহার নিজের ফটো তুলিতে দিয়াছেন। "উদ্বোধন" ও "শিক্ষা" পত্রিকার সম্পাদকদ্বয়ের অনুগ্রহে এই গ্রন্থের অংশ-বিশেষ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাদের সকলের সহযোগিতালাভে আমি আনন্দিত, প্রত্যেকের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন আমাদের প্রাক্তন ছাত্র—অধ্যাপক শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। সুসাহিত্যিক শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব প্রেসপ্রুফ দেখিয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীক্ষিতীশ রায় এই গ্রন্থ প্রকাশে সর্বদা উৎসাহ ও প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য মুখবন্ধ এবং স্বনামধন্য শিক্ষাশাস্ত্রী অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু মহাশয় বইখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ইহাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

শ্রীযুক্ত রয় নর্থ মহোদয়ের আগ্রহে ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া আমার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হউক। অলমতিবিস্তরেণ।

বিনয়ভবন
বিশ্বভারতী
১লা মে, ১৯৬০

বিনীত
শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

সূচীপত্র

শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস-বিজ্ঞান

ভারতের শিক্ষা-প্রগতিতে শিল্পের স্থান

শিল্প-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

দেশের প্রচলিত বিদ্যালয়ে দেহ ও মনের সহযোগিতার শিক্ষার অভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন :

"দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের প্রচলিত শিক্ষার প্রথায় আমরা সাধারণতঃ পুঁথিগত কয়েকটি বিষয় বাছাই করে নিয়ে আর সমস্তকে অস্বীকার করি। পাশ্চাত্ত্য সমাজে বিদ্যালয়ের বাহিরেও নানা উপায়ে স্কুল-কলেজ শিক্ষণীয় বিষয়ের অভাব পূরণ করে দেয়। আমাদের দেশে স্কুল-কলেজের বাহিরে ছাত্রদের অন্য শিক্ষার ক্ষেত্র নেই বললেই হয়। তাই নোট-নেওয়া মুখস্থ-করা বিদ্যায় তাদের মন যে পরিমাণ বস্তু পায়, সে পরিমাণ খাদ্য পায় না।"

"দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহলে মনের শিক্ষার প্রবাহও বেগ পায় না। অনেক ছেলেকে ক্লাসে জড়বুদ্ধি দেখি; তার কারণই এই যে, শিক্ষার ব্যাপারে তাদের দেহের দাবী কোনই আমল পায় না। সেই অনাদরে তাদের মনের দৈন্য ঘটে।"

দেহের চর্চা ও হাতের কাজ সম্পর্কে তাঁহার অভিমত : "দেহের চর্চা বলতে আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চা বলছিনে। দেহের দ্বারা আমরা যে-সব কাজ করতে পারি সেইসব কাজের চর্চা—যে চর্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয়, তার জড়তা দূর হয়—সেই সব কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের যোগ হয়—সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের সহায়তা ঘটে। আমার

মত এই যে, আমাদের আশ্রমে প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষভাবে কোন না কোন হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ করে দেওয়া চাই। আসল কথা, এই রকম দৈহিক কৃতিত্বের চর্চায় মনও সজীব হয়ে উঠে। যে সব ছেলেকে আমরা নির্বোধ বলে মনে করি তাদের অনেকেরই সুপ্ত চিত্ত এই দৈহিক কর্মদক্ষতার সোনার কাঠির স্পর্শ অপেক্ষা করে আছে। দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ করে নেয়। তাছাড়া যার দেহ শিক্ষিত হয়নি সে যত বড় পণ্ডিতই হোক সংসারক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত হয়ে জীবন ধারণ করতে হয়—সে অসম্পূর্ণ মানুষ। এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকে বাঁচাতে হবে। এ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ কোন কোন অভিভাবকের কাছ থেকে আমরা বাধা পাব; কিন্তু সে বাধাকে স্বীকার করা আমাদের কর্তব্য হবে না।”

শিক্ষাশিল্পের নবজীবন

আদর্শ, পূর্ণাঙ্গ ও আবশ্যিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্প-শিক্ষাদানের স্থান সকল সভ্য দেশে স্বীকৃত হইলেও এদেশে বুনিয়াদি শিক্ষানীতি প্রবর্তনের পূর্বে আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান সুনির্দিষ্ট ছিল না। পরাধীন ভারতবর্ষে বিদেশী শাসকেরাই এ দেশবাসীর শিক্ষানীতি, শিক্ষাপদ্ধতি ও তাহার প্রসার নিয়ন্ত্রণ করিতেন। আবশ্যিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনে বিদেশী শাসকের দান অতি সামান্যই। বুনিয়াদি শিক্ষা দেশে প্রবর্তিত হইবার পর বিগত অল্পাধিক কুড়ি বৎসরের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান ও মান—সবেমাত্র বাস্তব ও ব্যাপক রূপ লইতেছে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশের স্থানে স্থানে ‘জাতীয় বিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ১৯২১ সালে অসহযোগ-আন্দোলনকালে ভারতের সর্বত্র জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

তখন স্বাধীনতাকামী স্বদেশহিতৈষী শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে জাতীয় বিদ্যালয়সমূহে শিল্প-শিক্ষাদানের একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা দেখা গিয়াছিল এবং বহু জাতীয় বিদ্যালয়ে নানাবিধ শিল্প শিক্ষা-দানের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। তখনও শিল্পশিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিতে দেশ সক্ষম ছিল না। গান্ধীজীর নেতৃত্বে বুনিয়াদি শিক্ষার কার্যক্রম রচনার পর, স্বাধীন দেশে শিল্পমাধ্যমে শিক্ষার পথ অনেক সুগম ও সহজ হইয়াছে।

শিক্ষাশিল্পদর্শন

শিল্পের যথাযথ চর্চা সাধারণ শিক্ষার কতখানি উৎকর্ষ সাধন করে তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে শিক্ষাব্রতীকে শিল্পজ্ঞান ও শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিতে হয়। শিল্পজ্ঞান যেমন একটি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে অবস্থিত, শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগও তেমনি একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। এই স্বতন্ত্র বিজ্ঞান আবার শিল্পজ্ঞান-নিরপেক্ষ নহে; অর্থাৎ শিল্পবিশেষের জ্ঞান ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদিগকে ইহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি—এই দুইটি বিজ্ঞান একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষানীতি-সম্মত শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চাকে আমরা 'শিক্ষাশিল্প' বলিয়া অভিহিত করি। শিক্ষাশিল্প সৌন্দর্যচর্চার তাগিদ আনে, সেই তাগিদে বিদ্যার্থীর কল্পনা বিকশিত হয় এবং কর্মের মাধ্যমে তাহা রূপ পায়।

যে রহস্যময় প্রকৃতির কোলে মানুষের বাস, সে প্রকৃতি হইতে মানুষের জীবনকে পৃথক করিয়া রাখা বা দেখা যায় না, আর যে প্রকৃতি হইতে আমরা বাঁচিবার জন্য খাদ্যবস্তু আহরণ করি, আমাদের সৌন্দর্য-পিপাসা চরিতার্থ ও প্রয়োজন মিটাইবার এবং গৃহাবাস-নির্মাণের উপাদান সংগ্রহ করি, সেই প্রকৃতি ও প্রকৃতিদত্ত বস্তুবিজ্ঞান শিক্ষাশিল্পের সহযোগে চর্চা করিলে আমাদের সমগ্র জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর

হয়; আমাদের জীবনের শিক্ষাকে সম্পূর্ণতর করিতে পারে; শিক্ষাশিল্পের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যাপকতা তখন উপলব্ধিতে আসে। শিল্পকার্যে যখন শিল্পীর চৈতন্যসত্তা ফুটিয়া উঠে তখনই শিল্প বিশেষ রূপ লাভ করে। বিদ্যার্থী কাজের মাধ্যমে বিজ্ঞানময় প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, আনন্দের মধ্যে বিচরণ করিবে, ইহা শিক্ষাশিল্পের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

যাহারা শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট কাঠের কাজ শিখিয়াছে, তাহারা বনে জঙ্গলে অরণ্যে গাছের গঠন কিভাবে প্রকৃতি-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা বুঝিতে সমর্থ। ইহার চর্চা গভীর হইলে শিল্পশিক্ষার্থীর চিন্তা শুধু কাঠেই নিবদ্ধ থাকে না, তখন ইহা কোষময় বৃক্ষজীবন ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে মনকে আকর্ষণ করে, বৃক্ষ সম্বন্ধে এই আনুপূর্বিক জ্ঞান প্রকৃতির বিচিত্র লীলার প্রত্যক্ষ অনুভূতি বিদ্যার্থীর জীবনে বহন করিয়া আনে। অজ্ঞ আদিম মানব হয়তো তাহা জানিত না; সেজন্য বন-জঙ্গল তাহার ভীতির উদ্রেক করিত। কাঠের কাজের উপাদান—গাছ সম্পর্কে ইহা যতখানি সত্য, অন্য সকল মৌলিক শিল্প সম্বন্ধেও ঠিক তাই। বস্ত্র আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য বস্তু। বস্ত্র ভিন্ন মানবসভ্যতা প্রায় কল্পনা করিতে পারা যায় না। বিভিন্ন ধাতুর আবিষ্কার ও ইহাদের ব্যবহার মানবসভ্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আসল কথা এই যে, শিল্পচর্চা প্রকৃতিজাত বস্তুর সঙ্গে মানবজীবনের প্রকৃত সম্পর্ককে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ করিয়া তোলে। তাছাড়া শিল্পচর্চার মাধ্যমে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির যথার্থ ব্যবহার হয় আর এরূপ দৈহিক চর্চার মূল্য ব্যক্তির জীবনে অসাধারণ; কারণ ইহার ফলে সুপ্ত সৃজনী শক্তির উন্মেষ হয়। সেইজন্যই বোধ হয় আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, বিশেষ যুগের শিল্পপ্রগতি সেই যুগের সভ্যতাবিশেষের উৎকর্ষাপকর্ষের একটি মাপকাঠি

বলিয়া বিবেচিত হয়। কর্মীর চৈতন্যসত্তা কর্মে প্রকাশিত হইলেই কর্মও সজীব হইয়া উঠে।

পুঁথিগত জ্ঞান ও কর্মবিজ্ঞান

যথাযথভাবে জীবনে কোন কর্মের বিষয়ে জ্ঞানার্জন ও আনন্দ পাইতে হইলে সেই কর্মের চর্চা করিতেই হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজনও সেইখানে ; বিদ্যালয়ে উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট এই 'অভ্যাস' আয়ত্ত করা প্রয়োজন। কিন্তু শিল্পজ্ঞান-চর্চার অভ্যাস নিছক পুঁথিগত হইলে কর্মবিজ্ঞানটির সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতার অভাব থাকিয়া যায়। অভিজ্ঞতা দ্বারা কাজের গুণাগুণ ও উপকারিতা অনুভূত হইলে পুঁথির জ্ঞানও আলোকপ্রাপ্ত হয়, সমৃদ্ধ হয়। আজ কর্ম-বিজ্ঞান ও পুঁথিজাত জ্ঞানকে পরস্পরের পরিপূরক করিয়া প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনক্ষেত্রে শিক্ষাকে, অন্য ভাষায় শিক্ষার্থীর জীবনকে পূর্ণতর করিয়া তুলিবার তাগিদ আসিয়াছে। কর্মচেতনা ও জ্ঞানের সমন্বয়ে শিক্ষানীতি-সম্মত পথে মূল শিল্পসমূহকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করিলে ব্যক্তির, দেশের ও সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জীবন সমৃদ্ধ হইবে, আর আমাদের প্রাচীন নিজস্ব ঐতিহ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি সহজ হইবে, মহত্তর অর্থনীতির ভিত্তি সমাজে সুদৃঢ় হইবে, এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের ভবিষ্যৎ নূতন আলোকপ্রাপ্ত হইবে।

শিক্ষায় শিল্প-নির্বাচন

এক একটি শিল্পকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার কাজে যথার্থ প্রয়োগ করিতে গিয়া এক একজন শিক্ষাব্রতীকে বহু গবেষণা ও মনন করিতে হইয়াছে। যাঁহারা পাশ্চাত্যদেশের শিক্ষাবিদ্ ফ্রোয়েবেল, মন্তেসরি, সালোমন প্রভৃতির শিল্পশিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা এ কথার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শিল্প-নির্বাচনে দেখিতে হইবে, বিদ্যার্থীর বয়স, বিদ্যা গ্রহণ

করিবার ক্ষমতা, তাহার কল্পনার বিকাশ ও রূপ এবং সেই সঙ্গে শিল্পবস্তুর সার্বজনীন মৌলিক ও শিক্ষানৈতিক আবশ্যকতা। শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্প নির্বাচনের ইহাই হইবে মাপকাঠি। যে শিল্পবস্তু সকলের দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য, যাহা করিতে গেলে হস্ত-নৈপুণ্যের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি সচল হয়, জ্ঞানের চর্চা হয় এবং যে শিল্পের উপাদান সহজলভ্য সেই শিল্পকেই সার্বজনীন মৌলিক শিক্ষাশিল্প বলা চলে।

হাতির দাঁতে মনোরম বস্তু তৈরী করা যায়, এই শিল্পে শিক্ষণীয় উপাদান আছে, সৌন্দর্যের চর্চা ইহাতে হয়, যেখানে হাতির দাঁত সহজে প্রাপ্য সেখানে তাহা হইতেও পারে কিন্তু দেশময় হাতির দাঁতের কাজ প্রবর্তন শিল্পশিক্ষা-দানের ক্ষেত্রকে কতখানি সীমাবদ্ধ করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

সভ্যদেশসমূহের বিদ্যালয়ে কাঠের কাজ, লৌহ ও অন্যান্য ধাতুর কাজ, বয়ন, সেলাই ইত্যাদি শেখানো হইয়া থাকে। কারণ এইসকল শিল্পের সঙ্গে আমাদের জীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও জানা যায়—যে শিল্প-উপাদান যে দেশে যত সহজে প্রাপ্য, সেই দেশের শিল্পজীবনে সেই উপাদানই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেরুপ্রান্তবাসী ল্যাপদের শিল্পজীবনে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ল্যাপরা সাধারণতঃ বল্‌গা হরিণ পালন্‌ করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করে। ল্যাপদের শিল্পকলার প্রধান উপাদান বল্‌গা হরিণের শিং, হাড়, চামড়া ইত্যাদি। এমনকি বল্‌গার পাকস্থলীকে পর্যন্ত তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। সুইডেনের অন্তর্গত ল্যাপ বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সুইডদের অনুরূপ, কিন্তু বিদ্যালয়ের হস্তশিল্পের বেলায় বলগার শিংই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আসল কথা, যে দেশে প্রকৃতিজাত যে উপাদান যত সহজে লভ্য, তাহাই সাধারণতঃ সে দেশের জনশিল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতের মত সুবৃহৎ দেশের স্থানে স্থানে

এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমরা জানি বিদেশী বণিক শাসকদের অত্যাচারে এদেশের অতি-ব্যাপক কার্পাস-শিল্প ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। তা সত্ত্বেও ভারতের পূর্বাঞ্চলে আসামের ও মণিপুরের ঘরে ঘরে "মণিপুরী তাঁত" এখনও সক্রিয়। সেখানে গৃহকন্যাকে গৃহকর্মে সুনিপুণা করিবার জন্য যে সকল কাজকর্ম শিখিতে হয়, তন্মধ্যে মণিপুরী তাঁতের ব্যবহার একটি। সাধারণতঃ এইরূপ বিশেষ শিল্প দেশের স্থানবিশেষের শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। এদেশের কার্পাস-শিল্প একটি ব্যাপক শিল্প, এই শিল্পের ধারা এদেশবাসীর মজ্জায় মজ্জায় রহিয়াছে; তা না হইলে কলের যুগে খাদি-আন্দোলন এত ব্যাপক হইতে পারিত না। এই দৃষ্টি-ভঙ্গি লইয়া শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বজন-শিক্ষণীয় শিল্প নির্বাচন করিতে গেলে কার্পাস-শিল্পের ন্যায় প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় শিল্প দেখা যায় না।

বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা উপস্থিত করা কালে গান্ধীজী নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসঙ্গে তকলি দ্বারা শিক্ষা আরম্ভ করার উল্লেখ করিয়াছিলেন। ডক্টর জাকীর হোসেন তখন যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহাও এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

"তকলির মাধ্যমে আমাদিগকে সকল বিষয় শিখাইতে গেলে আমরা অনভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা কাজ চালাইতে পারিব না। আমি নিজে একজন শিক্ষক, আজ যদি আমাকে তকলির মাধ্যমে সকল বিষয় শিখাইতে হয়, তবে আমাকে বিপুল বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু আমার হাতে যদি এরূপ পুস্তক থাকে, যাহাতে কাপড় বোনার বিভিন্ন ধারার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়ের সমন্বয় প্রদর্শিত, তবে সেই পুস্তকের সহায়তায় আমি আমার ছাত্রদিগকে শিখাইতে পারিব। এরূপ পাঠ্যপুস্তক-রচনা সময় ও শ্রম-সাপেক্ষ।"

কার্পাস-শিল্পকে শিক্ষার বাহন করিতে যে সকল প্রতিবন্ধ রহিয়াছে,

শিক্ষাবিদ্ ডক্টর সাহেব তখনই তাহা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় গত পনের বৎসরে কার্পাস-শিল্প সম্বন্ধে কয়েকখানি বই বাহির হইয়াছে, খানকতক পুরাপুরি দেশবাসীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাও যথেষ্ট নহে। শিক্ষার উপযোগী সাহিত্য তখনই রচিত হইতে পারে, যখন গবেষণাত্মক কাজ সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত শিক্ষাদানের পথ দেখাইতে সমর্থ হয়।

বিবিধ শিল্পের সম্বন্ধ নির্ণয় ও ইহাদের সমন্বয়

শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান ও ইহাদের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ শিল্পই—যথা: মাটি, কার্পাস, কাঠ, বাঁশ, বেত ও বিভিন্ন ধাতুর (যেমন লৌহ, তামা, পিতল, ইস্পাত প্রভৃতি) কাজ একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। শিল্পের এই পারস্পরিক সম্বন্ধটি ভাল করিয়া বুঝিয়া শিল্পসমূহের মধ্যে সমন্বয় শিক্ষাশিল্পের ক্ষেত্রেই রূপায়িত হওয়া প্রয়োজন; নতুবা শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পশিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না।

তূলা কোমল বস্তু, কিন্তু তূলার সূতা তূলার ন্যায় কোমল থাকে না। বয়নকে একটি পৃথক শিল্প বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ যিনি সূতা কাটিতে জানেন ও যথারীতি কাটিয়া থাকেন, তিনি আপন সূতা তাঁতির দ্বারা বয়ন করাইয়া লইতে পারেন, বয়ন তাঁহার না জানিলেও চলে। অর্থনৈতিক জীবনে প্রাপ্তবয়স্কদের শিল্পের এইরূপ আংশিক চর্চা বা কাজের এই শ্রেণীবিভাগ সমাজে পূর্বেও প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। মনুর যুগেও সেইরূপ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়েদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। এরূপ করিলে বস্তুর পূর্ণ জ্ঞানের ক্ষেত্রই সংকুচিত হইয়া যায়।

সূতাকাটার মুখ্য উদ্দেশ্য বয়ন ও বস্ত্র নির্মাণ। সূতাকাটা শিক্ষার

সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক বয়ন না শিখিলে সূতা কাটার গুণাগুণ ও নৈপুণ্য সম্বন্ধে বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ সঞ্চালন সহজ হয় না। সূতাকাটা শিক্ষা আরম্ভ করার পূর্বে কার্পাস চয়ন, তুনাই, ধুনাই, পাঁজ-প্রস্তুত-করণ যেমন শিখিতে হয়, তেমনি সূতাকাটা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইহার মুখ্য ব্যবহার বুঝা ও জানা প্রয়োজন হয়। সূতার সমগুণ, নির্দিষ্ট শক্তির প্রয়োজনীয়তা, অতিরিক্ত পাকের দোষ ইত্যাদি কাপড় বোনা কালেই আত্মপ্রকাশ করে এবং কাটুনীর বুদ্ধিবৃত্তিকে উৎকৃষ্ট গুণ-সমন্বিত সূতাকাটার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সজাগ করিয়া তোলে। এই উদ্দেশ্য সার্থক করিতে হইলে যাহারা সূতা কাটিবে তাহারা নিজের সূতায় বয়নও করিতে শিখিবে। এইরূপ করিলে অজ্ঞতাবশতঃ সূতাকাটায় তুলার যে অপচয় ঘটে, সূতার গুণবৈষম্যহেতু কাপড়ের জমির যে উৎকৃষ্ট বুনন হয় না, তাহা বুদ্ধিবৃত্তির প্রত্যক্ষ গোচরীভূত হইবে এবং ইহার আর্থিক দিকও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। সেজন্য বিদ্যালয়ে সূতাকাটা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বয়নশিক্ষা ব্যবস্থাও করিতে হয়। কিন্তু বড় তাঁত পরিচালনা করা প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষেই সম্ভব। সেইজন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের পক্ষে ছোট আকারের তাঁতে অনুরূপ বস্ত্র—যথা ফিতা, গামছা গালিচা ইত্যাদি শিখাইবার ব্যবস্থাও করা যায়। তাঁত-শিক্ষককে বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিয়া চলিতে হইবে। সূতাকাটার ও তাঁতের শিক্ষক এইরূপ ক্ষেত্রে এক হইলে শিক্ষার উৎকর্ষ বাড়িতে পারে। বিভিন্ন বয়নকৌশল সেই সঙ্গে আয়ত্ত হইবে।

এ কথা সত্য, আমাদের দেশে প্রচলিত প্রথায় তাঁতির পরিবারের বালকবালিকাও তাঁত চালানোর কাজে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে—কেহ বা সূতা ডবল করিয়া দেয়, কেহ বা নলি ভরিয়া দেয়—এইভাবে সকলেই ছোট ছোট আংশিক কাজের ভার গ্রহণ করে, পরে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তাহারা নিজেরাই বৃহৎ তাঁত চালনা করিতে পারে। এইরূপ প্রথা

পারিবারিক গৃহ-শিল্পে চলিয়া আসিতেছে এবং চলিতে বাধারও কোন কারণ নাই। কারণ সেখানে তাঁত পরিবারের জীবিকার সংস্থান করে। কিন্তু বিদ্যালয়ে তাহা অনুসৃত হইতে পারে না ; সেখানে বিদ্যার্থী স্বয়ং আপন হাতে কাটা সূতায় তাঁতের কাজ শিখিবে, ইহাই স্বাভাবিক। শিক্ষাই ইহার মূল উদ্দেশ্য, শিক্ষা দৃঢ়ভিত্তিক হইলেই জীবিকা সহজে আয়ত্ত হইবে সন্দেহ নাই।

বিদেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষাশিল্পের প্রগতি

স্থান ও কাল-ভেদে শিক্ষা-ব্যবস্থায় তারতম্য হইয়া থাকে। ইউরোপীয় দেশসমূহের বিদ্যালয়ে (প্রাথমিক ও উচ্চ) শিক্ষাশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষাশিল্প সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ও প্রথা সেইসকল দেশে প্রচলিত আছে। ইংলণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, জার্মানি, হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বিদ্যালয়সমূহে যে শিক্ষাশিল্পের চর্চা হয়, সে সম্বন্ধে আমার বহু বৎসরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, প্রতিটি দেশ নিজের প্রয়োজন বুঝিয়াই বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্র রচনা করিয়াছে। আবার এ-ও সত্য যে, শিল্পশিক্ষার সম্বন্ধে যে-সকল মতবাদ ও নীতি প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে বর্তমান ছিল, তাহা যুদ্ধসংঘাতের ফলে দ্রুত পরিবর্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। শিক্ষানীতিকে সমগ্র দেশের সমাজনীতির আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা যায় না, তাহা সম্ভবও নহে। সমাজনীতি ও অর্থনীতি পরিবর্তিত হইলে আবশ্যিক জনশিক্ষার নীতিতে পরিবর্তন অনিবার্য। বিশেষ করিয়া যুদ্ধের ফলে যে সকল দেশের সাংস্কৃতিক জীবন বার বার বিপর্যস্ত হইতেছে, তাহাদের তো কথাই নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডে এইরূপ পরিবর্তন গভীর হইয়াছে।

"In the United Kingdom profoundly important developments in every field of education took place or were

set in motion as a result of the second world war. The need for increased food production greatly encouraged school gardening, and keeping of live stock, the work of numerous schools began to revolve around the school 'farm' which provided abundant matter for class-room study as well as out-door activity. Children were released for limited periods to help farmers to prepare and harvest the crops. Evacuated children learned to launder and darn their clothes,......cook their meat, practise local handicrafts, make local surveys and study local life in all its aspects"—British Education—*By Dent.*

অপর পক্ষে যেসকল দেশ যুদ্ধ এড়াইতে সক্ষম হইয়াছে, সেই সকল দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি একটা স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ধারা অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ ইহার দৃষ্টান্ত।

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষাশিল্পের চর্চা ও গবেষণা পরাধীনতার যুগে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে সামান্যই হইয়াছিল। দেশ এখন উদ্বুদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমরা এখনও ইংলণ্ড বা আমেরিকাবাসীদের প্রয়োজনে রচিত পাঠ্যপুস্তকই আমাদের শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্রে ও বিদ্যালয়ে অনুসরণ করিতেছি, তাহাও অবস্থার তারতম্য না বুঝিয়া। কিন্তু এরূপ আশা করা অন্যায় নয় যে, বুনিয়াদি আবশ্যিক শিক্ষানীতি প্রবর্তনের ফলে শিক্ষাব্রতীদের চিন্তাধারা দেশের প্রয়োজনে ও বিদ্যার্থীদের কল্যাণে ক্রমশঃ নূতনভাবে স্ফূর্তি লাভ করিবে, শিক্ষার সাঙ্গীকরণের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষাব্রতিগণ ক্রমশঃ উপলব্ধি করিবেন।

শিল্প-শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণে আমাদের কর্তব্য

আসল কথা এই যে সকল দেশেই যার যার প্রয়োজনে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সর্বমানবের জন্য একটি অখণ্ড নীতি ও

ব্যবস্থা এখনও পৃথিবীতে স্থিতি লাভ করে নাই। পরশোষণনীতি যদি আমাদের ত্যজ্য হয়, মানবমৈত্রী যদি আমাদের ব্যক্তিগত, সমাজগত ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ হয়, তদুপরি এ দেশের চিরন্তন "ত্যাগের দ্বারা ভোগ করা"র আদর্শই যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে আমাদের শিক্ষার প্রগতিকে সেই পথেই পরিচালিত করিতে হইবে। আজ বিশ্বময় সংঘাত ও ভীতির প্রাবল্য দেখা দিয়াছে। মানবতার বিকাশই যদি ইউরোপ-আমেরিকার লক্ষ্য হইত (হয়তো তাহারাও একদিন সেই লক্ষ্যকে গ্রহণ করিবে) তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষানীতি সেই আদর্শেই গঠিত হইত; পৃথিবী হইতে যুদ্ধের ভীতিও হয়তো চলিয়া যাইত। যে দুর্নীতি এই সংঘাতের জন্ম দিয়াছে, সেই নীতির কুশলতা যতই হোক না কেন আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে নিঃসংকোচে তাহা বাদ দিতে হইবে। দেশের সর্বসাধারণের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধি অবশ্যই কাম্য এবং সেজন্য শ্রম স্বীকার করা প্রয়োজন কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের মূল্যবোধ করাও আজ নিতান্ত প্রয়োজন। শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে তাহা স্বীকার না করিলে আমাদের মহৎ ঐতিহ্যের ধ্বংস অনিবার্য। সেজন্য উদার মানবীয় আদর্শে আমাদের শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

ভারতের সনাতন শিক্ষার আদর্শ

ভারতের সনাতন শিক্ষার আদর্শ কি? এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিতে গেলে বলিতে হয়: মানবতার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য সাধারণ শিক্ষা, বস্তুজ্ঞান ও আত্মবিজ্ঞানের চর্চা ও ইহাদের সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস—এদেশের গৌরবময় যুগে যেমনটি প্রকটিত হইয়াছিল, তেমনটি অন্য কোন সভ্যতায় বড় দেখা যায় না। অঙ্ক-গণনা-পদ্ধতি, জ্যামিতি, সামাজিক অনুশাসন, অর্থনীতি, বহু দার্শনিক মতবাদ প্রভৃতির সামঞ্জস্য ও সমন্বয়-প্রচেষ্টা এ দেশে

হইয়াছিল। বিদ্যাদানের ক্ষেত্রে গুরুগণ যে আদর্শে প্রণোদিত হইয়া বিষয়-সম্ভোগকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ আমাদের বস্তু-তন্ত্রময়, স্বার্থদ্বন্দ্ব-বিক্ষিপ্ত জীবনের পক্ষে তাহা আবার আলোচনা ও বিচারের বিষয় সন্দেহ নাই। শিক্ষা-গ্রহণকালে সংযমাত্মক জীবনযাপন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা একালের শিক্ষাব্রতীদের বিচারের বিষয়। এদেশে বিদ্যার চর্চা এমন এক স্তরে পৌছিয়াছিল যে, শিক্ষক আপনার বিদ্যার্থীর জন্য প্রার্থনা করিতেন—"ব্রহ্মচারিগণ শম অর্থাৎ মনঃস্থৈর্য লাভ করুক।" নিজের সম্বন্ধে প্রার্থনা করিতেন—"আমি যেন ধনবান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হই।" এদেশকে, এ দেশবাসীকে মহত্তর সভ্যতার ধারক হইতে হইলে বুদ্ধের ন্যায় মহামানবের সহৃদয়তা ও সহনশীলতার বাণীকে আমাদের শিক্ষানৈতিক জীবনে সফল করিয়া তুলিতে হইবে। বুদ্ধবাণী এদেশেরই প্রতিভার দান।

শিক্ষা ও বিদ্যাভ্যাস-দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান-দ্বারা জীবন সম্পূর্ণ বিকশিত করার মহত্তর আদর্শ অন্য কোন সভ্যতা ধারণ করিতে পারিয়াছে কিনা, তাহা দেশের শিক্ষাব্রতীদের যাচাই করার দিন আসিয়াছে। সৃষ্টির বিচিত্র বিকাশের মূলে যে শক্তি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এদেশের প্রাচীন শিক্ষাগুরু বলিতে পারিয়াছিলেন—"হে ঐশ্বর্য, সহস্রশাখা অর্থাৎ বহুরূপ যে তুমি, তোমাতে আমি আপনাকে পবিত্র করি।"—"তুমি আশ্রয়, আমাকে আলোকিত কর অর্থাৎ তন্ময় কর।" জ্ঞানের দ্বারা জীবনকে আলোকিত করার কি অপূর্ব প্রচেষ্টাই না এদেশে হইয়াছিল। ত্যাগের শক্তি অসাধারণ; ত্যাগের মহিমায় এ দেশের বিশেষ বিশেষ যুগ মহিমান্বিত হইয়াছে।

সারাদেশে জনসাধারণের প্রতিভাবিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইলে দেশের গৌরব আমাদের প্রণম্য মহাজনদের আদর্শকে বিচার করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। সত্য, ন্যায় ও নীতির প্রাণস্বরূপ মৈত্রী ও প্রীতির আদর্শকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে

গ্রহণ করিতে হইবে। যে শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থা হিংসার উদ্রেক করে, তাহা যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গী সেইদিকে ফিরাইতে হইবে; তবেই আমরা শিক্ষার মাধ্যমে মহত্তর সভ্যতা রচনার অধিকারী হইব।

পাশ্চাত্ত্যের কর্মজাত শিক্ষা-বিজ্ঞানের অগ্রদূত ও প্রবর্তক

রুশো (১৭১২-১৭৭৮)

মানব-কল্যাণকামী শিক্ষাব্রতী মাত্রই পরস্পর পরস্পরের সমধর্মী। প্রকৃত শিক্ষাব্রতীর বিশেষ জাতিদেশ নাই, একথা মনে রাখিয়াই পাশ্চাত্ত্যের কর্মজাত শিক্ষা-বিজ্ঞানের অগ্রদূত ও প্রবর্তকদের সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা যাইতেছে।

পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান রুশোর শিক্ষাদর্শন ও মতবাদকে কেন্দ্র করিয়াই বিবর্তিত হইয়াছে বলা যায়। রুশো ছিলেন বিপ্লবী। রুশোর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এমিল' (Emile)-এ তখনকার দিনের শিক্ষা ও সমাজ সম্পর্কে তাঁহার বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। মধ্যযুগীয় অন্তঃসারশূন্য শিক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার—এক কথায় জনমতসম্মত ডেমোক্রেটিক সমাজও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহার 'আইডিয়া' আলোকবর্তিকার ন্যায় পরবর্তী শিক্ষাব্রতী ও সংস্কারকদিগকে আলো দান করিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমেই রুশোর মতবাদের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়।

জেনেভা শহরে রুশো (Jean Jacques Rousseau) ১৭১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যু হয় ১৭৭৮ সালে। তিনি প্রকৃতির একজন খাঁটি উপাসক ছিলেন; সেজন্য তাঁহার শিক্ষাসম্পর্কীয় মতবাদও ন্যাচারালিজম (Naturalism) বলিয়া খ্যাত। এখানে উল্লেখ করা যাইতে

পারে যে রুশো ছিলেন ভলটেয়ারের (Voltaire) সমসাময়িক ও বন্ধু। এখানে রুশোর শিক্ষা-সম্পর্কীয় মতবাদ আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু আধুনিক কর্মজাত শিক্ষাদর্শের জন্মদাতারূপে নামোল্লেখের প্রয়োজন আছে। কারণ যে সকল শিক্ষাব্রতীর সাধনার ফলে আজ শিক্ষার অবশ্য অঙ্গরূপে কর্মজাত শিক্ষা ও শিল্প নির্দিষ্টরূপ স্থান ও মান পাইয়াছে, তাঁহারা সকলেই রুশোর জীবনদর্শনের প্রভাবে আসিয়াছিলেন। এখানে তাঁহাদের জীবনীর কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বরং স্বাধীন ভারতের মাতাপিতা ও শিক্ষকসাধারণের চিন্তার খোরাকও যোগাইতে পারে বলিয়া আমার ধারণা।

শিল্পকে—হাতের কাজকে শিশুর ও সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূতকরণে যাঁহারা অগ্রণী, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনজন শিক্ষাবিদ্—যথা পেস্টালোৎসি (Pestalozzi), ফ্রোয়েবেল (Froebel), ও সালোমন (Salomon)। তাঁহাদের নির্দেশ ও পথ অবলম্বন করিয়াই বহু শিক্ষাবিদ্ কর্মজাত শিক্ষাসম্পর্কে গবেষণা করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা-শিল্পনীতি আবিষ্কার ও প্রবর্তনের অগ্রদূত তাঁহারাই। পেস্টালোৎসি গঠনমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। সেই আদর্শে তিনি শিক্ষামূলক গবেষণা করিয়া শিশুর জীবনে খেলাধূলার বিশেষ স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন।

পেস্টালোৎসির আদর্শে উদ্বুদ্ধ ফ্রোয়েবেল 'কিণ্ডারগার্টেন' শিক্ষাপদ্ধতির জনক। উভয়েই বিশেষভাবে শিশু-শিক্ষার কথাই ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু উচ্চবিদ্যালয়ে গঠনমূলক কর্ম ও শিল্পশিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়নের অগ্রদূত হইতেছেন শ্লয়েড-(Sloyd) পদ্ধতির জনক অটো সালোমন (Otto Salomon)। ইউরোপের ও আমেরিকার উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে আজ শিক্ষাশিল্পের যে ব্যাপক ব্যবস্থা দেখা যায়, ইহার উৎস সুইডেনের অন্তর্গত 'নেশ' (Nääs) নামক শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সালোমন।

পেস্টালোৎসি (১৭৪৬-১৮২৭)

জুরিক শহরে ১৭৪৬ সালে ইঁহার জন্ম। শিক্ষক, শিক্ষাবিদ্ ও লোকসেবকরূপেই তাঁহার খ্যাতি। অজ্ঞাত নিঃসহায় কুড়িটি শিশুকে লইয়া তিনি তাঁহার যে প্রথম বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন কৃষকসমাজের উন্নতিই ছিল উহার প্রথম লক্ষ্য। মামুলী পদ্ধতিতে তিনি ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন না। ক্ষেতখামারের কাজের সঙ্গে শিক্ষার কার্য চলিত। তাঁহার বিদ্যালয়টি ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করে, কিন্তু ১৭৭০ সালে উহা উঠিয়া যায়। অর্থাভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা সম্ভব না হওয়ায় তখন তিনি নিজের শিক্ষার আদর্শ ও ভাবধারাকে লেখনীর সাহায্যে প্রচার করিতে সচেষ্ট হন। পেস্টালোৎসি নিজেই একটি শিক্ষাসম্পর্কিত সংবাদপত্র প্রকাশ করেন কিন্তু অর্থাভাবে এই কাগজও অল্পদিনই বাঁচিয়াছিল। যাহা হউক ১৭৯৯ সালে বাউদ (Vaud)এর নিকটে আর একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ছাত্রসংখ্যা ইহাতেও দুই শতের অধিক হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। পেস্টালোৎসির শিক্ষাপ্রণালীর সহিত পরিচিত হইবার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও স্থান হইতে বহু দর্শকের সমাগম হইতে থাকে। এই দর্শকদের কেহ কেহ পরে শিক্ষাবিদ্‌রূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদেরই একজন ছিলেন ফ্রোয়েবেল।

পেস্টালোৎসির জীবনে আর্থিক দিক দিয়া প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সহজ হয় নাই কিন্তু শিক্ষানীতির অভিনবত্বে তিনি বৃহত্তর সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিশুর জীবনের সকল বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ ও ছন্দোময় স্ফুরণ বা বিকাশ (harmonious development) ছিল তাঁহার শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য। পেস্টালোৎসি রুশোর শিক্ষাদর্শনের (naturalism) অনুবর্তী হইয়াই শিক্ষার গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম

পুস্তকে (The evening hour of a hermit) সেই সুর ধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার মতে প্রকৃতিই মানুষের কল্যাণকর সকল বৃত্তির উৎস —ইহা আকস্মিক নয়, তাই মানুষের শিক্ষা প্রকৃতির নিয়মানুবর্তী হওয়া প্রয়োজন।*

উর্বর রসযুক্ত ক্ষেত্রে রোপিত বৃক্ষের সঙ্গে তিনি শিক্ষার উপমা দিয়াছেন। একটি অতি ক্ষুদ্র বীজে সমগ্র গাছের রূপ—ইহার আকার, গঠন-সামঞ্জস্য নিহিত আছে। সেই বীজ রোপণ করার পর লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় ইহার অঙ্কুরোদগম, কাণ্ডের অবতারণা ও বৃদ্ধি, শাখাপ্রশাখা বিস্তার, পাতা, ফুল ও ফল। গাছের এই সমগ্র রূপটিই বীজে নিহিত থাকে। আর মানুষও ঠিক গাছেরই মত। নব-ভূমিষ্ঠ মানব-শিশুর মধ্যেও সেইরূপ সমগ্র জীবনের রূপটি থাকে—যাহা পরে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়।

শিক্ষার সংজ্ঞা তিনি নির্দেশ করিয়াছেন :—মানুষের সর্বগুণ ও ক্ষমতার স্বাভাবিক, প্রগতিসম্পন্ন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য। সেজন্য শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের সঙ্গতিপূর্ণ ক্রম থাকিবে। এই ক্রমের সঙ্গে সংগতি রাখিয়াই তাহার শারীরিক, মানসিক চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তি সমভাবে বিকশিত হইবে।†

* "All the beneficent powers of man are due to neither art or chance, but to nature and the education should follow the course laid down by nature"—The Evening Hour of a Hermit by Pestalozzi.

† The natural, progressive and harmonious development of all the powers and capacities of human beings—The knowledge to which the child is to be led by instruction must, therefore, be subjected to a certain order of succession, the beginning of which must be adopted to the first unfolding of his powers, and progress kept exactly parallel to that of his development—Pestalozzi.

ইউরোপে তখনকার দিনের চলিত শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের দেশের চলিত পদ্ধতির ন্যায়ই পুঁথিকেন্দ্রিক ছিল। পেস্টালোৎসির জীবনে সৌভাগ্য-জনক ঘটনা এই যে তিনি নিজেই নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতির সুফল ও তখনকার প্রচলিত মামুলী পদ্ধতির অসারতা প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন।

পরিণত বয়সে ১৮২৭ সালে ব্রুগ (Brugg) নামক স্থানে তিনি দেহরক্ষা করেন। তিনি অতিশয় বিনয়ী ছিলেন এবং তাঁহার শিক্ষার রূপ ও বিকাশে সহকর্মিগণের প্রচেষ্টার অজস্র প্রশংসা তিনি করিয়া গিয়াছেন। এই একটি বিশেষ গুণের জন্য তিনি অমর হইয়া থাকিবেন; কারণ কোন বিশিষ্ট রচয়িতার প্রতিভা যতই থাকুক—একের প্রচেষ্টায় শিক্ষাপদ্ধতি রূপ পায় না; বরং সহকর্মীদের প্রতিভা জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করার মধ্যেই রচয়িতার প্রতিভা মূর্ত হইয়া উঠে। পেস্টালোৎসির শিক্ষাপদ্ধতির পুঙ্খানু-পুঙ্খ বিচার পরবর্তী যুগে প্রচুর হইয়াছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষাজগতে পেস্টালোৎসির দান অসাধারণ। কর্ম, জ্ঞান ও নিষ্ঠার সমন্বয়ের প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথ তিনি দেখাইয়া-ছিলেন এবং ইহা তাঁহার প্রদর্শিত শিক্ষানীতির একটি বৈশিষ্ট্য।

ফ্রেড্রিক ফ্রোয়েবেল (১৭৮২-১৮৫২)

ইনি পেস্টালোৎসির একজন বিশিষ্ট অনুগামী শিশু-শিক্ষাবিদ্ এবং 'কিণ্ডারগার্টেন'-শিক্ষাপদ্ধতির জনক। ১৭৮২ সালে জার্মানীর অন্তর্গত ওবেরউইসবাক (Oberweissbach) নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশবেই তিনি মাতৃহীন হন, তাঁহার পিতা—একজন ধর্মযাজক, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। মাতৃহীন ফ্রোয়েবেল বাল্যজীবনে বিশেষ আদরযত্ন পান নাই। হফম্যান নামক এক আত্মীয় শিশু-ফ্রোয়েবেলের লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সে ফ্রোয়েবেলকে বিদ্যালয়ে পাঠান হয়;

[illegible] তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি সাধারণ অপেক্ষাও কম বিবেচিত হইয়াছিল। [illegible] বৎসর বয়সে তরুণ ফ্রোয়েবেলকে বনবিভাগের শিক্ষানবীশ করিয়া ভরতি করা হয়। দুই বৎসর কাল এই বনবিভাগে শিক্ষানবীশি করা কালেই তাঁহার প্রকৃতি-বিজ্ঞানের স্বাদ ও রস গ্রহণের সুযোগ হয় এবং তিনি প্রকৃতি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লাভ করেন। পরে তিনি নিজের সাধারণ জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের জন্য 'জেনা' (Jena) বিশ্ববিদ্যালয়ে আঠারো মাস অধ্যয়ন করেন কিন্তু অর্থাভাবে খাওয়াপরার ঋণ শোধ না করিতে পারায় তাঁহাকে তখন নয় সপ্তাহের জন্য কারাবরণ করিতে হয়। তারপর তিনি কিছুকাল কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরে জার্মানীর বহুস্থান ঘুরিয়া বেড়াইবার সময়ে তিনি বিভিন্ন পেশা, যথা—হিসাব রাখার কাজ, জরিপের কাজ ইত্যাদির দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতে লাগিলেন। ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট-অন-মেইনে (Frankfort-on-Maine) স্থপতিরূপে কাজ করার সময় তাঁহার সঙ্গে এক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পরিচয় ঘটে, এই শিক্ষকটি পেস্টালোৎসির শিক্ষা-পদ্ধতির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি ফ্রোয়েবেলকে স্থাপত্যের কাজ ছাড়িয়া শিক্ষার কাজ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন।

তদনুযায়ী তেইশ বৎসর বয়সে তিনি শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। এই কাজে যোগ দিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ইহাই তাঁহার জীবনে চরম সার্থকতা লাভ করিবার পথ। ১৮০৭-১০ পর্যন্ত বারদূনে (Yverdun) তিনি পেস্টালোৎসির সহকর্মীরূপে কাজ করেন। তখনও তিনি নিজের শিক্ষা ও জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা অনুভব করিতেন। ইহা তাঁহার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সেজন্য তিনি গথিংগেন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। এই সময়ে যুদ্ধের ভেরী বাজিয়া উঠে। ফ্রোয়েবেলকে যুদ্ধে যোগ দিতে হয় কিন্তু যুদ্ধের বিভীষিকার অভিজ্ঞতা তাঁহার শিক্ষানৈতিক জীবনকে ক্লিষ্ট করে নাই, বরং নূতন প্রেরণাই দান করিয়াছিল। ১৮১৪

সালে ফনটেনব্লুতে (Fontainbleau) যুদ্ধ-বিরতি ও শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার যোগ দেন এবং সেখানকার খনিজ-বিজ্ঞানের (Mineralogical) মিউজিয়মে কিউরেটার নিযুক্ত হন।

১৮১৬ সালে তিনি গ্রেইস্‌হেইম নামক স্থানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বিদ্যালয়টিকে কিয়েলহাউ নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন। পেস্টালোৎসির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই বিদ্যালয়ে পনের বৎসর 'কিণ্ডারগার্টেন' পদ্ধতির কার্যকরী রূপ বিকাশে সচেষ্ট হন; আর এখানেই প্রসিদ্ধ কিণ্ডারগার্টেন-পদ্ধতি যথার্থ বিকাশ লাভ করে। ১৮২৯ সালে ফ্রোয়েবেল তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মানুষের শিক্ষা' (Education of Man) প্রকাশ করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় এই পুস্তক সামান্যই প্রচারিত ও পঠিত হইয়াছিল।*

তাঁহার শিক্ষাদর্শনের আর একটি মূল কথা—"Co-development of faculties, a harmonious unity"। বিদ্যালয়ের শিক্ষার বনিয়াদ সুদৃঢ় করিতে হইলে শিশুর শিক্ষার যথার্থ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন—

* এই পুস্তকে শিক্ষাসম্পর্কীয় তাঁহার মতবাদ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—"In all things there lives and reigns an eternal law— . . . This law has been and is enounced with equal clearness and distinctness in nature (the external), in spirit (the internal), and in life which unites the two. This all-controlling law is necessarily based on an all pervading, energetic, living, self-conscious, and hence eternal unity . . . . . This unity is God. All things have come from the divine unity, from God, and have their origin in the Divine unity, in God alone. All things live and have their being in and through the Divine Unity, in and through God. The Divine effluence that lives in each thing is the essence of each thing.

ফ্রোয়েবেল এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছিলেন। শিক্ষাবিদ কমেনিউসের (Comenius) রচনা "School of Infancy" পড়িয়া তিনি নিজের সিদ্ধান্তে দৃঢ়নিশ্চয় হন।

কিয়েলহাউ বিদ্যালয় বর্তমান থাকা কালেই তিনি আর একটি সুইস্ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সুইস্ ধর্মযাজক সম্প্রদায় (clergy) তাঁহার এই প্রচেষ্টাকে সুনজরে দেখেন নাই। যাজকসম্প্রদায়ের ধারণা হয় যে ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাপ্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য প্রটেস্টান্টিজম্ প্রচার করা।

তৎপর ফ্রোয়েবেল একটি শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। পেস্টালোৎসির শিক্ষাদর্শনানুযায়ী নিজের শিক্ষা-প্রণালী প্রচারের উদ্দেশ্যে এই শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তাঁহার আশা ছিল যে এভাবে যুবক শিক্ষকদের দল তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতি সর্বত্র প্রচার করিবে।

কিণ্ডার গার্টেন

১৮৩৭ সালে ব্লাঙ্কেনবুর্গ (Blankenburg) নামক স্থানে—কিয়েলহাউয়ের সন্নিকটে তিনি প্রথম 'শিশু উদ্যান' স্থাপন করেন, তাঁহার শিক্ষানীতি প্রচারের জন্য একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা তখন তিনি প্রকাশ করেন। শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত কোর্স চলিতে থাকে। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার এই প্রচেষ্টা অনেক ব্যাহত হয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠানটি আট বৎসর কাল বাঁচিয়াছিল।

শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্দ্রের কাজ 'কিয়েলহাউ'তে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত চলিয়াছিল। কোন সহৃদয় মহিলার (Duchess of Meiningen) আহ্বানে লিবেনস্টাইন (Liebenstein) নামক স্থানে তিনি আর একটি 'শিশু উদ্যান' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৯ সালে ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাপ্রচেষ্টা Baroness Von Bulowর দৃষ্টিগোচর হয়। এই শেষোক্ত মহিলা ফ্রোয়েবেলের

অসাধারণ মনীষা ও তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। বইখানার ইংরেজী নাম—"Recollection of Friedrich Froebel."

ফ্রোয়েবেল বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যেই ইহার স্রষ্টার সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং প্রকৃতিজাত সকল কিছুই যে একটা বিশেষ নিয়মের অনুবর্তী, সেই অনুভব তাঁহার হইয়াছিল। ইহা তাঁহার রচনা হইতে জানা যায়। শেষ বয়সে তিনি অভাবিত বাধার সম্মুখীন হন। তাঁহার কোন আত্মীয় (ফ্রোয়েবেল নামীয়)—সোসিয়ালিজম্ সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করেন। ভুল ক্রমেই হউক আর সন্দেহের বশেই হউক শিক্ষাবিদ ফ্রোয়েবেলের উপর এই পুস্তক ও ইহার মতবাদ আরোপ করা হয় এবং ১৮৫১ সালে 'ফ্রোয়েবেল পদ্ধতি' জার্মাণীতে নিষিদ্ধ হয়। ফ্রোয়েবেলের জীবনে ইহা মর্মান্তিক দুঃখকর ঘটনা। বৎসর কাল মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ১৮৫২ সালে ম্যারিয়েনথাল (Marienthal) নামক স্থানে তিনি দেহরক্ষা করেন।

ফ্রোয়েবেল শিশুশিক্ষার জন্য আজীবন শ্রম করিয়াছিলেন। শিশুর খেলা, শিশুর গান, শিশুর কর্ম-প্রবৃত্তিকে (self-activities) তাঁহার শিক্ষার কাজে রূপ দিতে গিয়া তিনি জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিশুশিক্ষার অগ্রদূতরূপে তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় যথোচিত সমাদর লাভ করেন নাই। অর্থাভাব তাঁহার কাজের ধারাকে বারবার ব্যাহত করিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি গুরু পেস্টালোৎসির আদর্শকে যে রূপ দিয়াছিলেন— তাহা শিক্ষাজগতে প্রচণ্ড আলোড়ন ও নূতন ভাবধারা আনয়নে সমর্থ হইয়াছে, পরোক্ষে অগণিত শিশু ইহার উজ্জ্বল লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। "শিশুদের জন্যই আমরা বাঁচিব"—তাঁহার এই বাণী পরবর্তী শিক্ষাব্রতীদের জীবনে মহৎ একটি উদ্দেশ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছে।

অটো সালোমন (Otto Salomon)

১৮৫০ সালে সুইডেনে ইহার জন্ম। পেস্টালোৎসি ও ফ্রোয়েবেল কর্মের মাধ্যমে শিশুশিক্ষানীতির বুনিয়াদ-গঠনে জীবন দান করিয়াছিলেন আর সালোমন সাধারণ বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বিদ্যার্থীদের শিক্ষা-শিল্পের জন্য গবেষণা করিয়াছিলেন। এই গবেষণার জন্য পেস্টালোৎসি ও ফ্রোয়েবেলের ন্যায় সালোমনকে আর্থিক দুঃখ পাইতে হয় নাই। কারণ তাঁহার এক ধনী আত্মীয় (Herr August Abrahamsson) নিজের বিপুল ধনসম্পত্তি ও প্রাসাদ লোকহিতব্রতী উৎসাহী নীরব শিক্ষাব্রতী সালোমনের গবেষণার কাজে নিয়োগ করেন। ১৮৭২ সালে সুইডেনের অন্তর্গত 'সেবেলাঙ্গেন' নামক হ্রদের তীরে সুরম্য প্রকৃতির কোলে 'নেস' নামক স্থানে শিক্ষকশিক্ষণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শিক্ষাশিল্প দর্শনের মূল বাণী এই ; সৌন্দর্যময় শিল্পের মাধ্যমে শরীরের চর্চা জীবন-বিকাশে সহায়তা করে ; আর সেই বিকাশ বিদ্যার্থীর জীবনে একটি বিশেষ সম্পদ।

সালোমন প্রথম জীবনে কৃষিবিদ্যায় কৃতিত্ব অর্জন করেন কিন্তু দেশের নৈতিক জীবনে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাব ও সমাজজীবনে ইহার কুফল লক্ষ্য করিয়া বিদ্যালয়ের আবশ্যিক শিক্ষার মাধ্যমে তাহা রোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের আবির্ভাবে ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ-জীবনের ছন্দপতন তিনি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইণ্ডাষ্ট্রিয়া-লিজমের বন্যায় যখন পাশ্চাত্যের অধিকাংশ সমাজবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্ ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তখন আমরা দেখিতে পাই সালোমন নীরবে শিক্ষাশিল্পের মাধ্যমে ইহার প্রতিকার করিতে প্রয়াসী। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে প্রথমেই দেখিতে হয় উত্তর ইউরোপের ভৌগোলিক অবস্থা ও তখনকার সামাজিক পরিবেশ। উত্তর ইউরোপীয় দেশসমূহে অর্থাৎ

স্কানডিনাভিয়ায় সূর্যালোকে উজ্জ্বল স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মঋতুর পরে নামিয়া আসে অন্ধকারময় দীর্ঘ শীতকাল। তখনকার দিনে দেশের শতকরা যাট জন ছিল কৃষিজীবী। দীর্ঘ দুঃসহ তুষারময় শীতকালে কৃষকেরা খেতখামারের কাজ করিতে পারিত না কিন্তু প্রাচীন প্রথানুযায়ী শীতকালে ঘরে বসিয়া জীবিকার জন্য কাজ করিতে বাধ্য হইত। সেজন্য গৃহের অভ্যন্তরে প্রস্তরনির্মিত চুল্লীর অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে পরিবারের সকলে—নারীপুরুষ, ছেলেমেয়ে এমন কি চাকর পর্যন্ত সমবেত হইত। বৃদ্ধবৃদ্ধারা প্রাচীন-কালের কাহিনী মুখে পরিবেশন করিতেন; কেহ বা সঙ্গীতে উপস্থিত সকলকে আনন্দ দান করিতেন, কেহ বা কবিতা আবৃত্তি করিতেন; আর এই আনন্দময় গৃহপরিবেশে সকলের হাতগুলিই কোন না কোন শিল্পকর্মে লিপ্ত থাকিত। পুরুষেরা দা, খন্তি, কুড়ালের সুদৃশ্য হাতল, কাঠের থালি ও গৃহসরঞ্জাম প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জিনিষ অথবা কৃষি-কাজের প্রয়োজনীয় কাঠের যন্ত্রাদি তৈরি করিতেন, আর এ সকল জিনিষ তাঁহারা সরল অথচ সুরুচিসম্পন্ন ডিজাইনে অলংকৃত করিতেন; নারীরা চরকা বা তাঁত চালাইতেন অথবা নিত্যব্যবহার্য পোষাকপরিচ্ছদ ও সূচিকর্ম করিতেন। এরূপ কাজ কখনও বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হইত না। এ জাতীয় গৃহশিল্পকে 'শ্লয়েড' (sloyd) বলা হইত। শ্লয়েড শব্দের প্রকৃত অর্থ হস্তনৈপুণ্য, কিন্তু সহসা ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের সমাগম ও সমবায়পদ্ধতি বিস্তারলাভ করায় যুগযুগের গৃহশিল্পের ধারা ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে, স্থানে স্থানে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায়। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল যুগের পূর্বে ঘরে ঘরে লোকহস্তে যে কাজ সম্পাদিত হইত, সেই কাজ পূর্ণ করিতে লাগিল বৃহৎ যন্ত্র ও কারখানা; রেলওয়ে, খাল ও যানবাহনের প্রাচুর্য বাড়িয়া যাওয়ার ফলে কলে তৈরি দ্রব্য সর্বত্র সহজে পৌছিতে লাগিল।

সালোমন কলের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা অভিযান করেন নাই। কিন্তু কল-বিস্তারের ফলে দেশের সমাজ, সাংস্কৃতিক ও গৃহজীবনে যে দুর্যোগ ঘনীভূত হইতেছিল, তাহার প্রতিকার তিনি শিক্ষাশিল্পের মাধ্যমে রোধ করিতে বদ্ধপরিকর হন। কারণ তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে তখনকার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবন বিপদমুক্ত করা প্রয়োজন। তিনি লিখিয়াছেন —"ইহা সত্য যে, হাতে যে কাজ সম্পাদন করা যায় তাহা কলে করিলে সময় ও অর্থ বাঁচিয়া যায় এবং যে সময় বাঁচে তাহা ব্যক্তির জীবনে সৃজনমূলক কর্মে নিযুক্ত করিলে আপত্তির কোন কারণ থাকে না; কিন্তু যদি তাহা না করা হয়,—পূর্বেকার ব্যবস্থায় যে সময় আনন্দময় পরিবেশে সৃজনমূলক কাজে নিয়োগ করা হইত, তাহা এখন যদি আলস্যের মধ্যে কাটে বা অসাধু কাজে নিয়োজিত হয়, তবে উদ্বৃত্ত সময়ের শুধু অপচয়ই ঘটে না, উপরন্তু ইহা নৈতিক ও আর্থিক উভয় দিক দিয়াই বিশেষ ক্ষতিকর।" সেজন্য সালোমন হাতের কাজকে তরুণ-তরুণীর অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ে রূপান্তরিত করেন; বিশেষ ও নির্দিষ্ট পদ্ধতি আবিষ্কার করেন—যাহাতে শিক্ষাদান ও গ্রহণ উদ্দেশ্যপূর্ণ হয় এবং সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে সম্পাদিত হয়। শিক্ষাজগতে এই পদ্ধতিকে শিক্ষানৈতিক শিল্প বা 'শ্লয়েড' বলা হইয়া থাকে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষকশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ক্রমে একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। পেস্টালোৎসি ও ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাদর্শনে আস্থাবান্ ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের প্রগতিসম্পন্ন শিক্ষাব্রতী দলে দলে 'নেস' কেন্দ্রে যোগ দিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহারা বাস্তব শিক্ষাশিল্প ও ও শিল্পশিক্ষাদান-পদ্ধতি আয়ত্ত করিতেন এবং সকলেই নূতন প্রেরণা লইয়া স্বদেশে ফিরিতেন। ইংলণ্ডে সালোমনের প্রভাব কতখানি বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা তখনকার দিনের ব্রিটিশ শিক্ষাবিভাগের রিপোর্ট হইতে

জানা যায়। 'নেস' প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট পাঠেও এ সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়।*

আমরা দেখিতে পাইতেছি রুশো, পেস্টালোৎসি, ফ্রোয়েবেল প্রভৃতি মৌলিক ও অগ্রণী শিক্ষাব্রতীদিগকে বিপুল বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু সালোমনের দূরদৃষ্টি ও তাঁহার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ইহার প্রচার ও প্রগতির পথকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই এবং সেজন্য তাঁহার নিজের জীবনেই স্বকীয় শিক্ষাশৈল্পিক নীতির বিস্তার দেখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষাশিল্প-দর্শনের মূল কথা—গঠনমূলক শিল্পের মাধ্যমে যথার্থ শরীর ও মনের চর্চা বিদ্যার্থীর শারীরিক ও মানসিক শক্তিবিকাশে সহায়ক, আর এই বিকাশ তাহাদের জীবনের একটি বিশেষ সম্পদ। সুইডেনের শিক্ষাবিভাগ সালোমনের শ্লয়েড পদ্ধতিকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চার্যের কথা এই যে, ইহাকে 'অবশ্য শিক্ষণীয়' শিক্ষার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ না করিলেও ইহা দেশের আবশ্যিক শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলা বাহুল্য, পরবর্তী কালে সালোমন পদ্ধতিরও বিবর্তন ঘটিয়াছে,—সমাজ ও কালের পরিবর্তনে এইরূপ বিবর্তন স্বাভাবিক ও প্রগতিশীলতার লক্ষণ। সুইডেনের ১৯৫০ সালের "বিশেষ শিক্ষাআইন" ইহার দৃষ্টান্তস্থল। এই আইনের বলে শিক্ষানৈতিক ক্ষেত্রেও শ্লয়েড ইতিমধ্যে আবশ্যিক শিক্ষানীতির পর্যায়ে সম্প্রসারিত হইয়াছে ও হইতেছে।

* The Sloyd Teacher's Training Seminarium at 'Nââs' began operations in 1872...... During the period of fifty years, about three thousand foreign scholars attended the Sloyd course at Nââs, and among them teachers from England and Scotland numbered more than nine hundred, inspite of the fact that the periodical courses similar to that of Sloyd began in both these countries after the year 1906.—Education and Reconstruction. By L. Sinha.

এই কথা অবশ্য স্বীকার্য যে সুইডেনের জনশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষানৈতিক শ্লয়েডের দান অনন্যসাধারণ; ইহা সমগ্র সুইডজাতিকে কর্মক্ষম করিয়া তুলিয়াছে; কর্মের ও শ্রমের যথার্থ মর্যাদা দান করিয়াছে।

ইংলণ্ডের শিক্ষার আদর্শ আমরা বহুকাল অনুকরণ করিয়াছি। রক্ষণশীল ইংলণ্ডেও গত মহাযুদ্ধের সময়ে শিক্ষাশিল্পের প্রচার ও প্রসার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাশ্চাত্ত্যের গঠনমূলক ও মৌলিক শিক্ষাবিদগণের জীবন ও দর্শন আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহারা প্রকৃতির খুব অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষাক্ষেত্রে মহান্ যুগের সম্ভাবনার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন; পরবর্তী শিক্ষাব্রতীদের সাধনার ক্ষেত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন।

অন্যপক্ষে পাশ্চাত্ত্যের ব্যবসায়-বুদ্ধি ও নীতির বিচার করিলে (এবং ইহা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিভলিউসনের একটি অনিবার্য ফল) স্বীকার করিতে হয় যে শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও ইহার সংস্কৃতি দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন, উৎকট ভোগবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন; ইহার রাজনৈতিক শক্তির খেলা—হিংসা, দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব এবং ইহাদের অপরিহার্য পরিণাম—যুদ্ধকে ডাকিয়া আনিতেছে। এক একটি যুদ্ধ ইহার গৃহ, শিশুজীবন, মাতৃজীবন—এক কথায় সমগ্র সমাজজীবনকে ক্রমেই বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। জীবনের আনন্দময় ছন্দকে তাহারা ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলিতেছে। সমাজমঙ্গল প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজের বহির্দেশের ক্ষত সারানো সম্ভব হইলেও সমাজের বুনিয়াদ তথা গৃহের ও সমাজের শান্তি সুখ আজ আহরণ করা কষ্টসাধ্য হইতেছে। এমন হইতে পারে যে হিংসা, পরশোষণ, পরবিদ্বেষবিহীন রাষ্ট্রনীতি গ্রহণ ও শিক্ষার মাধ্যমে মহত্তর মানবীয় সভ্যতার রসাস্বাদন করিতে পাশ্চাত্ত্যকে আরও অনেক ধাপ বা

ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। কারণ যে মহাদেশে এরূপ মৌলিক শিক্ষাবিদ্ জন্ম লইয়াছেন, তাহার ভবিষ্যৎ কখনও অন্ধকারময় হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের ঐতিহ্য

হাতে সূতাকাটা, রঞ্জন ও বয়ন

বর্তমান কালে কাপড়ের কল এদেশে বিস্তার লাভ করা সত্ত্বেও হাতে সূতাকাটা, বয়ন ও রঞ্জন হস্তশিল্পরূপে দেশে স্থিতি ও প্রসার লাভ করিতেছে। সকল ক্ষেত্রে অবশ্য হাতে কাটা সূতায় বয়ন হইতেছে না। অনেক স্থানেই কলের সূতায় তাঁত চলিতেছে। গৃহশিল্পে, কুটিরশিল্পে, পল্লীশিল্পে তাঁত আপনাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। সর্বশেষ ধাপে দেশের বিদ্যালয়েও তাঁত ও সূতাকাটার প্রবর্তন বাড়িতেছে। স্বদেশী আন্দোলন এই শিল্প প্রবর্তনের প্রেরণার উৎস বলিয়া মনে করা যায়। এরূপ মনে করার যুক্তিসংগত কারণও আছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অর্থাৎ প্রাক্‌স্বাধীনতার আমলে চরকা জাতীয়পতাকায় স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু কার্পাসশিল্পের পুনর্জীবনলাভের মূলে অন্য গূঢ় কারণ রহিয়াছে। আসলে সূত্র-কর্তন, বয়ন ও রঞ্জন ছিল এদেশের অতি প্রাচীন নিজস্ব শিল্প এবং সাধারণের সৃজনী-শক্তির বিকাশ, সম্প্রসারণ ও প্রয়োজন-পূরণের একটি ব্যাপক ক্ষেত্র। রাজনৈতিক পরাধীনতা ও সংস্কৃতিগত বিপর্যয়ের দিনে এই শিল্পের চর্চা আট নয় দশক লোকজীবনে নিতান্ত সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান ছিল।

অতি প্রাচীন কালে এদেশে কার্পাস হইতে সূতা ও সেই সূতায় বস্ত্রবয়নপ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এদেশ হইতেই কার্পাসজাত শিল্প-বিজ্ঞান ক্রমে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত অন্যান্য দেশসমূহে বিস্তারলাভ করে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কার্পাস শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'কার্পাসী'। ভারতীয় কার্পাস-সভ্যতা দেশ বিদেশে বিস্তার

লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যেও শব্দটি অপভ্রংশ হইয়া প্রচলিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ আছে।

গ্রীকদের উপর কার্পাস-সভ্যতার প্রভাব

বিদেশীদের মধ্যে ভারতীয় কার্পাস ও কার্পাসশিল্প সম্বন্ধে প্রথম পরিচয় লাভ করে গ্রীকেরা। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদটাস খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৫ সালে ভারতীয় কার্পাসের নিম্নলিখিত বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন—"ভারতবর্ষে এক-প্রকার বন্য গাছের ফলের রেশ হইতে যে সূতা হয়, তাহা গুণে ও সৌন্দর্যে পশম (মেষজাত লোম) হইতে উৎকৃষ্ট। ভারতীয়েরা ইহার সূতায় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পরিধান করে।"* হেরোদটাস কার্পাসের নাম উল্লেখ করেন নাই, একপ্রকার বন্যগাছ বলিয়াই কার্পাসের পরিচয় দিয়াছেন।

ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী দেশসমূহে কার্পাস-শিল্পের প্রসার

আরবেরা স্থলপথে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগস্থাপন করিয়াছিল। আরবদেশীয় ব্যবসায়ীরা খুব সম্ভব ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে ভারতীয় কার্পাসশিল্পের তথ্য খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর পূর্বে প্রচার করিয়াছিল।

গ্রীকসাহিত্যে 'কারবাসিনা'

খ্রীষ্টপূর্ব ১৬৯ অব্দে রচিত এক গ্রীকনাট্যে 'কারবাসিনা' (Carbasina) শব্দের উল্লেখ আছে। ইহা সংস্কৃত 'কার্পাসী' শব্দের রূপান্তর মাত্র। সেই সময়কার গ্রীকসাহিত্যে কার্বাসা অর্থাৎ কার্পাসজাত সূতা, আর 'কার্বাসাম,' অর্থাৎ তূলার রেশ, এই দুইটি শব্দেরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক্ ঐতিহাসিক প্লিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৭০ অব্দে কার্বাসামের তাঁবুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

* The wild trees in that country (India) bear for their fruit a fleece surpassing those of sheep in beauty and quality and the natives clothe themselves in cloth made therefrom. (Herodotus in 425 B.C.)

'কটন' শব্দের উৎপত্তি

কার্পাস ও কার্পাস-শিল্পের আদি দেশ যে ভারতবর্ষ গ্রীকেরা তাহা ভাল করিয়াই জানিত। কিন্তু দক্ষ আরব-বণিকদের কল্যাণে কার্পাসশিল্প-সম্বন্ধে জ্ঞান ইউরোপীয় দেশসমূহে বিস্তার লাভ করে।

মধ্যযুগে স্পেন দেশে কার্পাসশিল্প প্রচারের গৌরব মূরদের প্রাপ্য। আধুনিক 'কটন' শব্দের ব্যুৎপত্তিস্থল আরবী শব্দ Kton। ইহা মধ্যযুগীয় ল্যাটিন 'কটনাম' (cotonum) শব্দের অপভ্রংশ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইটালীয় বণিকদের হিসাবের খাতায় 'কটনাম' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে 'কটনাম' শব্দ বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অপভ্রংশ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে রূপান্তরিত হইয়াছে—যেমন ইংরাজীতে cotton, ইতালী ভাষায় coton, ফরাসী ভাষায় coton, জার্মান ভাষায় Kattum, রুশ ভাষায় Kotnja, রুমানিয়ান ভাষায় Kutnic ইত্যাদি।

প্রাচীন ইতিহাসে কার্পাসসূতার বস্ত্র ও পরিধেয়

প্রাচীন সংস্কৃত 'কার্পাসী' শব্দের অর্থ কার্পাস তূলার গাছ। বাংলা ও হিন্দিতে কার্পাসকে কাপাসও বলা হইয়া থাকে।

কার্পাস ভিন্ন অন্য রেশজ বস্ত্রাদি,†—যথা সিল্ক, পশম* বস্ত্রাদিও ব্যবহৃত

† অত উর্ধ্বং ব্রণবন্ধন দ্রব্যানি উপদেক্ষ্যামঃ। তদ যথা—কার্পাসাবিক দুকূল কৌশেয় পত্রোর্ণ চীন, পট্ট ইত্যাদি। সুশ্রুত, সূত্রস্থান ১৮। (কার্পাস, আবিক। ভেড়ার লোম) দুকূল—অতি সূক্ষ্মবস্ত্র (made of the inner bark of the plant) কৌশেয় (রেশম), পত্রোর্ণ—সিল্ক (সিল্ক বা কার্পাস)।

* বি তন্বতে ধিয়ো অস্মা অপাংসি বস্ত্রা পুত্রায় মাতোরা বয়ন্তি : ঋগ্বেদ ৫।৪৭।৬
সীসেন তন্ত্রং মনসা মনীষিণ উর্ণসূত্রেণ কবয়ো বয়ন্তি। যজুর্বেদ, ১৯।৮০
যা অকৃন্তন্নবয়ন যাশ্চতত্নিরে যা দেবী রন্তা অভিতো দদন্ত।
তাস্ত্বা সরসে সংব্যয়ন্ত্বায়ুষ্মতীদং পরিধা স্ব বাসঃ॥ অথর্ববেদ, ১৪।১।৪৫

হইত ; কিন্তু কার্পাস-সূতায় তৈরী বস্ত্র আজ যেমন, তেমনি অন্ততঃ আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেও এদেশবাসীর দেহাভরণের কাজ করিত।

ভারত-অভিযানকারী আলেকজেণ্ডারের সেনাপতি নেয়ারচস খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে এদেশবাসীর পোষাক পরিচ্ছদের বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন—"ভারতবাসীরা কার্পাস-সূতায় কাপড় বুনে, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামা পরিধান করে, ভাঁজ করা কাপড়ের টুকরা (চাদর) গলায় জড়ায়, এবং মাথায় পাগড়ী পরিধান করে।"[১] গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে এদেশে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষদর্শিরূপে এদেশবাসীর পোষাকের বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন—"ভারতবাসীদের জীবন-যাত্রা-প্রণালী সরল বটে, কিন্তু তাহারা সূক্ষ্ম ও সুরুচিসম্পন্ন বস্ত্র ও অলংকারাদি ভালবাসে। তাহাদের পোষাকে জরির কাজ থাকে, বহুমূল্য পাথরও ব্যবহৃত হয় ; সূক্ষ্মতম মসলিনের রঙ্গীন পোষাকও তাহারা পরিধান করিয়া থাকে।"[২]

নেয়ারচসের বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায় যে, সে সময় হইতে আজ পর্যন্ত সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানেও ভারতীয় পোষাক পরিচ্ছদের মৌলিক পরিবর্তন সামান্যই ঘটিয়াছে। তাঁহার বর্ণনায় আমাদের পুরুষদের পোষাকই বিশেষ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অজন্তার গুহাচিত্রেও দেখা যায় প্রাচীন ভারতের অধিবাসীদের পোষাকের মৌলিক ধারা আজও অপ্রতিহত। প্রাচীনকালে

১ The native made linen (cotton) garments, wearing a shirt which reached to the middle of the leg, a sheet folded over the shoulders and a turban round the head—Nearchos in 300 B.C.

২ In contrast to the general simplicity of their lives, the Indians love finery and ornament. Their robes are worked in gold and ornamented with precious stones, and they wear also flowered garments made of the finest muslins.

পুরুষেরা পরনে ধুতি, গায়ে ঢিলা জামা অর্থাৎ পাঞ্জাবী ও গলায় চাদর পরিত, মাথায় পাগড়ী শোভা পাইত; পুরুষের অনুরূপ দেহাচ্ছাদন আজও প্রচলিত। প্রাচীনকালে মেয়েরা শাড়ী পরিত, আজও তাহারা পরিয়া থাকে। গো-শকটের ন্যায় এতদ্দেশীয় পোষাকের ধারাও অতি প্রাচীন। বিজাতীয় শাসকদের প্রভাবও দেশীপ্রথা লুপ্ত করিতে পারে নাই।

গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে ধুতি, চাদর ও শাড়ীর ব্যবহার কত আরামদায়ক তাহা বুঝিতে অনুমানের সাহায্য লইতে হয় না। আমাদের বস্ত্রাদিতে, বিশেষ করিয়া ধুতি চাদর ও শাড়ীতে কাটা ছাঁটা—এক কথায় সেলাইয়ের কাজ একেবারেই নাই। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে ভারতীয় পরিচ্ছদ-প্রণালী দর্জীর কাজের উপর নির্ভরশীল ছিল না। সত্য বটে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে ইদানীং আমাদের পোষাকে দর্জীর কাজ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদের মাতারাও ব্লাউস, গাউন বিশেষ পরিতেন না। বিগত দুই দশক মধ্যে ইহাদের প্রচলন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু দর্জীর কাজ বৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের দেহাভরণের সৌষ্ঠব বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাহা রুচির কথা এবং সেক্ষেত্রে কোন মতামত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থানকালে অবস্থাপন্ন লোকদের সঙ্গেই বেশী মেলামেশা করিয়াছিলেন,—এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অর্থাৎ এদেশের সর্বসাধারণ হয়তো বা বহুমূল্য মসলিন কাপড় পরিতে সমর্থ হইত না। কিন্তু সকল অবস্থাতেই স্বীকার করিতে হইবে যে, সূক্ষ্ম মসলিন কাপড় রঙাইবার ভিন্ন ভিন্ন প্রথা, কাপড়ে সূক্ষ্মতম জরির কাজ তখন এদেশে প্রচলিত ছিল। আজকাল দেশের স্থানে স্থানে (যেমন বেনারসী শাড়ীতে ও কাশ্মীরী শালে) সোনা-রূপার সূত্রে যে জরির কাজ হয়, তাহা প্রাচীন প্রথারই ধারা—উত্তরাধিকারীসূত্রে চলিয়া আসিয়াছে।

বিদেশী সাহিত্যে ভারতীয় প্রাচীন বস্ত্ররঞ্জন

সূতা ও কাপড় রঙাইবার প্রথা সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসেরও পূর্বে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদটাস খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে লিখিয়াছেন—"তাহাদের দেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) এমন একপ্রকার গাছ জন্মে, যার পাতার গুণ অদ্ভুত। সেই পাতাকে গুঁড়া করিয়া জলে মিশাইলে রং প্রস্তুত হয়; পোষাকের উপর সেই রঙের ছবি আঁকা যায়। এই রং এত পাকা যে ধুইলেও মুছিয়া যায় না, মনে হয় যেন বুনার সঙ্গে এক হইয়া আছে। কাপড় যতদিন টেকে, রংও ততদিন অটুট থাকে।"[১] গ্রীক ঐতিহাসিক যে নীলের গাছ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ প্রাচীন ভারতবর্ষে কাপড় রঙাইবার জন্য নীলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

টেসিয়াস নামক জনৈক গ্রীক বৈদ্য খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে ভারতীয় বস্ত্ররঞ্জন সম্পর্কে আর এক বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, ভারতে তৈরী অপূর্ব রঙীন বস্ত্রাদি পারস্য দেশের সৌখীন রমণীগণ বিশেষ পছন্দ ও সমাদর করিতেন।[২]

সূতা ও কাপড় রঙাইবার বিভিন্ন প্রণালী এদেশে সে যুগেই দৃঢ়ভাবে স্থিতিলাভ করিয়াছিল, এরূপ মনে করা মোটেই অসঙ্গত নয়। ইহার অর্থ

১ They have trees whose leaves possess a most singular property. They beat them into powder and then steep them into water. This forms a dye with which they paint figures of animals on a garment. The impression is so strong that it cannot be washed out and it appears to be interwoven in the cloth and wears as long as the garment.

২ The Greek physician Ktesias in 400 B.C. mentions the flowered cottons emblazened with glowing colours much coveted by the fair Persian women and exported from India.
(Crawford: Heritage of Cotton)

এই যে আরও প্রাচীন কাল হইতে বস্ত্ররঞ্জনের চর্চা এদেশে হইতেছিল।* সেই সময় সঠিকভাবে নিরূপণ করিতে হইলে আরও গবেষণার প্রয়োজন।

গ্রীক ঐতিহাসিক প্লিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৭০ অব্দে ইজিপ্টের রঞ্জনপ্রণালী সম্বন্ধে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন; সেই বর্ণনার সঙ্গে ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী যেস্থইট বর্ণিত ভারতীয় বস্ত্ররঞ্জন প্রণালীর অপরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।১

ভারতীয় প্রাচীন বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে বিদেশীয় ঐতিহাসিক ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে কার্পাস বস্ত্র-শিল্পের অতুলনীয় উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যগত যোগাযোগ কমপক্ষে আলেকজেণ্ডারের সময় হইতেই সূচিত হইয়াছিল। আরব বণিকেরাই প্রধানতঃ স্থলপথে আন্তর্জাতিক এই ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করে। আরব বণিকেরা ইউরোপীয় পশম বস্ত্রাদি, গ্লাস, প্রবাল, মদ, ইত্যাদি ভারতের বাজারে আমদানী করিত আর এই দেশ হইতে সিল্ক, কার্পাসজাত দ্রব্যাদি, মূল্যবান মণিমুক্তা, গুড়ুচ্যাদি গন্ধদ্রব্য, আইভরি ইউরোপের বাজারে লইয়া যাইত। ইতিহাস প্রসিদ্ধ মার্কোপলো ১৩শ শতাব্দীর শেষার্ধে করমণ্ডলে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। তিনি মসলীপট্টমের রঙ্গীন ছাপের কাপড় ও অতুলনীয় মসলিনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।২

* সরস্বতী মনসা পেশলং বসুনাসত্যাভ্যাং বয়তি দর্শতং বপুঃ।
রসং পরিস্রুতান রোহিতং নগ্নহুধীরস্তু সরং ন বেম॥ যজুর্বেদ, ১৯।৮৩

১ The art of resist dying spread among all the people, who came in contact directly or indirectly with Indian influence, and there is still a reminiscence of this among the peasants of Europe. These facts seem to establish India as the home, not only of cotton, but of certain processes of dyeing and printing cotton.

২ Marco Polo (1256-1326), the famous Venetian traveller and explorer, who made journeys through China, India and other Eastern countries and published the record of his various wanderings ...... (Pear's Cyclopaedia)

মোট কথা, ভারতীয় বস্ত্ররঞ্জন তখনকার বিদেশীদিগকে মোহিত করিয়াছিল। প্রাচীনকালেই অন্ততঃ চারি প্রকার কাপড় রঙাইবার প্রণালী এদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ইহাদের ব্যবহার ব্যাপক ছিল। এই চারি প্রকার রঞ্জনের কাজের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে ঃ—

(১) কাপড়ের উপর ছাপ করা ডিজাইন (২) হাতে আঁকা ডিজাইনের কাজ (৩) বাটিকের কাজ ও (৪) রাসায়নিক রঙের কাজ।

ছাপের কাজ ঃ—কাঠের ব্লকে বিশেষ বিশেষ ডিজাইন কাটিয়া ইহা দ্বারা কাপড়ের উপর রংয়ের ছাপ দেওয়া হইত। ইহা অতি প্রাচীন প্রথা। শুধু যে কাঠের ব্লকে খুদিয়াই ডিজাইন কাটা হইত এমন নয়, কাঠের গায়ে ফিতা বসাইয়াও ডিজাইন করা হইত। ছাপের ব্লকের গায়ে তুলি বা তুলার দ্বারা রং লাগানো হইত।

বাটিক ঃ—বাটিকও অতি প্রাচীন বস্ত্রশিল্পকলা, গলানো মোম অথবা কাদা দ্বারা কাপড়ের উপরের ডিজাইন চিত্রিত করা হইত ; পরে কাপড় রঙে ভিজান হইত ; মোম বা কাদার স্থানে রং লাগিত না। এই ভাবে মনোরম ডিজাইনের কাজ হইত। জাভাতে বাটিক প্রবর্তিত হইয়াছিল। একই প্রথার অনুসরণে একটু ভিন্ন প্রণালীর বাটিকও প্রচলিত ছিল, তাহাকে গিঁট প্রথা (tie dyeing) বলা যাইতে পারে। এই প্রথায় মনোরম ডিজাইনের কাজ হইত। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রথা সহজ মনে হইলেও এই কাজে বিশেষ দক্ষ হস্তের প্রয়োজন হইত। এই প্রথা প্রাচীন কালেই তিব্বত, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ও পশ্চিমে বলকান অতিক্রম করিয়া মধ্য ইউরোপে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

রাসায়নিক বস্ত্ররঞ্জন সম্বন্ধে বলা যায় যে, ডিজাইন-সম্বলিত ষ্ট্যাম্প অথবা তুলি দিয়া বিভিন্ন রাসায়নিক তরল পদার্থ কাপড়ের গায়ে লাগাইয়া পরে তরল রঙ-বিশিষ্ট পাত্রে কাপড় ভিজান হইত। বিভিন্ন রাসায়নিক

দ্রব্যের গুণে একই রঙ বিভিন্ন রঙে ফুটিয়া উঠিত। এই প্রথায় রঙ করিতে অবশ্য রসায়ন সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন হইত; সেজন্য হয়ত ইহা ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইত না। ক্যালিকো প্রিন্টিং-এর ইতিহাসে রাসায়নিক প্রথা প্রাচীন, যদিও কার্য কারণের সমাবেশে ইহার ক্ষেত্র পরে সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়।

ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। প্রাচীন বস্ত্রাদি সংরক্ষণের পক্ষে এদেশের জলবায়ু অনুকূল নহে। সে জন্য কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া প্রাচীন কালের বস্ত্রাদির নিদর্শন সামান্যই রক্ষিত হইয়াছে। ইজিপ্টের পিরামিডে সহস্রাধিক বৎসরের পূর্বেকার ভারতীয় মসলিন পাওয়া গিয়াছে। গোবি মরুভূমিতে প্রাচীন ছাপের রঙীন বস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন-কালের বস্ত্রকলার অভূতপূর্ব উন্নতির নিদর্শন প্রাচীন চিত্রকলা দেখিলে বুঝা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ অজন্তা গুহার ফ্রেস্কোর উল্লেখ করা যাইতে পারে। তখনকার প্রচলিত বস্ত্রাদি ও পোষাকের ব্যবহারই সেখানে চিত্রিত হইয়াছে। এদেশে মুসলমান-অভিযানের পূর্বে বস্ত্রশিল্পকলা বিশেষ উন্নত স্তরে পৌছিয়াছিল। মুসলমান রাজা-বাদশাদের আমলে সৌখীন নবাবেরা শিল্পানুরাগী ছিলেন; নিছক শিল্পকলার দিক দিয়া বিচার করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, মুসলমান রাজাদের আমলেও ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকলা নূতন ভাবধারায় পুষ্ট হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পরিত্যক্ত অম্বর শহরের ধ্বংসাবশেষ হইতে কতকগুলি মনোরম প্রাচীন কার্পাসবস্ত্র উদ্ধার করা হইয়াছে; সেগুলি এখন যত্নসহকারে আমেরিকার ব্রুকলিন শহরের মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। ইহাদের অধিকাংশই চিত্রিত এবং দেওয়ালের বস্ত্রাভরণ।

মনুসংহিতা-রচনার কালে বস্ত্রশিল্প

হিন্দু আইন ও অনুশাসন-প্রণেতা মনুর সময়ে এদেশে বস্ত্রশিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল; ইহার বহু প্রমাণ মনুসংহিতায় পাওয়া যায়। কোন কোন

ঐতিহাসিকের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০-৭০০ অব্দে মনুসংহিতা রচিত হইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে মনুসংহিতা আরও প্রাচীন গ্রন্থ। সে যাহা হউক, মনুসংহিতা যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। পরিধেয় বস্ত্র সংক্রান্ত বহু অনুশাসন মনুসংহিতায় আছে। তাঁতিদের সম্বন্ধে মনু লিখিয়াছেন—

"তন্তুবায় বস্ত্রবয়নপণ্য দশ পল পরিমিত সূত্র গৃহস্থের নিকট হইতে লইলে পিষ্টভক্তাদির অনুপ্রবেশহেতু একাদশ পল পরিমিত বস্ত্র ফিরাইয়া দিবে।"*

পিষ্টভক্তাদি বলিতে 'মাড়' বা মাড়জাতীয় জিনিস বুঝায়। এদেশের তাঁতিরা আজ যেমন টানার সূতায় মাড় দেয়, মনুর যুগেও সেই রীতিই বিদ্যমান ছিল। বরং উল্‌টাইয়া একথা বলা সংগত যে, মনুর যুগের প্রচলিত প্রথা আজও বিদ্যমান। যাঁহারা আপন হস্তে সূতা কাটিয়া তাঁতি দ্বারা কাপড় বুনাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে বয়নকালে হাতে কাটা সূতার শক্তির অসমতা হেতু অল্পবিস্তর অপচয় ঘটিয়া থাকে। এই অপচয় হয় না, যদি সূতা উত্তমগুণবিশিষ্ট হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, সে যুগে হাতে সূতাকাটার কৌশল, জ্ঞান ও দক্ষতা কত উচ্চে উন্নীত হইয়াছিল। মনুর উক্ত বচন হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কার্পাসশিল্প তখন সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। গৃহস্থেরা অবসরমত সূতা কাটিত আর তাঁতি কাপড় বুনিত। কর্মের এই জাতিগত শ্রেণীবিভাগ এদেশে এখনও চলিয়া আসিতেছে। মনুর অনুশাসন হইতে আরও অনুমান করা যায় যে, একশ্রেণীর লোক বস্ত্রব্যবসায়ী ছিল। তাহারা গৃহস্থদের কাটা সূতা সংগ্রহ করিয়া তাঁতি দ্বারা বস্ত্র বুনাইয়া বস্ত্রের ব্যবসা করিত। কিন্তু

* "তন্তুবায়ো দশপলং দদ্যাদেকপলাধিকম্
অতোঽন্যথা বর্তমামো দাপ্যো দ্বাদশকং দনম্॥"
(অষ্টম অধ্যায়ঃ, শ্লোক ৩৯৭)

সকল প্রকার বস্ত্রের ব্যবসা চলিত না। এ সম্বন্ধে মনুর অনুশাসন এই যে,—"কুসুম্ভাদি দ্বারা রক্তবর্ণ সূত্রবিনির্মিত বস্ত্র,—রক্তবর্ণ না হইলেও শণ ও অতসী তন্তুময় বস্ত্র এবং মেষলোম-বিনির্মিত কম্বলাদি বিক্রয় নিষেধ।"১ বিভিন্ন তন্তুজাত বস্ত্রাদির পরিষ্করণ-পদ্ধতি সম্বন্ধেও মনুর নির্দেশ আছে। যথা :—"কৌষেয় ও আবিক বস্ত্রাদি ক্ষার ও মৃত্তিকা দ্বারা পরিষ্কৃত হয়। কুতপ বস্ত্র অরিষ্ট অর্থাৎ রিঠাফলচূর্ণ দ্বারা, অংশুপট্ট—বিল্বফলের নির্যাস দ্বারা এবং ক্ষৌমবস্ত্র শ্বেত সর্ষপ চূর্ণ দ্বারা শুদ্ধ হয়।"২

বস্ত্রনির্মাণে কোন্ কোন্ তন্তু সেই যুগে ব্যবহৃত হইত, তাহা উপরি-উক্ত শ্লোক দুইটি হইতে জানা যায়। যথা :—কার্পাসবস্ত্র, শণবস্ত্র, অতসীতন্তুময় বস্ত্র, মেষলোমজাত কম্বল, কৌষেয় অর্থাৎ রেশমী বা সিল্কের বস্ত্র, অংশুপট্ট অর্থাৎ বল্কলবিশেষের বস্ত্র ও ক্ষৌমবস্ত্র।

জন্তুর লোম অর্থাৎ পশমজাতীয় গরম কাপড়ও বিভিন্ন প্রকারের বর্তমান ছিল। আবিক শব্দের অর্থ মেষলোমজাত কম্বলাদি বলিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে। 'কুতপ' নেপালদেশীয় কম্বল। ক্ষৌমবস্ত্র বলিতে তিসির (শণ ?) তন্তুদ্বারা তৈরি বস্ত্র বুঝায়। বল্কলবিশেথের বস্ত্রকে অংশুপট্ট বলা হইয়াছে। এই শেষোক্ত প্রকারের বস্ত্র ভিন্ন অন্য সকল প্রকারের বস্ত্র আজও তৈরি হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ গাছের বল্কল যে পরিধানোপযোগী করার প্রথা এদেশে বর্তমান ছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ধা শহরের সর্বভারতীয় পল্লীশিল্পাগারে

১ "সর্বঞ্চ তান্তবং রক্তং শাণক্ষৌমাবিকানি চ।
অপি চেৎ স্যুররক্তানি ফলমুলে তথৌষধীঃ"
(মনুসংহিতা : দশম অধ্যায়, ৮৭ শ্লোক)

২ "কৌষেয়াবিকয়োরূষৈঃ কুতপানামরিষ্টকৈঃ।
শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং ক্ষৌমাণাং গৌরসর্ষপৈঃ॥"
(মনুসংহিতা : পঞ্চম অধ্যায়, ১২০ শ্লোক)

(All India Village Industry Museum, Wardha) জাভায় তৈরি একটি বল্কলবস্ত্রের নমুনা রক্ষিত আছে। ইহা কোন জাভাবাসী মহাত্মা গান্ধীকে উপহার দিয়াছিল, তিনি তাহা শিল্পাগারে দান করিয়াছিলেন।

জাভা ও সুদূর পূর্বদেশসমূহে ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব বহুকাল পূর্বেই বিস্তারলাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন পুরাণাদি ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যেও বল্কলবস্ত্রের উল্লেখ আছে। মুনি-ঋষিরা বল্কলবস্ত্র পরিধান করিতেন। বল্কলবস্ত্রের অস্তিত্ব কাল্পনিক নহে; অসভ্য আদিম মানুষের দেহাভরণ ভিন্নও জ্ঞানী, গুণী, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ কোনকালে বল্কল পরিধান করিতেন। এমন হইতে পারে তন্তু দ্বারা বস্ত্র তৈরির প্রথা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে বল্কলবস্ত্রই প্রচলিত ছিল এবং তন্তুজ বস্ত্রাদি আবিষ্কারের পরেও বল্কল-বস্ত্রের ব্যবহার বর্তমান ছিল। অন্ততঃ প্রাচীন সাহিত্য তাহাই নির্দেশ করে। জাভায় তৈরী যে বল্কলবস্ত্রের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, শিল্প ও সৌন্দর্যের দিক দিয়া ইহা একটি মনোরম বস্তু।

শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী 'জাপানভ্রমণ' শীর্ষক প্রবন্ধে (প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪৪) বল্কলবস্ত্রের যে সন্ধান দিয়াছেন তাহা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। —"সিংগাপুরের র‍্যাফেলস্ মিউজিয়মে সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ থেকে সংগৃহীত কাপড় ও গহনার চটক সহজেই চোখে পড়ে।" অন্য এক জায়গায়—"গাছের বাকলের পোষাকও অনেক রকমের আছে। এসব অন্য দেশে বড় দেখিনি। ......যাঁরা নানা দেশের বিশেষতঃ প্রাচ্যের পোষাক সম্বন্ধে ভাল করে জানতে চান, সিংগাপুর মিউজিয়মের পোষাকগুলি তাদের নিশ্চয়ই দেখা উচিত।"

ভিন্ন ভিন্ন তন্তু হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্রাদি পরিষ্কারপ্রকরণ খ্রীষ্টজন্মের বহু শত বৎসর পূর্বে ভারতবাসীরা আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহাও মনুর অনুশাসন হইতে জানা যায়।—"অনেক বস্ত্র অশুদ্ধ হইলে জলপ্রোক্ষণ দ্বারা তাহা শুদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু অল্প বস্ত্রস্থলে জল দ্বারা

প্রক্ষালন করিয়া তাহাদের শুদ্ধিসম্পাদন করিতে হয়।"[১] যে সকল হিন্দু-পরিবারে প্রাচীন শৌচাশৌচভেদ এখনও চিরাচরিত প্রথায় বর্তমান, তাঁহারা উক্ত অনুশাসনের অর্থ সহজেই গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, মহাভারত[২] প্রভৃতি গ্রন্থেও বস্ত্রসম্বন্ধে বহু উল্লেখ আছে। প্রধান কথা এই যে, অতি প্রাচীনকালে এদেশে বস্ত্রশিল্প বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। দৈনন্দিন জীবনে দেহাভরণের জন্য এই অতি প্রয়োজনীয় বস্ত্রশিল্প এদেশবাসীর রুচি, কল্পনা ও সৃজনী শক্তির বিকাশের অঙ্গরূপে ব্যক্তিত্ব-অভিব্যক্তির একটি বিশেষ আধারে পরিণত হইয়াছিল; সেই আধার এদেশবাসীর বস্ত্রস্বাধীনতাকে স্থায়ী রূপ দান করিয়াছিল। সহস্র সহস্র বৎসর এই প্রথা পরিবর্তনশীল কালের প্রগতি উপেক্ষা করিয়া প্রয়োজনপূরণের সঙ্গে এদেশবাসীর সুরুচি ও শিল্পজ্ঞানকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর পথে চালনা করিয়াছিল। ভারতবাসীর অপূর্ব বস্ত্রশিল্পকলা ও নৈপুণ্য সর্বসাধারণের করায়ত্ত ছিল, বলাই বাহুল্য। ইহা কি উপায়ে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা ভাবিবার বিষয়। তাছাড়া গ্রীস হইতে আরম্ভ করিয়া তিনটি মহাদেশের অধিবাসীদেরও ভারতীয় বস্ত্রশিল্প বিস্ময়ের কারণ ছিল। প্রশ্ন এই, ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত এই অপরূপ শিল্পসাধনা ও বস্ত্রস্বাতন্ত্র্যের দ্বার হঠাৎ রুদ্ধ হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর ইতিহাস হইতেই পাইতে হইবে।

তকলি ও চরখার জন্ম

আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা মিহি ঢাকাই মসলিনের

১ "অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহূনাং ধান্যবাসসাম্।
প্রক্ষালনেন ত্বল্পানামদ্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে ॥"
(মনুসংহিতা : পঞ্চম অধ্যায়, ১১৮ শ্লোক)

২ "যাত্রাকালে উত্তরা ও তাঁর সখীরা বললেন, বৃহন্নলা, তুমি ভীষ্মদ্রোণাদিকে জয় করে আমাদের পুত্তলিকার জন্য বিচিত্র সূক্ষ্ম কোমল বস্ত্র এনো।"
(মহাভারত, বিরাটপর্ব—রাজশেখর বসু)

যে ঐতিহাসিক কাহিনী পাই, সেই মসলিনের সূক্ষ্ম সূতা একটি প্রাচীন—খুব সম্ভব প্রাচীনতম একটি সামান্য যন্ত্রসাহায্যে কাটা হইত। ইহারই নাম তকলি। চরখার জন্মও এদেশেই অতিপূর্বে ঘটিয়াছিল। মিহি সূতা কাটিবার জন্য তকলি ব্যবহৃত হইত। বস্তুতঃ এই আদিম সহজ সরল যন্ত্রটি দ্বারা এদেশের বস্ত্রশিল্পী যে অনুপম শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছিল, ইহার অনুরূপ কিছু বর্তমান তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুগেও এযাবৎ সম্ভব হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর ঢাকাই মসলিনের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে একগজ চওড়া ও সতের গজ লম্বা কাপড়ের ওজন মাত্র ৯০০ গ্রেন্; অর্থাৎ প্রতি বর্গগজ মসলিনের ওজন মাত্র ৬০ গ্রেন্। ইউরোপের সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত তাঁতিরা যে মিহি কাপড় বুনিত, ইহার ওজন অন্ততঃ ৪।৫ গুণ বেশী। ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি একসময় দেশে-বিদেশে ছড়াইয়াছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এত সূক্ষ্ম সূতা অন্য কোন দেশের তাঁতে আজ পর্যন্ত বোনা সম্ভব হয় নাই। ঢাকার মসলিনশিল্প আশী নব্বই বৎসর পূর্বেও সক্রিয় ছিল। যে তকলিতে মসলিনের সূতা-কাটা হইত, ইহার চালনা-পদ্ধতির সঙ্গে আমেরিকার ঐতিহাসিক ক্রোফোর্ড সাহেব সুদক্ষ বেহালাবাদকের স্বরলহরী সৃষ্টির উপমা দিয়াছেন।*

তকলি-ব্যবহারের নৈপুণ্য অনুভূতিসাপেক্ষ—ইহার বর্ণনা দেওয়া কঠিন।

* ক্রোফোর্ড স্থানান্তরে লিখিয়াছেন— 'One of the most romantic phases of the cotton story in India concerns the gossamer muslins for which Dacca was once famous. There are occasional references to these fabrics among the classical writers, but surer proof exists in Indo-Greco statutory of the first and second century of the Christian Era........One significant feature of these statues is the way in which a fabric of incredible lightness has been perfectly draped in natural folds on the human form. No artist could model such a quality, unless familiar with it."

অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহা অনুভব না করিলে নিছক বুদ্ধিবৃত্তির সহায়ে বা কলের মত তকলি চালাইয়াও তাহা বুঝা সম্ভব নয়। তূলার ন্যায় কোমলতম বস্তুদ্বারা একটি সরল যন্ত্র সাহায্যে এত সূক্ষ্ম বস্তু তৈরী করা অর্থাৎ সূতাকাটার চর্চা শিল্পজগতে একটি অভিনব ব্যাপার। তকলি সম্বন্ধে আমি যে সামান্য অনুশীলন করিয়াছি, তাহাতে আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ইহা একটি যোগবিশেষ এবং ইহার যথাযথ প্রবর্তন শিক্ষাজগতে একটি নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিতে সমর্থ।

ঢাকার মসলিন সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইয়া কাজ করিবার সময় স্বর্গীয় রসিকলাল গুপ্ত-রচিত 'রাজবল্লভ' নামক একটি ঐতিহাসিক পুস্তকের বিশেষ অংশ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বইখানা ১৩১১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর খাদি-আন্দোলনের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজা রাজবল্লভের রাজত্বকালে রাজনগরের বর্ণনায় আছে—"কেহই উৎকট ধনাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রণোদিত হইত না, সকলেই সংযত জীবন যাপন করিত। অতিথি আসিয়া কোন গৃহস্থের আলয় হইতে বিমুখ হইয়া যাইত না। সমস্ত রাজনগরে একটি মাত্র সমাজ ছিল এবং রাজবল্লভ ও তাঁহার উত্তর পুরুষগণ সেই সমাজের নেতা ছিলেন। গ্রাম্য দলাদলির ঝঞ্ঝাবাত কখনও এই সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।"

"মধ্যাহ্ন-আহারের পর সকলেই বিশ্রামসুখ ভোগ করিত। এই সময় রমণীগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মিলিত হইয়া চরকায় সূতা কাটিত এবং সঙ্গে সঙ্গে খোস গল্প করিয়া একে অন্যের চিত্তবিনোদন করিত। প্রাচীন ও প্রাচীনাগণ বিশেষ বিশেষ স্থানে একত্র হইয়া রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুস্তকের পূতকাহিনী শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া যাইত। যামিনীর প্রথম ভাগে বর্ষীয়সীরা নিজ নিজ গৃহকোণে বসিয়া চরখায় সূতা কাটিত এবং পরিবারস্থ বালকবালিকাগণ উপকথা শুনিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে

ঘিরিয়া বসিত। গভীর রাত্রি পর্যন্ত চরখার ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে উপকথা চলিতে থাকিত।

"বিধাতার নির্বন্ধে এই আনন্দধাম অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। অতি অশুভক্ষণে অনন্ত কালসাগরে বাঙ্গালা ১২৭৬ সাল সমাগত হইল। 'রথখোলা' নামে যে নদী এতদিন ক্ষুদ্র কলেবরে প্রবহমান হইতেছিল, তাহা সহসা বর্ষাকালে স্ফীত হইয়া ক্ষুধার্তা রাক্ষসীর ন্যায় করাল বদন বিস্তার করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নগরের অধিকাংশ সৌধমালা অল্পকাল মধ্যেই রথখোলার কুক্ষিগত হইয়া গেল।"

'রাজবল্লভ' ঐতিহাসিক পুস্তক। ইহাতে ঢাকার রাজবল্লভের কাহিনী ও দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কথা আলোচিত হইয়াছে। ইহার লেখক প্রসঙ্গান্তরে বাংলা দেশের একটি লুপ্ত নগরের সামাজিক পরিবেশে চরখার ব্যবহার কিরূপ ছিল তাহাই আলোচনা করিয়াছেন; রাজনগর ১২৭৬ সালে নদীবক্ষে বিলীন হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আট দশক পূর্বেও বাংলার স্থানে স্থানে চরখার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ইহার পূর্ববর্তীকালে যে সূতা হাতে কাটিবার প্রথা আরও ব্যাপক ছিল, সে প্রমাণ বহু বিদেশী পর্যটকের বর্ণনায় পাওয়া যায়।

রালফ্, ফিচ্ নামক ইংরেজ পর্যটক আকবরের সময় পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায়—"তৎকালে স্থবর্ণগ্রামে যে সূক্ষ্ম মলমল প্রস্তুত হইত, তাহা ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।"

ওলন্দাজ কুঠীর অধ্যক্ষ পেলসির্ট সোনারগাঁও-এ উৎপন্ন বস্ত্রের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"উড়িষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত সমগ্র দেশ কার্পাস-শিল্পের একটি বিরাট কারখানাস্বরূপ ছিল। প্রায় সকল গ্রামে ও নগরের অধিবাসীগণ কার্পাস ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি উৎপাদনে ব্যাপৃত থাকিত।"

সেই সময়কার এক ফরাসী পর্যটকের বিবরণী হইতে জানা যায়, "প্রতি

বৎসর অন্যূন পঁচিশ লক্ষ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হইত এবং তন্মধ্যে দশ লক্ষ পরিমিত রেশমের বস্ত্র এদেশেই প্রস্তুত হইত।"

এখন প্রশ্ন এই যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সহস্র সহস্র বৎসরের বস্ত্রশিল্প চর্চা আমাদের জীবন হইতে তিরোহিত হইল কেন? শুধু কাপড়ের কলই কি এজন্য দায়ী? ইহার উত্তর এই যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরাধীনতা ও সংস্কৃতিগত অদূরদর্শী অনুকরণপ্রিয়তাই এই দুর্দশার মূল কারণ ছিল। আমাদের অপূর্ব বস্ত্রশিল্প-সাধনার পথ আবার সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে প্রশস্ত করিতে হইলে আমাদিগকে আরও অনুসন্ধিৎসু হইয়া এ বিষয়ে বিচার করিতে হইবে। কাপড়ের কল মানুষেরই সৃষ্টি। কিন্তু এই সৃষ্টির মূল লক্ষ্য কী? সহজে সস্তায় সকলের বস্ত্রাভাব পূর্ণ করাই কি কল ও কল-মালিকের লক্ষ্য ছিল? যে পথে কাপড়ের কল আবিষ্কৃত হইয়াছে ও স্থিতি লাভ করিয়াছে এবং আমাদের নৈতিক, আর্থিক পরাধীনতাকে জাতিগতভাবে স্থায়ী করিয়া আমাদের অপূর্ব শিল্পকলা-সম্পর্কে স্মৃতিভ্রম ঘটাইয়াছে, ইতিহাসের নিকষপাথরে যাচাই করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর আজ আবার পাইতে হইবে। কারণ, শিল্প-বিকাশের উপর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মান স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প-পতনের পূর্বাভাস

উদার মোগল রাজাদের রাজত্বকালে পশ্চিমদেশীয় আগন্তুক ও ব্যবসায়িগণ রাজদরবারে সমাদর পাইতেন। পরবর্তী সময়ে ইহা ক্রমশঃ রুদ্ধ হইতে থাকে। ভারতের অপূর্ব শিল্পকলা ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে পশ্চিমাগতদের ঔৎসুক্যের পরিসীমা ছিল না। স্থলপথ বন্ধ হইবার পর তাঁহারা জলপথ আবিষ্কারের পন্থা খুঁজিতে লাগিলেন। ১৫শ শতাব্দীতে কলম্বাস জলপথে ভারতবর্ষ খুঁজিতে যাইয়া আমেরিকা পৌছিলেন। সেখানকার অধিবাসীদিগকে কার্পাসবস্ত্র-পরিহিত দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি ভারতবর্ষেই পৌছিয়াছেন।

পরবর্তী আবিষ্কারক পর্তুগীজ ভাস্কোদাগামা উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া ভারত মহাসাগর সাফল্যের সঙ্গে পাড়ি দিয়া ১৪৯৭ সালে ভারতবর্ষে পৌছেন। ভাস্কোদাগামার ভারতপথ আবিষ্কারের পর পর্তুগীজ বণিকেরা ভারতীয় বস্ত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্যের লাভজনক ব্যবসা চালাইতে আরম্ভ করে। সেই সময় হল্যাণ্ডের বণিকেরা লিসবন শহরের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য চালাইত। ফলে হল্যাণ্ডের বড় বড় শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রে—আন্তয়ার্প, বার্জেস, হারলেম প্রভৃতি স্থানেও ভারতীয় রঙ্গীন ছাপের কাপড় ও ক্যালিকোর আমদানী হইতে থাকে। ইহার কারণ সেই দেশবাসী এদেশীয় বস্ত্রাদি খুব পছন্দ করিত। বহু নাবিক ব্যবসায়ী তখন আইনকানুন উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় বস্ত্রাদির চোরাকারবার চালাইত এবং প্রচুর লাভ করিত। স্পেনীয় বণিকেরা প্রায় এক শতাব্দীকাল ভারত ও অন্যান্য পূর্বদেশের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। স্পেনের সমৃদ্ধিও এপথে বৃদ্ধি পায়। স্পেনীয়রা মেক্সিকো ও পেরো বিজয় করিয়া গর্বে আরও স্ফীত হইয়া উঠে। কিন্তু বিজয়মদে মত্ত স্পেন ১৫৮৮ সালে ইংরাজদের সহিত সংঘর্ষে হারিয়া গেল। ফলে স্পেনীয় বণিকদের ভারতীয় বস্ত্রসম্ভার ইউরোপে আমদানী করার পথ রুদ্ধ হইল। পূর্বদেশসমূহের বাণিজ্য-বন্দরসমূহ অন্য ইউরোপীয় নাবিক ব্যবসায়ীদের হস্তগত হইল। হল্যাণ্ডের নাবিক-ব্যবসায়ীরা ১৬০২ সালে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করিল। ইহার পূর্বে ১৫৮৭ সালে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক (Sir Francis Drake) নামক ইংরাজ পূর্বদেশজাত বাণিজ্য-দ্রব্যসম্ভার বোঝাই পর্তুগীজ অর্ণবপোত আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। ১৫৯২ সালে এরূপ আর একটি জাহাজ ইংরেজদের হস্তগত হয়। ইহা ক্যালিকো, সৌখীন বালিশ, কার্পেট ও অন্যবিধ মূল্যবান প্রাচ্যদেশীয় দ্রব্যসম্ভারে বোঝাই ছিল। ইংরেজ বণিক অভিযানকারীরা এই প্রথম ভারতীয় ঐশ্বর্যের সন্ধান পায়; ভারতের সঙ্গে যোগস্থাপন করিলে বিপুল লাভের সম্ভাবনা অনুভব করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

১৫৯৯ সালে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয়। ফরাসী বণিকেরাও বৃটিশের পদাঙ্ক অনুসরণ করে; ১৮৬৪ সালে ফ্রেঞ্চ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয়। এদেশে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষও ঘটে। এই কোম্পানীসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ভারতীয় পণ্যদ্রব্য—বিশেষ করিয়া বস্ত্রশিল্পের ব্যবসা ইউরোপীয় বণিকদিগকে কতখানি প্রলুব্ধ করিয়াছিল। ইউরোপে ইহার প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসও উল্লেখযোগ্য। ইউরোপের বাজারে উৎকৃষ্টতর অথচ সুলভ ভারতীয় পণ্য (বস্ত্র) সেই মহাদেশের বস্ত্রশিল্পী ও ব্যবসায়ী-দিগকে বিশেষ বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। বিশেষ করিয়া ফরাসী, প্রাশিয়া ও ইংলণ্ডের বাজারে তখন ভারতীয় রঙীন ছাপের কাপড় ও ক্যালিকো সেই দেশের শিল্পীদিগকে প্রায় বেকার করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে, সেই সকল দেশের গবর্ণমেণ্টসমূহ ভারতীয় বস্ত্রসম্ভারের উপর আইন প্রণয়ন করিয়া নানরূপ বাধানিষেধ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আইনের নাগপাশ এড়াইয়াও ভারতীয় চোরাই বস্ত্রসম্ভার ইউরোপের বাজারে চলিতে থাকে।* প্রাশিয়াতে ভারতীয় 'বস্ত্র নিষিদ্ধ' আইন চালু করা হয়। ইংলণ্ডের পশম-ব্যবসায়ীরা ভারতীয় বস্ত্র আমদানীর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে। তখনকার দিনে ভারতীয় বস্ত্রাদির প্রভাব সম্পর্কে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইউরোপীয়-ব্যবসায়ীরা রঙীন ভারতীয় কাপড়ের সমাদর বুঝিতে পারিয়া নিজেদের দেশে অনুরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হইতে থাকে। প্রাশিয়াতে

* The introduction of painted calicoes and chintzes of the east met in France, in seventeenth century, a vigorous resistance from the manufactures of silk and wool. Stringent laws were passed and a measure enforced, and yet it is apparent that inspite of these prohibitions, there was a dangerous demand for the forbidden wares. (M. D. C. Crawford, The Heritage of Cotton.)

১৭৪১ সালে ছাপের কাপড় তৈরির কেন্দ্র বার্লিনে স্থাপিত হয়। ওবের কাম্প্‌ফ্‌ নামক জনৈক ব্যক্তি স্থায়ী রং-এর ছাপের পন্থা আবিষ্কার করেন। ১৭৭৬ সালে ওবের কাম্প্‌ফ্‌ জনকয়েক অংশীদার লইয়া ফরাসী দেশের ভার্সাই শহরের নিকট Jony নামক স্থানে স্থায়ী রং-এর ক্যালিকো শিল্পকেন্দ্র স্থাপন কারন। 'ভারতীয় বস্ত্র নিষিদ্ধ' আইন প্রয়োগের ফলে তাঁহারা যে সুযোগ লাভ করেন, সেই সুযোগে ভারতের অনুরূপ রঙ্গীন বস্ত্রশিল্প গড়িয়া তুলিতে থাকেন। ফরাসী দেশের এই নবজাত শিল্প ইংলণ্ডের পুঁজিপতিদের মধ্যেও প্রেরণা যোগায়।

ফরাসী, পর্তুগীজ, ডাচ ও ডেনিশ* ব্যবসায়ীরা ভারতীয় বস্ত্রসম্ভারের ব্যবসা করিয়া প্রচুর লাভবান হইত, কিন্তু ইংলণ্ডের বণিককুলের ব্যবসাই বৃহত্তম আকার ধারণ করে। সেই ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি, কিভাবে বস্ত্রনির্মাণের কল ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হয়, ভারতীয় অপূর্ব বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হয়। ইংলণ্ডের কাপড়ের কলকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হয়ত অনেকেরই জানা কথা, কাজেই ইহার আলোচনা এ স্থানে নিষ্প্রয়োজন। আসল কথা এই ভারতীয় অপূর্ব বস্ত্রশিল্পকলার ধ্বংসের উপরই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতের পরাধীনতার এই ঐতিহাসিক কারণটি মহাত্মা গান্ধী সঠিক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সত্য বটে, মহাত্মা গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার পূর্বে প্রথম স্বদেশী আমলে স্বদেশী

* ১৯৫২ সালে ডেনমার্ক পরিক্রমাকালে হেলসিঙ্গওর (Helsingore) নামক শহরের প্রাচীন রাজভবনের যাদুশালায় রক্ষিত ডেনিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে পরিচালিত ভারতীয় কার্পাস ও বস্ত্রের আমদানীর হিসাব দেখিতে পাই। বস্তুতঃ দক্ষিণ ভারতের স্থানবিশেষে ডেনিশ ব্যবসায়ীদের একটি কলোনী তখন গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতীয় প্রাচীন বস্ত্রশিল্পের ইতিহাসে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য দলিল।

শিল্পকে জাগ্রত করিবার উদ্যম দেখা দিয়াছিল, কিন্তু অভিজ্ঞ বৈদ্যের ন্যায় এদেশের পরাধীনতার মূল কারণটি মহাত্মা গান্ধীই বিশেষভাবে আবিষ্কার করেন। সেই জন্যই দেখিতে পাই, অহিংসা-ধর্মের পূজারী হইয়াও বিদেশী বস্ত্র বর্জন, বিদেশী বস্ত্রের অগ্নিযজ্ঞের প্রচার তিনি করিয়াছিলেন।

ইতিহাসের শিক্ষা ও বস্ত্রস্বাধীনতালাভের প্রয়োজনীয়তা

প্রাচীন ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ও ইহার ধ্বংসের যে সকল কারণ বর্ণিত হইল, তাহা হইতে আমরা কি শিক্ষা পাই ?

(১) প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃটিশ কোম্পানীর আমল পর্যন্ত এদেশের লক্ষ লক্ষ লোকের হাতে কাটা সূতায় ও তাঁতির তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রশিল্প এদেশবাসীর বস্ত্রের প্রয়োজন পূর্ণ করিত।

(২) এদেশের বস্ত্রশিল্পকলা অনন্যসাধারণ উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

(৩) ভারতীয় অপূর্ব বস্ত্রশিল্পকলা ইউরোপীয়দিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

(৪) ইউরোপের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা এক সময়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে ইউরোপীয় নাবিক ব্যবসায়ী ও বণিকেরা ভারতীয় বস্ত্রের ব্যবসা করিয়া প্রচুর লাভবান হইত।

(৫) এদেশে তৈরী রঙ্গীন কার্পাস বস্ত্র ইউরোপের বণিকদিগকে ক্রমে নিজেদের দেশে অনুরূপ শিল্পগঠনের প্রেরণা জোগাইয়াছিল।

(৬) অতিরিক্ত বস্ত্র উৎপাদন করিয়া লাভবান হইবার লোভ কাপড়ের কল নির্মাণের অনুপ্রেরণা দান করিয়াছিল। বস্ত্রের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কাপড়ের কল উদ্ভাবিত হয় নাই ; পরন্তু কলের সাহায্যে বস্ত্রের উৎপাদন বাড়াইয়া অল্পমূল্যের বস্ত্র দেশবিদেশের বাজারে চালু করিয়া বাজার বিস্তার ও অধিকার করিয়া বৈষয়িক জগতে আধিপত্য করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

(৭) কাপড়ের কলের আবিষ্কার ও এদেশে কলের বিস্তৃতির ফলে দেশবাসীর বস্ত্রস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে নাই; বরং বহুলপ্রকারে তাহা খর্ব হইয়াছে। যে বস্ত্রশিল্পকলা একদা এদেশের জনসাধারণের করায়ত্ত ছিল, কাপড়ের কল সেই সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া দেশবাসীকে বাজারের মুখাপেক্ষী করিয়া তুলিয়াছে।

ইংলণ্ডেই প্রথম কাপড়ের কল আবিষ্কৃত হয়। অনুসন্ধিৎসুগণ সেই ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন, লাভ ও লোভের মোহ ব্যক্তিগত বা জাতিগতভাবে কতদূর গড়াইতে পারে। ইহা হইতে আমারা বড় শিক্ষা লাভ করিতে পারি। মত ও পথ একই মানবিক সূত্রে গ্রথিত না হইলে পরিণামে মানবের কল্যাণ হয় না,—ইংলণ্ড কর্তৃক ভারতীয় বস্ত্রের বাজার অধিকার, ভারতে বৃটিশ সরকার কায়েম ও সর্বশেষ ধাপে ভারতে বৃটিশ বস্ত্র বর্জন, লাংকাশায়ারের চরম দুর্গতি ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

প্রথম মহাসমরের কালে ব্রিটিশ বস্ত্রের আমদানি এদেশের বাজারে হ্রাস পাওয়ায় এবং ঘটনাস্রোতে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রবল হইতে থাকায় এদেশে ক্রমে কাপড়ের কল স্থিতি ও বিস্তার লাভ করে। আজ দ্বিতীয় মহাসমরের পর ভারতে প্রচুর কলের কাপড় প্রস্তুত হইয়া বিদেশের বাজারেও চালান যাইতেছে, কিন্তু দেশবাসীর বস্ত্রসমস্যার সমাধান হইয়াছে কিনা বস্ত্রব্যবহারকারী নাগরিকমাত্রেই তাহা বলিতে পারেন। প্রশ্ন এই, এরূপ কেন হইল? এক কথায় ইহার উত্তর দিতে হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, কাপড়ের কল সর্বসাধারণের বস্ত্রস্বাধীনতাকে হরণ করিয়াছে। আসল কথা যন্ত্রকে প্রাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলে মানবতার ভিত্তিই শিথিল হইয়া যায়। ইহার প্রতিকার কি? কল মানুষেরই সৃষ্টি। কিন্তু দানবের ন্যায় কল আজ মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং লোভ নামক

বৃত্তিতে ইন্ধন যোগাইতেছে। কলকে মানুষের সর্বসাধারণের মঙ্গল-কাজে নিয়োগ করার উপায় আজ বাহির করিতে হইবে। সকলেরই খাদ্যের ন্যায় বস্ত্রের প্রয়োজন আছে। বস্ত্রশিল্পে জনসাধারণের লোক-প্রতিভাকে আবার জাগ্রত করিতে পারিলেই ইহার সমাধানের উপায় আপনা হইতে সর্বসাধারণই করিতে পারিবে। বস্ত্রশিল্পের ব্যাপকতা বিশাল। তূলার চাষ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন নমুনার সূতা ও সকল রকমের বস্ত্র-শিল্পকৌশল লোকায়ত্ত হইলে আজিকার বহু সমস্যার সমাধান সহজ হইবে। কলকে সর্বসাধারণের স্বার্থে মানুষের বশে আনিবার ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

লোকপ্রতিভাকে জাগ্রত করিতে হইলে, একাধারে প্রাচীন ভারতের অপূর্ব বস্ত্রশিল্পকলা-সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন ও যুগোপযোগী বস্ত্রশিল্পচর্চার পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। ইহার নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, এক কথায় সাংস্কৃতিক শুভফল তখন প্রত্যক্ষ অনুভূত হইবে। কিন্তু বস্ত্রশিল্পকে বিজ্ঞানসম্মত পথে লোকায়ত্তের পথে আনিবার, জনপ্রতিভাকে জাগ্রত করিবার একটি উপায় বস্ত্রশিল্পকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। ইহার শুভ পরিণতি সুদূরপ্রসারী হইবে।

শ্রীনিকেতনে আর্টিষ্টিক বয়নপ্রথার প্রবর্তন

মনোরম নক্‌সার সুরুচিসম্পন্ন বয়নশিল্পের উৎকর্ষের প্রচেষ্টা বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে কুড়ি বৎসরের উপর চলিতেছে। বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন বিভাগে আর্টিষ্টিক বয়নশিল্প প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে (১৯৩৪-৩৬) রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনক্রমে বর্তমান লেখকের প্রচেষ্টার ফলে শ্রীমতী যিয়ানসন (Jeanson) ও শ্রীমতী সেদেরব্লুম (Cederblom) নামক মহিলাদ্বয়কে আমন্ত্রণ করিয়া আনান হইয়াছিল। সুইডেন হইতে প্রয়োজনীয় সুইডিশ তাঁত ও তৎসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি আমদানি করা হইয়াছিল। এ সম্পর্কে

বিশদ বিবরণ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী'তে বর্ণনা করা হইয়াছে। ১৯৫৪ সালে বিশ্বভারতীর কুটিরশিল্প-কেন্দ্রে বয়নশিল্প শিক্ষার ডিপ্লোমা কোর্স খোলা হইয়াছে। এই শিল্পপ্রবর্তনে বিশ্বভারতী এদেশে অগ্রদূতের কাজ করিয়াছেন। এই কোর্সের পরিচালক শ্রীশ্রীনিবাসন বিদ্যালয়ের উপযোগী তাঁত ও ডিজাইনের কাজের উপযোগী অভিনব স্বয়ংক্রিয় তাঁত আবিষ্কার ও প্রবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার কাজে সরকারও সাহায্য করিয়াছেন। এ পথে ব্যাপকভাবে স্বরুচির মানকে উন্নত করার প্রয়োজন আছে। মহাত্মা গান্ধীর বিদেশী বস্ত্র বর্জন, খাদি আন্দোলন ও সর্বশেষ ধাপে বুনিয়াদি শিক্ষানীতি প্রবর্তনের মধ্যে আগাগোড়া এক বিশাল সংগতি রহিয়াছে। খাদি-আন্দোলন দেশের রাজনীতির সঙ্গে একীভূত হওয়ায়, খাদিকে অনেকে শুধু স্বাদেশিকতার চিহ্নস্বরূপ মনে করিতেন। ইহার লাভ-ক্ষতি উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইহার গুণাগুণ যাচাই করার দিন আসিয়াছে।

বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনায় খাদির স্থান

বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনায় সূতাকাটা ও বয়ন প্রবর্তনের অন্তর্নিহিত বাণী অন্যরূপ, অর্থাৎ ইহা রাজনৈতিক নহে; জনসাধারণের কর্মপ্রতিভাকে সহজ ও স্বাভাবিক পথে চালনা করাই ইহার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছিতে গেলে সর্বাগ্রে বস্ত্রশিল্পকে আবশ্যিক জনশিক্ষার অংগ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার সার্থকতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে এই শিল্পের শিক্ষানৈতিক বিবর্তনের উপর। সেজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার সতর্ক গবেষণা প্রয়োজন, নতুবা প্রচুর অপচয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বুনিয়াদি শিক্ষাধারা দেশে বিস্তারলাভ করিলে দেশে তূলার চাষ প্রগতিশীল হইবে। বিভিন্ন তূলার গুণাগুণ সম্বন্ধেও জনসাধারণের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মান

আপনা হইতে উন্নত হইবে। সূতা ও সূতা কাটিবার যন্ত্রাদির প্রগতিতে জনসাধারণের প্রতিভা সক্রিয় হইয়া উঠিবে। কাপড়ের কলের অতিকায় লোভ ও পরশোষণক্ষমতা আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। ফলে কলও কালে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে আপনার যথার্থ নৈতিক স্থান ও মান খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইবে। ভারতের প্রাচীন কার্পাস শিল্পের ঐতিহ্যকে স্বীকার করিলে বর্তমান ও ভাবী ভারতের শিক্ষানৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে প্রয়োজন পূরণের সঙ্গে সৌন্দর্যচর্চার অর্থাৎ পার্থিবের সঙ্গে অপার্থিবের এরূপ সমন্বয় অবশ্যই সম্ভব।

শিক্ষানৈতিক কার্পাস শিল্প ও কার্পাস বিজ্ঞান

কার্পাস বস্ত্রের ব্যবহার

পৃথিবীর সকল অধিবাসীর ব্যবহার্য বস্ত্রের অল্লাধিক শতকরা ৭০ ভাগ কার্পাসজাত। এহেন বস্তুর জ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে বাদ পড়িলে মানুষের শিক্ষাই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেজন্যও শিল্পশিক্ষাক্ষেত্রে কার্পাস-বিজ্ঞানের চর্চা অবশ্য কর্তব্য, বিশেষ করিয়া আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে। কারণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত বস্ত্রাভরণ কার্পাসজাত। শীতপ্রধান দেশ বা স্থানের অধিবাসিগণ গরম জামা-কাপড় ব্যবহার করে সত্য, কিন্তু কার্পাস বস্ত্র ছাড়া তাহারাও চলিতে পারে না। কারণ কার্পাস বস্ত্র যেমন সহজে ধুইয়া পরিষ্কার করা যায়, গরম জামা-কাপড় তত সহজে ধোওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য গরম বস্ত্রের অভ্যন্তরে কার্পাস বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। বস্তুতঃ কার্পাস বস্ত্র প্রবর্তনের পূর্বে শীতপ্রধান দেশের গরম বস্ত্র ব্যবহারকারীরা বস্ত্রাদি পরিষ্করণে স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া চলিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইত না। দেহাচ্ছাদন ভিন্নও শীতপ্রধান দেশের অধিবাসিগণ বিছানার চাদর, লেপের ও বালিশের আবরণে কার্পাস বস্ত্র ব্যবহার করে। আমেরিকায় সর্বাপেক্ষা অধিক কার্পাস উৎপন্ন হয়। ইহার এক-তৃতীয়াংশ পরিধেয় বস্ত্র নির্মাণে, অন্য তৃতীয়াংশ অন্যবিধ শিল্পে এবং শেষাংশ গৃহ সরঞ্জামাদির জন্য ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন দেশে কার্পাস উৎপন্নের হার

দেশ	উৎপাদন-হার	অঞ্চল
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৪১	প্রধানতঃ দক্ষিণ ষ্টেটসমূহ
ভারত ও পাকিস্তান	১৫	প্রায় সর্বত্র

দেশ	উৎপাদন-হার	অঞ্চল
ঈজিপ্ট	৬	নীলনদীর তীরবর্তী স্থান-সমূহ
রাশিয়া	১৩	দক্ষিণে
ব্রাজিল ও পেরু	৭	উপকূল ভাগ
চীন	১১	সর্বত্র
অন্যান্য দেশ	৭	

কার্পাসের আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাগ

(১) সি আইল্যাণ্ড (Sea Island) (২) ঈজিপ্টের কার্পাস (৩) পেরুর কার্পাস (৪) ব্রাজিলের কার্পাস (৫) আমেরিকান কার্পাস (৬) রুশদেশীয় কার্পাস (৭) ভারতীয় কার্পাস (৮) চীনদেশীয় কার্পাস। পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনা হইতে ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে এদেশের মত অন্য সকল দেশেই ভিন্ন ভিন্ন গুণের কার্পাস রহিয়াছে।

বিভিন্ন দেশের কার্পাসের আঁশের মামুলী দৈর্ঘ্য

নাম	আঁশের দৈর্ঘ্য
*সি আইল্যাণ্ড কার্পাস	২″ পর্যন্ত
ঈজিপ্টের কার্পাস	১$\frac{৫}{৮}$″ ”
পেরুদেশীয় কার্পাস	১$\frac{১}{৪}$″ ”
ব্রাজিলদেশীয় কার্পাস	১$\frac{১}{৮}$″ ”
সাধারণ আমেরিকান কার্পাস	১$\frac{১}{১৬}$″ ”
রুশদেশীয় কার্পাস	১$\frac{১}{১৬}$″ ”
ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের কার্পাস	$\frac{১}{২}$″ হইতে ১″ পর্যন্ত
চীনদেশীয় কার্পাস	” ” ” ”

* বর্তমানে ভারতবর্ষে কেরল প্রদেশে সি আইল্যাণ্ড তূলা উৎপাদন করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ চেষ্টা চলিতেছে।

কার্পাস আঁশ কি কি উপাদানে গঠিত

দৃশ্যমান বস্তুসমূহকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহারা বিভিন্ন পদার্থের সংযোগে গঠিত; যেমন আমরা জানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটি বায়বীয় পদার্থের সংযোগে জল হয়। সেরূপ কার্পাসের আঁশ বিশ্লেষণ করিলে প্রধানতঃ যে জিনিস পাওয়া যায় তাহার নাম সেলুলস (Cellulose)। ইহা গন্ধ ও স্বাদবিহীন দ্রব্য। কার্পাস আঁশের শতকরা নব্বই ভাগই সেলুলস। বাকী দশ অংশে খনিজ দ্রব্যও পাওয়া যায়। কার্পাস আঁশের ছাই হইতে সে সকল ধরা পড়ে। পেক্‌টোস নামক পদার্থ, তৈল ও মোম কার্পাস আঁশে বর্তমান।

কার্পাসের আঁশে মোমের অবস্থিতির ফল

আঁশে মোমের অবস্থিতি সূতাকাটার পক্ষে একটি অপরিহার্য সহায়। আঁশে শতকরা ½ ভাগ মোম থাকে এবং এই মোম সমভাবে আঁশের গায়ে বর্তমান থাকে। এই মোমের জন্য কার্পাসে সূতাকাটা সহজ ও সম্ভব হয়। অল্পাধিক ৬৮° উত্তাপে মোম সামান্য নরম হয় এবং সেই অবস্থাটাই সূতাকাটার পক্ষে বড় সুবিধাজনক। ৬৮° ডিগ্রীর কম উত্তাপে মোম জমাট বাধিয়া যায়; সেইজন্য গভীর শীতে সূতাকাটার গতি কমিয়া যায়। জমাট অবস্থায় কার্পাস আঁশ ভগ্নপ্রবণ হয়। কিন্তু কার্পাস আঁশে অবস্থিত মোম গলাইতে হইলে ১৫৫° ডিগ্রী উত্তাপের প্রয়োজন হয়। উল্লিখিত কারণে সূতাকাটার মিলে কৃত্রিম উপায়ে ৬৮° ডিগ্রী উত্তাপ রাখা হয়।

সাধারণতঃ অন্য যে সকল আঁশজ বস্তুতে মোম অবর্তমান, সে সকল আঁশে সূতা কাটিতে বা পাকাইয়া লইতে তৈলজাতীয় পদার্থের সাহায্য লইতে হয়। অপর পক্ষে মোমের অবস্থানহেতু সূতার পাক কম হইলে

সহজে ছিঁড়িয়া বা পৃথক পৃথক হইয়া যায়। ইহার কারণ পাকের দ্বারা বিভিন্ন আঁশসমূহ দৃঢ়ভাবে যুক্ত না হইলে টান পড়িলে আপনা হইতেই পিছলাইয়া পৃথক হইয়া যায়। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে নূতন কাপড় সহজে জলে ভিজিতে চায় না। ইহার কারণ সূতায় মোমের অবস্থিতি।

নূতন বস্ত্রের মোম পৃথকীকরণ প্রথা

গরমজলে সিদ্ধ না করিয়াও নূতন বস্ত্রকে মোমশূন্য করা যায়। আমরা সাধারণতঃ নূতন কাপড়ের 'কোর' দূর করিবার কথা জানি। এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই কাপড়ের 'কোর' দূর করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছিল। অধুনা সে প্রথা অনেকাংশে লোপ পাইয়াছে। নূতন কাপড় আজকাল ধোপা দ্বারা পরিষ্কার করাইয়া লইতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছি। কিন্তু গোবরজলে তাহা করা মোটেই কঠিন বা শ্রমসাধ্য নয়।

এক বালতি টাট্‌কা গোবর মিশ্রিত জলে নূতন পরিধেয় কাপড় এক দিনমান ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে জলে ভাল করিয়া ধুইয়া জল না নিঙ্‌ড়াইয়া রৌদ্রালোকে জমির উপর বিছাইয়া দিতে হইবে এবং জল শুকাইয়া উঠিবার মত হইলেই আবার জল ছিটাইয়া সিক্ত করিতে হইবে। ক্রমাগত দু'তিনবার এরূপ করিলেই নূতন কাপড়ের কোর উঠিয়া ধব্‌ধবে সাদা হইয়া যাইবে। এই প্রথা রঙ্গীন কাপড় সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কারণ রঙ্গীন কাপড়ের সূতা বুননের পূর্বেই রঙ্গাইয়া লওয়া হয়, অথবা সাদা কাপড় রঙ্গাইয়া লওয়া হয়। সাদা কাপড় রঙ্গাইবার পূর্বে প্রথমেই পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। এই পরিষ্কার প্রকরণকে ইংরাজীতে ব্লিচিং বলা হইয়া থাকে। সাদা কাপড় রং করিবার পূর্বে 'কোর' দূর না করিলে রং ভাল লাগে না; মোমের উপস্থিতি ইহার এক কারণ। ব্লিচিং করিয়া কাপড়

মোমশূন্য হইলে সূতার ছিদ্রপথ পরিষ্কার হয়। কাপড়ও মজবুত হয়। পরীক্ষায় জানা যায় যে ব্লিচিং-এর পরে কাপড়ের শক্তি শতকরা বিশগুণ বৃদ্ধি পায়।

কার্পাস আঁশের আনুপাতিক গুণ

সূত্র তৈরীর কাজে যত প্রকার আঁশ (যেমন শন) ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে কার্পাস আঁশের নমনীয়তা (flexibility) সর্বাধিক। এই কারণে কার্পাস বস্ত্র যে কোন ভাবে ব্যবহার করিলেও কোন ভাঁজের দাগ পড়ে না। কার্পাস আঁশের (ক) সূক্ষ্মতা, (খ) গঠন (hollow structure) ও (গ) এককোষত্ব (unicellular) এই নমনীয়ত্বের একমাত্র কারণ। শনের নমনীয় গুণ কার্পাস অপেক্ষা কম, কারণ শনের আঁশ অপেক্ষাকৃত কঠিন। কার্পাসের সূতার বৈশিষ্ট্য এইটি। আবার ভিন্ন ভিন্ন কার্পাসের মধ্যে একটি অপরটি অপেক্ষা অধিক নমনীয় হইয়া থাকে।

যথাস্থিতিত্ব

কার্পাসেরই হোক বা শনেরই হোক—আঁশ মাত্রেরই আর একটি গুণ ইহাদের যথাস্থিতিত্ব। যথাস্থিতিত্ব বলিতে এই বুঝায় যে, একটি আঁশকে যে অবস্থায় রাখা যায় সেভাবেই অবস্থান করে। কার্পাসে এই স্থিতিত্বগুণ কম বেশী বর্তমান আছে। কিন্তু তুলনায় পশমে এই গুণ নাই বলিলেও চলে। আবার শনে এই গুণ কার্পাস অপেক্ষা অধিক। কার্পাস সূতার কাপড় ও শনের সূতার কাপড় ভাঁজ করিতে গেলে সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে শনের কাপড়ে যত সহজে ভাঁজ পড়ে, কার্পাস সূতার কাপড়ে তত সহজে পড়ে না। সেজন্য ভাঁজের উদ্দেশ্যে কার্পাস সূতার কাপড়ে কলপ দেওয়া হইয়া থাকে।

কার্পাসের রঙ

কক্‌টি রংবিশিষ্ট কার্পাস ভিন্ন সাধারণতঃ কার্পাসমাত্রেই সাদা হইয়া থাকে। কিন্তু সাদার মধ্যেও পার্থক্য আছে। যেমন—মাখন সাদা, বাদামী আভাযুক্ত সাদা, লাল্‌চে আভাযুক্ত সাদা ইত্যাদি। সাদা কার্পাস কাপড় ধুইয়া ইহার ধবধবে সাদা রং বিনষ্ট করিবার জন্য নীল দেওয়া হইয়া থাকে; ফলে নীলের ছাট লাগিয়া কাপড় মাখন সাদা হইয়া উঠে।

জল ও মাটির গুণে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন দেশের কার্পাসের সাদা রঙে এরূপ বহুবিধ তারতম্য লক্ষিত হয়। শুনিয়াছি, কৃত্রিম উপায়ে পরিচর্যার গুণে তূলার রঙ বদলাইবার প্রচেষ্টা রাশিয়াতে চলিয়াছে। কিন্তু ইহার বিবরণ আমরা অবগত নই। ইজিপ্টের কাপড়ের রঙ বাদামী আভাযুক্ত সাদা; ইহার কারণ নীল নদীর জল।

রঙের উজ্জ্বলতা

কার্পাস আঁশ যত মিহি হয়, সাধারণতঃ তত উজ্জ্বল হইয়া থাকে। এই উজ্জ্বলতা আঁশের বাহিরের গুণ নয়। বস্তুতঃ উজ্জ্বল আঁশের অন্তর বাহির দুইই উজ্জ্বল। উজ্জ্বল কার্পাসের সূতা রঙাইলে পর যতটা উজ্জ্বল হয়, অনুজ্জ্বল সূতা ততটা কখনই হইতে পারে না। পক্ক কার্পাস যথা-সময়ে গাছ হইতে না তুলিয়া লইলে রঙের উজ্জ্বলতা ক্রমশঃ কমিয়া যায়, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

কৃত্রিম উপায়ে সূতা বা কাপড়ের উজ্জ্বলতা বাড়াইবার একাধিক প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে উজ্জ্বল করিবার প্রণালীর ইংরাজী প্রতিশব্দ Mercerising। সাধারণতঃ কষ্টিক সোডার সাহায্যে ইহা করা হয়।

গ্যালিং

তন্তুজ বস্তুর উজ্জ্বলতা বাড়াইবার আর একটি প্রথার নাম গ্যালিং। তন্তুর বহির্মুখী লোমশ আঁশগুলি আগুনের আঁচে পুড়াইয়া লইলে বস্তুটির উজ্জ্বলতা বাড়ে। ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে পাটের অথবা শনের রশি তৈরী করিয়া অগ্নিশিখার আঁচে লোমের মত আঁশগুলিকে পুড়াইয়া দিলে রশির উজ্জ্বলতা স্বভাবতই বাড়িয়া যায়। কাপড় সম্বন্ধেও এই প্রথা প্রযোজ্য হইতে পারে।

উষ্ণ রোলারের মধ্য দিয়া কাপড় চালাইয়াও রঙের উজ্জ্বলতা বাড়ানো হয়।

সূত্র কর্তনের জন্য যতপ্রকার আঁশ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সকলেরই কতকগুলি গুণ থাকা প্রয়োজন। কয়েকটি গুণের বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য গুণসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (ক) আঁশগুলির পরস্পরের জোড়া লাগিবার শক্তি (Property of Clinging) (খ) আঁশের শক্তি (Stensile Strength) (গ) আঁশের নমনীয়তা (Flexibility) ও (ঘ) স্থিতিস্থাপক শক্তি (Elasticity)।

কার্পাসের গুণাগুণ বিচারে—(ক) আঁশের সমতা (Uniformity) (খ) ছিদ্রযুক্ততা (Porosity) (গ) উজ্জ্বলতা (ঘ) স্থায়িত্বগুণ এবং (ঙ) ফলনের প্রাচুর্য বিশেষ বিবেচ্য গুণ।

সাধারণতঃ নিম্নোক্ত নৈসর্গিক অবস্থার উপর কার্পাসের গুণাগুণ নির্ভর করে। যথা :—(ক) বীজ (খ) জলবায়ু (গ) ভূমি ও (ঘ) চাষ, সেচ ও পরিচর্যা।

বীজ :—নিকৃষ্ট বীজের গাছ ও ফল কখনও উৎকৃষ্ট হয় না—ইহা সকল গাছগাছ্‌ড়া সম্বন্ধেই সত্য। সেজন্য উৎকৃষ্ট পুষ্পক কার্পাসের বীজ সর্বদাই ব্যবহার্য। একথা মনে রাখিতে হইবে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট সকলপ্রকার গাছের যত্ন পরিচর্যার শ্রম একই প্রকার। কাজেই অপকৃষ্ট বীজের গাছের যত্ন না

লইয়া উৎকৃষ্ট বীজের গাছের যত্ন লইলে লাভ বেশী হয়। বীজ সম্বন্ধে সকলেরই বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

জলবায়ু :—কার্পাসের গাছ ৬০°—৮০° ডিগ্রি উত্তাপেই সর্বাপেক্ষা ভাল জন্মিয়া থাকে। আর্দ্রবায়ু (humid atmosphere), অনুকূল মামুলী বারিপাত কার্পাস চাষের পক্ষে প্রয়োজন। ইহার অভাবে জলসেচন করিয়াও কার্পাসের চাষ হয় ও হইতে পারে। এদেশে পাঞ্জাবে খালের জলের সেচদ্বারা সেখানকার কার্পাস চাষের প্রভূত উন্নতি করা হইয়াছে। গাছ বৃদ্ধির কালেই জলের প্রয়োজন হয়। পরে পূর্ণাঙ্গ গাছে ফল ধরিয়া পাকিতে আরম্ভ করিলে প্রচুর রৌদ্রালোক ও শুষ্ক আবহাওয়াই সমধিক প্রয়োজন।

ফস্‌লে কার্পাস গাছ :—বীজ বপন হইতে আরম্ভ করিয়া কার্পাস সংগ্রহ করিতে নিতান্ত কমপক্ষে সাত মাস সময় লাগে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইজিপ্টে কার্পাসের চাষ হয়। সেই দেশের কার্পাস সম্বন্ধে জানা যায় যে ফুল ফুটিয়া দুই তিন দিন পরেই ঝরিয়া যায় আর ফুলের গর্ভকোষে ফল সূচিত হয়। ফলের বোঁটা ষষ্ঠ দিবসে অর্ধেক আকার লাভ করে আর অষ্টাদশ দিবস পর্যন্ত ফল বাড়িতে থাকে। পরে বাড়তির গতি ক্রমশঃ কমিয়া ২৪ দিনে পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয়। ৪৫ দিনে পক্ক ফল ফাটিয়া যায় বা ফাটিবার উপক্রম হয়। ফলমধ্যস্থ আঁশের বৃদ্ধি প্রথমদিকে অপেক্ষাকৃত ধীর গতি কিন্তু ১৫ দিনের দিন আঁশ পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হয়। কাল মাটি (Black loamy soil) কার্পাস চাষের পক্ষে অতি উত্তম। কার্পাস গাছের পক্ষে নাইট্রেট্‌স (Nitrates), ফসফেট্‌স (Phosphates), পটাস (Potash) ও চূণ (lime) নিতান্তই প্রয়োজন।

কার্পাস বীজের ব্যবহার

কার্পাসের বীজ ছাড়াইয়া আমরা তূলা ব্যবহার করি কিন্তু ইহার বীজও

মূল্যবান বস্তু। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে ক্ষেত্রে ব্যবহার্য বীজ ছাড়া বীজের অন্য ব্যবহার জানা ছিল না। বর্তমানে কার্পাস বীজ হইতে তৈল বাহির করা হয়। এই তৈল সাবান ও মারগারিন তৈরী ইত্যাদির কাজে লাগে। তৈল বাহির করিবার পর যে খৈল পাওয়া যায় তাহা গোরুর উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং জমিতেও সাররূপে ব্যবহার করা যায়। সিদ্ধ করা আস্ত বীজ দুগ্ধদাত্রী গাভীরও একটি অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য।

এদেশে যুদ্ধের পূর্বে প্রতি বৎসর অল্পাধিক ৫,৪০,৭০০০ মণ কার্পাস বীজ হইত। ১৯৩৬—৩৭ সালে ২,৪৮,০০০ মণ বীজ বিদেশে চালান দেওয়া হইয়াছিল। বীজের বর্তমান পরিস্থিতি অবগত নই, কিন্তু কার্পাস চাষীমাত্রেই ইহার বীজের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে অবহিত হইলে গো-খাদ্য ও সারের সমস্যার কতক সমাধান হইতে পারে। গো-খাদ্যের উপযোগী কার্পাস বীজ কোথায় পাওয়া যায় সেই খবর রাখা শিক্ষকের কর্তব্য। জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন করিয়া তোলা শিক্ষকের কাজ।

সূতাকাটা সম্বন্ধে কয়েকটি অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য

সূতাকাটা ও বয়ন একটি বিশেষ আর্ট। পূর্বেই বলিয়াছি "জনসাধারণের কর্মপ্রতিভাকে সহজ ও স্বাভাবিক পথে চালনা করাই ইহার লক্ষ্য। কিন্তু ইহার সার্থকতা নির্ভর করে এই শিল্পের শিক্ষানৈতিক বিবর্তনের উপর। সেজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার সতর্ক গবেষণা প্রয়োজন, নতুবা প্রচুর অপচয়ের সম্ভাবনা আছে।"

সূতার গুণাগুণের উপর কাপড়ের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে। সেজন্য সূতাকাটার গুণাগুণ আমাদের প্রধান বিচার্য।

সমগুণবিশিষ্ট সূতা

ইহা বুঝা সহজ যে একমাত্র সমগুণবিশিষ্ট সূতা দ্বারাই সমগুণবিশিষ্ট

কাপড়ের জমি পাওয়া যায়। কাজেই সমগুণবিশিষ্ট সূত্রকর্তনই শিক্ষার্থীর প্রথম লক্ষ্য হইবে। সমগুণ বলিতে আগাগোড়া সর্বত্রই এক রকমের মোটা সূতা বুঝিতে হইবে। আরও বুঝিতে হইবে একই রকমের মোটা সূতা সর্বত্র একই ধরণের শক্তিসম্পন্ন হওয়া চাই, অর্থাৎ সূতার পাক সর্বত্র একপ্রকার হইতে হইবে।

মনে করুন একজন শিক্ষার্থী বহু লাছি সূতা কাটিল। পরে ইহাদের নম্বর নির্ণয় করিতে যাইয়া দেখা গেল যে কোন লাছির সূতা ১২, কোনটার ১৬ এবং কোনটার নম্বর ২৫ ; এই পার্থক্য বর্তমানে সেই সূতা দ্বারা সমগুণ-বিশিষ্ট কাপড়ের জমি কখনই আশা করা যাইতে পারে না। কাজেই সূতা কাটার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হইবে যে ইচ্ছানুরূপ যে কোন নম্বরের সূতা-কাটা এবং সেই সূতা সমভাবে শক্তিশালী করা।

গতি

প্রথমোক্ত গুণসমন্বিত সূতা কাটায় কতকটা অভ্যস্ত হওয়ার পর গতি বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে, গতি অবশ্যই দক্ষতার একটি মাপকাঠি, কিন্তু সমগুণবিশিষ্ট সূতা—তাহা মোটাই হোক বা সরুই হোক কাটিতে অভ্যস্ত হইলে অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে গতিও বাড়িবে। এখানে একটি উপমার আশ্রয় লওয়া যাক। নির্দিষ্ট সময় মধ্যে ক ১০০ গজ সূতা কাটে আর খ সেই সময়ে ২০০ গজ সূতা কাটে। ইহাতে কে ভাল কাটুনী তাহা ঠিক জানা যায় না। কারণ এমন হইতে পারে যে, গুণে ২০০ গজ সূতা ১০০ গজ হইতে নিকৃষ্ট এবং ব্যবহারের অনুপযোগী। একমাত্র সমান পরিবেশে অর্থাৎ এক জাতীয়, একই গতি বিশিষ্ট চরখায় একই রকম তূলার পাঁজে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একই নম্বরের সূতা দ্বারা কাটুনীদের সূতাকাটার দক্ষতার তারতম্য নির্ধারিত হইতে পারে। কাজেই গতির দ্বারা সূতা-

কাটায় দক্ষতা নিরূপণ করিতে গেলে উপরোক্ত বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে, আর সেই সঙ্গে আর একটি বিষয়েও বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে, ইহা তূলার অপচয়।

অপচয়

শিক্ষার্থী মাত্রেরই এই বিষয়ে গোড়া হইতে জানিতে হইবে। পাঁজের ওজন হইতে সূতার ওজন বাদ দিলেই অপচয় নির্ণয় হয়, তাহা ছাড়া পাঁজের যে অংশ সূতা কাটার অনুপযোগী তাহা একত্র করিয়া ওজন করিলেও অপচয় ধরা পড়ে। কিন্তু অপচয় কি কি কারণে হয় ও হইতে পারে তাহা বুঝা উচিত। পাঁজে ধূলাবালি ও বীজ কণিকা থাকে কিন্তু সূতা কাটিবার বেলায় সেই সকল বিজাতীয় দ্রব্য আপনা হইতেই খসিয়া পড়ে। ইহা এক ধরণের অপচয়। তূলা যথারীতি পরিষ্কার ও ধোনা না হইলে অর্থাৎ ধূনপ্রকরণ ও পাঁজপ্রকরণ ঠিক না হইলেই এরূপ ঘটে। আর একটি হইল নিছক কাটার দোষে তূলার অপচয়। এই অপচয়কেই ঠিক অপচয় বলা যাইতে পারে।

সূত্র কর্তনে কৃতকার্যতার মান নির্ণয় সম্পর্কে সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায় যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিম্নোক্ত বিষয়ে দৈনন্দিন নোট রাখা উচিত। যথা :—(১) কার্পাসের নাম (২) পাঁজ নিজের হস্তে প্রস্তুত কিনা (৩) সময় (৪) কত গজ বা তার (৫) সূতার নম্বর (৬) সূতার সমতা (৭) চরকায় টেকোর গতি (৮) নির্দিষ্ট সময় মধ্যে কতবার ছিঁড়ে (৯) অপচয়। তাছাড়া সূতার শক্তিও মাঝে মাঝে পরীক্ষিত হওয়া উচিত।

উপরোক্ত বিষয়ে অবহিত হইয়া সূতাকাটা অভ্যাস করিলে শিক্ষার্থী নিজেই নিজের উন্নতি অনুভব করিতে পারিবে। আর এই দৈনন্দিন কাজের উপরেই বর্ষশেষে পরীক্ষার নম্বর দেওয়া চলে; পৃথকভাবে পরীক্ষা

লওয়ার কোনও প্রয়োজন থাকে না। বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এ প্রথা অনুসরণযোগ্য।

যদি কখনও সূতাকাটার প্রতিযোগিতা হয় (সম্বৎসরের কাজের হিসাব লওয়া পৃথক কথা) তবে প্রতিযোগী সকলকেই একই প্রকার যন্ত্র (প্রত্যেকটি অতি সতর্কভাবে পরীক্ষিত), একই সময়ে একজাতীয় তূলায় প্রস্তুত পাঁজ দিতে হইবে। যথারীতি অভ্যাসের দ্বারা কেহ কেহ অতি উচ্চ সূতাকাটার গতি লাভ করিয়াছেন। ৯০—১১০ গতি বিশিষ্ট চরকায় কেহ কেহ ঘণ্টায় এক গুণ্ডি (৮৪০ গজ=৬৪০ তার) পর্যন্ত কাটিতে সমর্থ হইয়াছেন। সাধারণতঃ চলিত ধাতুর তক্‌লিতে কেহ বা প্রতি ঘণ্টায় ৩৭৫ তার সূতা কাটিয়াছেন। মগন চরকায় ৭ ঘণ্টায় ১১ গুণ্ডি সূতা কাটার রেকর্ডও আছে। অনুসন্ধান করিলে এরূপ—এমন কি উচ্চতর গতির রেকর্ড পাওয়া যাইতে পারে।

কার্পাস পরিচয়

শিল্পজ্ঞান পূর্ণাঙ্গশিক্ষার অপরিহার্য অংশ। ভারতীয় আবশ্যিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে সূত্রকর্তন ও বয়ন স্থান পাইয়াছে। বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হইবার পর বিগত কুড়ি বৎসরের মধ্যে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে ও শিক্ষক-শিক্ষণ শিবির সমূহেও হাতে সূতাকাটা ও বয়ন প্রসারলাভ করিতেছে। কিন্তু কার্পাসশিল্পকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-শিল্পে পরিণত করিতে হইলে কার্পাস সম্বন্ধেও পূর্ণতর জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। গুণের দিক দিয়া বিচার করিলে বিভিন্ন কার্পাসের তারতম্য জানা যায়। কাজেই এতদ্দেশীয় বিভিন্ন কার্পাস সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা ছাত্র শিক্ষক ও কাটুনি মাত্রেরই প্রয়োজন। উপমাস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কাঠের কাজ শিখিতে গেলে যেমন বিভিন্ন কাঠের পরিচয় ও গুণ এবং কোন্ কাজে কি কাঠ ব্যবহার্য তাহা

জানা আবশ্যক তেমনি কার্পাস শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইলে বিভিন্ন কার্পাসজ্ঞান অত্যাবশ্যক।

শিক্ষার উপাদান—ভৌগলিক জ্ঞান

শিক্ষক-শিক্ষণ শিবির সমুহে ভারতীয় কার্পাস সমূহের নমুনা ও গুণানুসারে চার্ট রাখা প্রয়োজন, যাহাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীমাত্রেই ভারতীয় কার্পাস সমূহের একটি পূর্ণ চিত্র ও জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। ইহাতে এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি, জলবায়ুর সম্বন্ধে জ্ঞান হইবে—এক কথায় দেশের সম্বন্ধে ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিসর বাড়িয়া যাইবে।

বিভিন্ন শিল্পে যে সকল বস্তু ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে তুলাকে বা কার্পাসকে কোমলতম বলা যাইতে পারে। কোমল কার্পাস হইতে বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট সূতা কাটাই বিশেষ বিজ্ঞান।

উত্তম গুণবিশিষ্ট কার্পাসের লক্ষণ

সহজে ও সস্তায় কার্পাস পাইতে হইলে, কার্পাসের চাষ সম্বন্ধেও সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বিভিন্ন কার্পাসের গুণাগুণ সম্বন্ধে অবহিত না হইয়া কার্পাসের চাষে প্রবৃত্ত হইলে আশানুরূপ ও উপযুক্ত ফললাভে বঞ্চিত হইবার কথা; সূতা কাটার জন্য কার্পাস নির্ব্বাচন ও সম্ভব হয় না। কার্পাসের গুণ নির্ভর করে ইহার আঁশের দৈর্ঘ্যের উপর অর্থাৎ যে কার্পাসের আঁশ যত লম্বা সেই কার্পাসে তত সূক্ষ্ম সূতা কাটা যায়। ইহার কারণ এই যে আঁশ যত লম্বা হইবে, সূতাও তত সূক্ষ্ম ও মিহি হইবে—ইহাই প্রকৃতির বিধান।

কার্পাসের আঁশ

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একটি কার্পাস আঁশ দেখিতে ঠিক স্প্রিংএর মত অর্থাৎ স্প্রিংএ যেমন প্যাঁচ থাকে কার্পাস আঁশেও অনুরূপ অসংখ্য প্যাঁচ

(Twist) থাকে। কার্পাস-আঁশে এরূপ প্রকৃতিদত্ত প্যাঁচ বৃদ্ধি করিয়া সূতা পাওয়া যায়।

যে তুলার আঁশে উপরোক্ত প্যাঁচ অবর্তমান সেই কার্পাসে সূতা কাটা কখনও সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিমূল তূলার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার আঁশ সরল, প্যাঁচের অবর্তমানে একটি আঁশ অন্য আর একটি আঁশের সঙ্গে যুক্ত হয় না। সেজন্য শিমূল তূলা দ্বারা একটানা সূতা বাহির করা অসম্ভব।

ভারতবর্ষে যে সকল কার্পাস সাধারণতঃ জন্মিয়া থাকে ইহাদের আঁশের দৈর্ঘ্য ৩/৮" ইঞ্চি হইতে ১" ইঞ্চির সামান্য অধিক পর্যন্ত হইয়া থাকে। আর ব্যাসের মাপ সাধারণতঃ এক ইঞ্চির ১/৬০০ ভাগ হইতে ১/২০০ ভাগ পর্যন্ত হইয়া থাকে।*

পূর্বেই বলিয়াছি কার্পাসের আঁশ যত লম্বা হয় তত সূক্ষ্মও হইয়া থাকে। কিন্তু একটি আঁশের মোটাই* (পুরু) সর্বত্র সমান নয়। এই কারণেই আঁশে প্যাঁচ পড়ে আর এই প্যাঁচ আছে বলিয়াই সূতা কাটিবার সময় একটি আঁশ অপর আর একটি আঁশকে অনায়াসে জড়াইয়া লইতে পারে এবং আমরা যতখুশী লম্বা সূতা বাহির করিতে পারি। অবশ্য একথা সত্য যে একটি আঁশের মোটাইয়ের অসমতা নগ্নদৃষ্টিতে চোখে পড়ে না। বেশ শক্তিসম্পন্ন অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাহা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মৃত ও অপক্ব আঁশে প্যাঁচ থাকে না, সেজন্য সূতা কাটার পক্ষে ইহা অবশ্য পরিত্যাজ্য।

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একটি আঁশে তিনশতটি পর্যন্ত প্যাঁচ গণনা

---

* আঁশের ব্যাসের মাপ বলিতে হিন্দিতে 'মোটাই' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

"Cotton fibre varies from 0·00046 to 0·001 inch. The longest fibres having the least diameter"—Textile Fibres by M. Maltews.

করা গিয়াছে। উপরে কার্পাস-আঁশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা ছাড়াও কাটুনি ও কার্পাসচাষে প্রবৃত্ত সকলের পক্ষেই নিম্নলিখিত তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজন। (১) কার্পাসের নাম (২) কোথায় সেই কার্পাসের চাষাবাদ হয় (৩) সেখানকার জলবায়ু (৪) সেখানকার মাটির প্রকার (৫) বপনকাল (৬) কার্পাস সংগ্রহের সময় (৭) গাছের আয়তন (৮) উৎপন্নহার (৯) তূলার ভাগ (১০) আঁশের দৈর্ঘ্য (১১) সর্বাধিক কত নম্বর সূতা সহজে কাটা যায় (১২) তূলার রঙ ও (১৩) অপর গুণ।

সাধারণতঃ কার্পাস চাষীরা বিশেষ কোন জাতীয় কার্পাসের চাষ করিয়া থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রেও নূতন নূতন পরীক্ষা বা গবেষণার অবকাশ আছে। কারণ দেখা গিয়াছে যে যত্ন ও পরিচর্যার গুণে একস্থানের কার্পাস অন্যস্থানেও ফলিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাম্বোডিয়া নামক কার্পাসের কথাই উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় কার্পাসের মধ্যে কাম্বোডিয়া একটি উৎকৃষ্ট জাতের বলিয়া খ্যাত। সাধারণতঃ কোয়েম্বাইটোর, মাদুরা, সালেম, রামনাদ প্রভৃতি স্থানের চাষীরা ইহা ফলাইয়া থাকে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে মধ্য প্রদেশেরও স্থানে স্থানে কাম্বোডিয়ার ফলন ভাল হয়। ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বিশ্বভারতীর বিনয়ভবনেও পর পর কয়েক বৎসর কাম্বোডিয়া ফলাইয়া ভাল ফল পাওয়া গিয়াছিল। মাটির স্বাভাবিক গুণ ও জলবায়ুর প্রভাব চাষবাসের কাজে সর্বদাই স্বীকার্য কিন্তু আসল কথা এই যে কার্পাস-চাষের উন্নতি এদেশে আরও হইতে পারে। এই সম্পর্কে গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গীটি শিক্ষককে আহরণ করিতে হইবে। তাহা হইলে বিদ্যার্থীর অনুপ্রেরণা লাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারে। শিক্ষার মাধ্যমেই এই গবেষণাত্মক দৃষ্টি জনসাধারণকেও দিতে হইবে। আমাদিগকে এই কথা ভুলিলে চলিবে না, সূক্ষ্ম মসলিনের কার্পাস এদেশে এক সময়ে জন্মাইত। লম্বা আঁশের কার্পাসের জন্য আমেরিকা বিখ্যাত। তিন চার দশক পূর্বে

বোটানিষ্ট দ্বিজদাস দত্ত (এখন স্বর্গীয়) উৎকৃষ্ট দীর্ঘআঁশের আমেরিকান কার্পাসের চাষ করিয়া সুফল পাইয়াছিলেন। দেশের তখনকার পরিস্থিতিতে তাঁহার গবেষণার বিবরণ লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া যায়।

আজকাল জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্পাস সম্বন্ধে গবেষণা হইতেছে। শিক্ষকমাত্রেরই উচিত এই গবেষণার বিবরণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা এবং সুযোগ ও সাধ্যমত শিক্ষাশিবির সমূহে জ্ঞান পরিবেশন করা। শিক্ষকের প্রধান কাজ শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিবেশ রচনা করা। পরিবেশ উত্তম হইলে শিক্ষার্থীরাও অনায়াসে আপনা হইতেই জ্ঞান কুড়াইয়া লইতে পারে। উত্তম পরিবেশের প্রভাব সমাজকেও উন্নত করে। নিম্নে এই বিশাল দেশে জাত নানা ধরণের কার্পাসের মধ্যে কয়েকটির পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

দাক্ষিণাত্যের কার্পাস

১। নামঃ—ওয়েষ্টার্ণ (Western H. I.) স্থানঃ ভেল্লীর জেলা, অনন্তপুর, তামিলনাদ। জলবায়ুঃ ২০" ইঞ্চি বারিপাত, ১০২° ডিগ্রী উত্তাপ।

জমিঃ দোঁয়াশ কালো মাটি। বপন কালঃ সেপ্টেম্বর মাস। কার্পাস সংগ্রহের সময়ঃ মার্চ ও এপ্রিল। গাছের আয়তনঃ তিনফুট খাড়াই (উচ্চ) ও দুইফুট বেড়।

উৎপন্ন-হারঃ প্রতি একরে ২০০-৩০০ পাউণ্ড। তূলার ভাগঃ শতকরা ৩০। আঁশের দৈর্ঘ্যঃ '৮১২৮৮। সূতার নম্বরঃ ৩০ নং পর্যন্ত কাটা যায়। রংঃ বাদামী আভা বিশিষ্ট সাদা।

অপচয়ঃ ২-৪ পর্যন্ত। গুণঃ কোমল।

২। পত্তুপত্তি। স্থানঃ গঞ্জাম, ভিজাগাপত্তম।

জলবায়ুঃ ৬০"—৮০" বারিপাত। জমিঃ পাহাড়ী ঢালু। বপনকালঃ

সম্বৎসর বীজ বপন করা চলে। সংগ্রহকাল : মার্চ ও এপ্রিল। গাছের আয়তন : ৬´×২$\frac{১}{৪}$´।

উৎপন্ন হার : প্রতি একরে ১০০ পাউণ্ড। তূলার ভাগ শতকরা : ২২। সূতার নম্বর : ১০ হইতে ১২ অনায়াসে কাটা যায়। আঁশের দৈর্ঘ (লম্বাই) : $\frac{৭}{১০}$" হইতে $\frac{৩}{৪}$"। রং : ধবধবে সাদা। অপচয় : শতকরা ২৭ ভাগ। অন্যান্য গুণ : সিল্কের মত মোলায়েম।

৩। উপ্পম (Uppam 2619)। স্থান : কোয়েম্বাইটুর, রামনাদ, তিরোনেল ভেল্লী। জলবায়ু : ২৫" বারিপাত।

জমি : কালোমাটি! বপনকাল : সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর। আয়তন : ৩´×২$\frac{১}{২}$´। সংগ্রহ : এপ্রিল ও মে। উৎপন্নহার : ৩০০—৪০০ পাউণ্ড। তূলার ভাগ : ২৫। আঁশের দৈর্ঘ : ˙৭৫ হইতে ˙৮৫ ইঞ্চি। সূতার নম্বর : ১৮। রং : সাদা। অপচয় : ১৬। অন্যান্য গুণ : সাধারণতঃ কোমল।

৪। কাম্বোডিয়া। স্থান : কোয়েম্বাইটুর, মাদুরা, সালেম, রামনাদ, তিরোনীভেল্লী। জলবায়ু : ২৫" ইঞ্চি বারিপাত। জমি : দোঁয়াশমাটি; উত্তাপ : ৬০°—৯০° ডিগ্রী। বপনকাল : সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর। পরিসর : ২$\frac{১}{২}$´×১$\frac{১}{২}$´। সংগ্রহ : ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল। উৎপন্নের হার : ৭০০—১৫০০ পাউণ্ড। তূলার ভাগ : ৩৭। আঁশের দৈর্ঘ : $\frac{৮৫}{১০০}$" হইতে ১"। সূতার নম্বর : ৩৭। রং : সাদা। অপচয় : ৩˙৬৫। গুণ : অতি কোমল।

৫। কোকনাদ। স্থান : গণ্টুর, নেল্লার। জলবায়ু : ৩৫" বারিপাত। জমি : কালোমাটি। আয়তন : ৩´×১$\frac{১}{২}$´। বপনকাল : সেপ্টেম্বর। সংগ্রহ : মার্চ ও এপ্রিল। ফলন : ৪০০ হইতে ৫০০ পর্যন্ত। তূলার ভাগ : ২৫। সূতার নম্বর : ২৪। আঁশের দৈর্ঘ্য : ˙৮২ হইতে ˙৯২ ইঞ্চি। রং : লালচে সাদা। অপচয় : ১৫। অন্যান্য গুণ : সাধারণ কোমল।

৬। বারুঙ্গাণী (K.I.)। স্থান : কোয়েম্বাইটুর, মাদুরা, রামনাদ,

তিরুনেলভেল্লী। জলবায়ু: ৩০″ বারিপাত। উত্তাপ: ৫৬°—৯৯°। বপনকাল: সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর। আয়তন: ২½′×১½′। সংগ্রহ: মার্চ ও এপ্রিল। ফলন: ৩০০ হইতে ৫০০ পাউণ্ড পর্যন্ত। তূলার হার: ৩১। আঁশের দৈর্ঘ্য: ·৮০—·৮৭ ইঞ্চি। সূতার নম্বর: ৩০। রং: উজ্জ্বল বাদামী। অপচয়: ৭·১। গুণ: কোমল।

৭। গুদ্দিপাতি। স্থান: ভিজাগাপত্তম, কোরাপাত। জলবায়ু: শুষ্ক প্রায়, বারিশূন্য। বপনকাল: জুন ও জুলাই। সংগ্রহ: অক্টোবর ও নভেম্বর। ফলন: ৪০০—১০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত। তূলার হার: ২৫—৩৫। সূতার নম্বর: ১০—২০। আঁশের দৈর্ঘ্য: ½″—১″। রং: সাদা। অপচয়: ২। গুণ: মোটা ও মজবুত।

৮। বেল্‌মা। স্থান: গঞ্জাম, ভিজাগাপত্তম। জলবায়ু: শুষ্ক ও প্রায় বারিশূন্য। বপনকাল: জুন ও জুলাই। সংগ্রহ: অক্টোবর ও নভেম্বর। ফলন: ৪০০ হইতে ১০০০ পাউণ্ড। তূলার হার: ২৫—৩০। সূতার নম্বর: ২২—হইতে ৬০। আঁশের দৈর্ঘ্য: ½″—১″। রং: সাদা। অপচয়: ২। গুণ: মোটা ও শক্ত।

৯। কন্দাপতি বা পটুশালী। স্থান: গঞ্জাম, ভিজাগাপট্টম। জমিন: পাহাড়ী, ঢালু। জলবায়ু: ৬০″—৮০″। বপনকাল: সারা বৎসর। আয়তন: ৬′×২¼′। সংগ্রহ: সাধারণতঃ মার্চ ও এপ্রিল। কিন্তু বৎসরের সকল সময়েই কিছু না কিছু পাওয়া যায়। ফলন: ১০০ পাউণ্ড। তূলার হার: ২২। সূতার নম্বর: ইহার দ্বারা দক্ষ কাটুনিরা ১০০ নম্বরের সূতা কাটিয়া থাকে। আঁশের দৈর্ঘ্য: ¾″—⅞″। রং: সাদা। অপচয়: ১৭। গুণ: সিল্কের মত মোলায়েম।

১০। নাদাম বা দেশী। স্থান: ত্রিবাংকুর। বপনকাল: বৃষ্টির পর এপ্রিল হইতে জুলাই পর্যন্ত। আয়তন: ৫′×৫′। সংগ্রহ: বপনের

ছয় মাস পর হইতে ৫।৬ বৎসর কার্পাস পাওয়া যায়। ফলন: ছয় বৎসর প্রতি একরে ২৪৭০ পাউণ্ড। প্রতিগাছে প্রতিবৎসর: ৫—৭ পাউণ্ড। তূলার হার: ২০—২২। সূতার নম্বর: ১২—১৪। রং: ধপধপে সাদা। অপচয়: ৬। গুণ: কোমল, সাধারণ শক্তিবিশিষ্ট।

মধ্যপ্রদেশের কার্পাস

১১। রোজিয়াম (স্থানীয় নাম উমরাজ)। স্থান: মধ্যপ্রদেশ। বারিপাত: ৩০"—৪০"। জমি: কালোমাটি। উত্তাপ: ৮৪°—১১০° ডিগ্রী। বপনকাল: জুন। আয়তন: ৩'—৫' উচ্চ। সংগ্রহ: নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারী। ফলন: ৪০০ পাউণ্ড। রং: সাদা। তূলার হার: ৩৯। সূতার নম্বর: ৮—১২ আঁশের দৈর্ঘ্য: $\frac{৩}{১০}$"—$\frac{২}{৫}$"। গুণ: মোটা ও খসখসে।

১২। যাদি। স্থান: মধ্যপ্রদেশ। জলবায়ু: ৩০"—৪০" বারিপাত। উত্তাপ: ৮৫°—১১০° ডিগ্রী। জমি: কালোমাটি। বপনকাল: জুন। আয়তন: ৩'—৫' উচ্চ। সংগ্রহ: নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী। ফলন: ৩৫০ পাউণ্ড। রং: প্রায় শুভ্র। তূলার হার: ৩৪। সূতার নম্বর: ১০—১২। আঁশের দৈর্ঘ্য: $\frac{২}{৫}$"—$\frac{১}{২}$"। গুণ: অতি মোলায়েম।

পশ্চিমভারতের কার্পাস

১৩। ব্রোচ (Broach)। বাজারে চলিত নাম দেশী নম্বর আট। স্থান: ব্রোচ জেলা। গভর্ণমেণ্ট ফার্ম—ব্রোচ। জলবায়ু: ৩০" বারিপাত। জমি: কালোমাটি। বপনকাল: মৌসুমী বায়ু ও বারিপাতের পূর্বে জুনের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে জুলাইএর প্রথম সপ্তাহ মধ্যে। আয়তন: ৩'—৬" × ২'—৬"। সংগ্রহ: মধ্য ফেব্রুয়ারি হইতে মধ্য মার্চ পর্যন্ত। ফলন: সাধারণ চাষীরা ৩৫০—৪০০ পাউণ্ড পর্যন্ত ফলাইয়া থাকে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ফার্মে ৭০০ পাউণ্ড পর্যন্ত। রং: সাদা। তূলার হার: ৩৩।

অপচয় নগণ্য। সূতার নম্বর ৩৮। আঁশের দৈর্ঘ্য $\frac{১৫}{১৬}$"। গুণ: মোলায়েম।

১৪। কান্‌বী। স্থান: ব্রোচজিলা। বপনকাল, জলবায়ু, গাছের আয়তন, সংগ্রহকাল, ফলনের হার ও রং পূর্বোক্ত ব্রোচ কার্পাসের ন্যায়। কিন্তু তূলার হার: ৪০। সূতার নম্বর: ১৫। আঁশের দৈর্ঘ্য: $\frac{৪}{৫}$"। গুণ: মোলায়েম।

১৫। মাত্তিয়া। স্থান: দক্ষিণ কাথিয়াবাদ। আমরেলী জিলায় যুদ্ধের পূর্বে ৮৪১৪৯ একর পরিমিত ভূমিতে ইহার চাষ হইত। জলবায়ু ২০" বারিপাত। জমি: কালোমাটি। বপনকাল: জুনের শেষাংশ। সংগ্রহকাল: নভেম্বর মাসের শেষার্ধ। ফলন: ৩০০—৪০০ পাউণ্ড। রং: সাদা। তূলার হার: ৩২। সূতার নম্বর: ১০। আঁশের দৈর্ঘ্য: $\frac{১}{২}$"। গুণ: খসখসে।

১৬। সূর্তি (১০১৭ এ, এল্ এফ)। স্থান: সুরাট রাজ্যে ও বরদা জিলায় ইহার চাষ হইয়া থাকে। জলবায়ু: ৩০"—৪০"। জমি: কালো-মাটি। বপনকাল: জুনমাসের তৃতীয় সপ্তাহ। আয়তন: ২'—৩"×২'—৩" উচ্চ। মার্চ মাসের মধ্য হইতে বোনা হয়। ফলন: ৪০০—৫০০ পাউণ্ড। রং: নির্মল শুভ্র। তূলার হার: ৩৪—৩৬। সূতার নম্বর: ৩২। আঁশের দৈর্ঘ্য: পুরাপুরি এক ইঞ্চি। গুণ: মোলায়েম ও শক্ত। ভারতীয় উত্তম কার্পাসের মধ্যে ইহা একটি।

১৭। বাগাদ। স্থান: আমেদাবাদ জিলার অন্তর্গত সানাদ, বিরামগ্রাম, ধক্কা, ধারধোকা নামক স্থানে, বরোদা রাজ্যের মালানা নামক স্থানে, উত্তর কাথিয়াবাদে ও ব্রোচে জন্মিয়া থাকে। ইহার বৈশিষ্ট এই যে অন্যান্য কার্পাসের ন্যায় ইহার পক্ক বোঁটা ফাটে না। বোঁটা সংগ্রহ করিয়া কার্পাস হাতে বাহির করিতে হয়। বারিপাত সামান্য। জমি: মিশ্রিত মাটি। বপন-কাল: জুলাই ও আগষ্ট। সংগ্রহ: এপ্রিল ও ইহার পূর্বে। ফলন: ৫৭৫

—৬৫০ পাউণ্ড। রং: সাদা। তূলার হার: ৩৫—৪০। অপচয়: অত্যধিক। সূতারনম্বর: ১২। আঁশের দৈর্ঘ্য: ·৭১—·৮২ ইঞ্চি। গুণ: খসখসে। মামুলী শক্তিসম্পন্ন।

১৮। দেশী (বেঙ্গল)। স্থান: জয়পুর ও মেবার। জলবায়ু: শুষ্ক। বপন কাল: জুন ও জুলাই। আয়তন: ৩´× ২´। সংগ্রহ: নভেম্বর ও ডিসেম্বর। ফলন: ১৮০ পাউণ্ড। রং: সাদা। অপচয়: ৬½। সূতার নম্বর: ১৫—১৬। আঁশের দৈর্ঘ: প্রায় অর্ধ ইঞ্চি। গুণ: খসখসে।

১৯। দেশী (বেঙ্গল)। স্থান: কারাওয়ালী ষ্টেট্। গুণে ইহা ১৮ নম্বর কার্পাসের মত কিন্তু ইহা দ্বারা ২৫ নম্বর পর্যন্ত সূতা কাটা যায়।

২০। নিউ জয়বন্ত (Cross)। স্থান: ধারওয়ার গবর্ণমেণ্ট ফার্ম, বোম্বে। জলবায়ু: ২২" বারিপাত। জমি: কালোমাটি। বপনকাল: আগষ্টের প্রথমভাগে। আয়তন: ৪´× ২´-২"। সংগ্রহ: মার্চ। ফলন: ৬৬৪ পাউণ্ড। রং: ধবধবে সাদা। তূলার হার: ৩৩। অপচয়: ১২। সূতার নম্বর: ৪০। আঁশের দৈর্ঘ্য: ·৯৩" ইঞ্চি।

২১। গডক (উপল্যাণ্ড) পূর্বোক্ত গবর্ণমেণ্ট ফার্ম। জমি: সাধারণ কালোমাটি। বারিপাত: ২৫"। বপনকাল: সেপ্টেম্বর। আয়তন: ৩০"× ২০"। সংগ্রহ: মার্চ। ফলন: ২৫০ পাউণ্ড। রং: সাদা। তূলার হার: ৩৩। অপচয়: ১৩। সূতার নম্বর: ৪০। আঁশের দৈর্ঘ্য: ৮·৩" যুদ্ধের পূর্বে দুইলক্ষ একর পরিমিত জমিতে চাষ হইত।

২২। জয়বন্ত (X ও Y 14 cross)। স্থান: পূর্বোক্ত গবর্ণমেণ্ট ফার্ম। জমি: কালোমাটি। জলবায়ু: ২৫" বারিপাত। বপনকাল: আগষ্টের প্রথমভাগ। আয়তন: ৪০"× ২২"। সংগ্রহ: মার্চ। ফলন: ৬৬৪ পাউণ্ড। রং: ধপধপে সাদা। তূলার হার: ৩৩। অপচয়: ১২। সূতার নম্বর: ৪৫। আঁশের দৈর্ঘ্য: ·৯৩ ইঞ্চি।

২৩। ধারওয়ার আমেরিকান (Dharwar American)। স্থান: পূর্বোক্ত গবর্ণমেণ্ট ফার্ম। জমি: কালোমাটি। জলবায়ু: ২৫″ বারিপাত। বপনকাল: ১৫ সেপ্টেম্বর। আয়তন: ২০″×১৮″। সংগ্রহ: মার্চ। ফলন: ২০০ পাউণ্ড। রং: ঘোলাটে সাদা। তূলার হার: ২৯। অপচয়: ১৩। সূতার নম্বর: ২০। আঁশের দৈর্ঘ্য: ·৭৩″ ইঞ্চি।

২৪। কুমপাতা। স্থান: পূর্বোক্ত গভর্ণমেণ্ট ফার্ম। জমি: কালোমাটি। জলবায়ু: ২৫″ বারিপাত। বপনকাল: আগষ্ট মাসের প্রথমভাগ। আয়তন: ২০″×৪০″। সংগ্রহ: মার্চ। ফলন: ৬৬০ পাউণ্ড। রং: সামান্য লালচে। তূলার হার: ২৬। অপচয়: ১৬—২৭। সূতার নম্বর: ২৮। আঁশের দৈর্ঘ্য: ·৮৬″ ইঞ্চি। যুদ্ধের পূর্বে বহুলক্ষ পরিমিত জমিতে এই কার্পাসের চাষ হইত।

পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের কার্পাস

২৫। বুড়ী বা বাম্‌নী। একই কার্পাস বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। বপনকাল: মে মাস। সংগ্রহকাল: বপনের আট-মাস পর হইতে ৪।৫ বৎসরকাল কার্পাস পাওয়া যায়। রং: সাদা। তূলার হার: ২৮—২৯। সূতার নম্বর: ৪০ বা তদূর্ধ্বেও সম্ভব। আঁশের দৈর্ঘ্য: ১$\frac{১}{১০}$—১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি পর্য্যন্ত। গুণ: বিশেষ মোলায়েম। গৃহস্থ কাটুনীর পক্ষে এই কার্পাসের গাছ লাগানো বিশেষ সুবিধাজনক।

২৬। যাতা: বাংলা দেশে প্রায় সকল অঞ্চলেই জন্মে। বপনকাল: মে। সর্বপ্রকারেই ইহা পূর্বোক্ত বুড়ী কার্পাসের অনুরূপ। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে এই কার্পাস দেও বলিয়া পরিচিত।

২৭। টিপারা: স্থান: ত্রিপুরা ষ্টেট, আসাম ও চট্টগ্রাম (পূর্ব পাকিস্থান)। বপনকাল: মে। সংগ্রহ: ডিসেম্বর—ফেব্রুয়ারী। রং: ধবধবে

সাদা। তূলার হার: ৪০—৪৫। সূতার নম্বর। ১০—১২। আঁশের দৈর্ঘ্য: ½"—⅝"। গুণ: খসখসে।

বিশিষ্ট কার্পাস

২৮। কোকটি। নিজস্ব রঙের জন্য ইহার খ্যাতি আছে। স্থান: নেপাল, তরাই, দ্বারভাঙ্গা, মুজাফরপুর, ভাগলপুর ও উত্তর চম্পারণ। বারিপাতের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান সমূহে ইহার ফলন ভাল হয়। বিশ্বভারতীতেও গোটা ২০।৩০ গাছ লাগাইয়া ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। বপনকাল: অক্টোবর ও নভেম্বর, আবার মে মাসের শেষভাগে। সংগ্রহ: বপন যখনই করা হোক না কেন কার্পাস সংগ্রহের উপযুক্ত সময় জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর। আয়তন: ৪´—৫´×৩´ আন্দাজ বেড়। ফলন: অল্পাধিক ৩৩০ পাউণ্ড। তূলার হার: ১৮—২২। সূতার নম্বর: ২৫—৪০, এমন কি ৬০ পর্যন্ত কাটা যায়। অপচয়: ৬—৭। আঁশের দৈর্ঘ্য: ½"—¾"। গুণ: মোলায়েম।

২৯। বগ্‌লা বা শিবান। স্থান: সারণ, দক্ষিণ দ্বারভাঙ্গা, মুজাফরপুর, পাটনা। বপনকাল: জুনের শেষ হইতে জুলাইএর শেষ পর্যন্ত। চাষীরা প্রাচীন প্রথানুযায়ী রোহিনী নক্ষত্রে বীজ বপন করিয়া থাকে। আয়তন: ৪´—৫´ উচ্চ ও ৭´—৯´ বেড়। সংগ্রহ: মে ও জুন। ফলন: ৪০০—৮০০ পাউণ্ড। অপচয়: ৬¼। রং: ধবধবে সাদা। তূলার হার: ৩৩—৪০, সূতার নম্বর: সাধারণতঃ ১২ কিন্তু ২০ পর্যন্ত কাটা চলে। আঁশের দৈর্ঘ্য: ¼"—¾"। গুণ: মামুলী কোমল। কোন কোন স্থলে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যা ইত্যাদি না পাওয়ায় যুদ্ধপূর্ব বিবরণীর উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে।

উপরে নমুনা স্বরূপ মাত্র ২৯টি কার্পাসের বর্ণনা দেওয়া হইল। এখানে অন্যান্য কার্পাস সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। এই বিশাল দেশ বহু গুণ-বিশিষ্ট বিভিন্ন কার্পাসে সমৃদ্ধ। তাছাড়া মাটির তারতম্য জলবায়ু ও

পরিচর্যার উপর একই জাতীয় কার্পাসের গুণাগুণের এদিক সেদিক হইতে পারে ও হইয়া থাকে।

শিক্ষা ও তূলার চাষ

বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে, শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রে যথাযথ তূলার চাষ হওয়া প্রয়োজন। তূলার চাষ না করিলে শিক্ষার দিক দিয়া কার্পাস শিল্পের চর্চা যথার্থ হইতে পারে না। বিদ্যার্থীরা তূলার ক্ষেত পর্যবেক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া নিজের হাতে চাষাবাদ করিবে। বীজ নির্বাচন, বপন, গাছের পরিচর্যা, গাছে ফুলের উদ্গম, ফুলের অবস্থান্তর পর্যবেক্ষণ, পাকা ফল সংগ্রহ ইত্যাদির কাজ পর্য্যায়ক্রমে শিখিবে। পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা (যেমন কতদিনে গাছে ফুল হয়, ফুল কতদিনে ফলে পরিণত হয়, পরিণত ফল কখন ফাটিয়া চয়নের উপযুক্ত হয় ইত্যাদি) শিখিবে। জমি, সার ও সেচ সম্পর্কে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান সঞ্চয় করিবে, পরে পক্ক ফল চয়ন করিয়া যে যে প্রণালীতে পরিষ্করণ হইতে আরম্ভ করিয়া, বীজ ছাড়ানো, ধুনা ও পাঁজ যেভাবে করিতে হয় তাহা করিবে। এইপথে নিজেদের শ্রমে উৎপাদিত তূলায় শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সূতা কাটা শিখিবে। এই অভিজ্ঞতা অর্জিত জ্ঞান সূতাকাটার কালে ইহার গুণাগুণের উপর প্রতিফলিত হইতে বাধ্য। নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেই তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই জ্ঞান নিছক পুঁথি ও বক্তৃতার বিষয় হইয়া দাঁড়াইলে শিক্ষাক্ষেত্রে কার্পাস শিল্পের প্রয়োগ কালক্রমে প্রাণহীন হইযা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য।

তূলার জাতি নির্বাচন

বুনিয়াদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ বিবেচনা সহকারে তূলার বীজ (জাতি) নির্বাচন করিতে হইবে। এই কাজ প্রথমতঃ শিক্ষকের কর্ত্তব্য ; এই বিচার

ও নির্বাচন কার্যে বিদ্যার্থীকেও সহযোগী করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যার্থী এই বিচার ও নির্বাচনের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারে। বিবেচনা ও বিচারের বিষয় হইবে যথাক্রমে স্থানীয় জমির স্বরূপ, জলবায়ু, তূলার উৎপন্নহার ও অন্যান্য গুণসমূহ। যে অঞ্চলে যে যে তূলা সহজে উৎপন্ন হয়, তাহারই এক বা একাধিক জাতের তূলার বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে। পরীক্ষামূলকভাবে উৎকৃষ্টতর তূলার চাষও করা উচিত এবং ফলাফল কঠোরভাবে বিচার করিয়া ভবিষ্যতের কথা ভাবা উচিত।

শিক্ষা ও তূলার চাষের ভবিষ্যৎ

দেশ এখন স্বাধীন। দেশকে সকল দিক দিয়া সমৃদ্ধ করিবার দায়িত্ব দেশবাসীর। আজ যাহারা বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ছাত্র কালক্রমে তাহারাই দেশের শিক্ষিত নাগরিক হইবে। বুনিয়াদি শিক্ষার মাধ্যমে দেশময় তূলার চাষের ব্যাপক চর্চা হইতে থাকিলে কালে দেশে তূলা চাষেরও উন্নতি হইবে, এই আশা করা মোটেই অসঙ্গত নহে। বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষককে সেই দৃষ্টিভঙ্গিটি লইয়া এ বিজ্ঞানের চর্চায় মনোনিবেশ ও শ্রম করিতে হইবে এবং গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গীটি বিদ্যার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করিতে হইবে। একমাত্র এই পথে শিক্ষার মাধ্যমে আমরা দেশের কার্পাসশিল্পের সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি বাড়াইতে সমর্থ হইব।

বর্তমানযুগে বিজ্ঞানের চর্চা পৃথিবীর সকল দেশেই বাড়িতেছে। সেজন্য প্রথমে দেশের বিভিন্নস্থানে ও বিদেশে তূলার চাষের নিত্যনূতন গবেষণার ফল সম্পর্কে শিক্ষকগণ সচেতন থাকিতে সচেষ্ট হইবেন; কারণ ইহা যথার্থ শিক্ষক বা গুরুরই কাজ।

চরকার ঐতিহ্য ও বিদ্যালয়ে চরকার ব্যবহার

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তকলি ও চরকাকে বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনার কেন্দ্র স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। তকলির ন্যায় চরকাও আজ বিদ্যালয়ে চলিতেছে। মহাত্মা গান্ধী শুধু সূতা কাটাকেই শিক্ষার অঙ্গীভূত করেন নাই, উপরন্তু তকলি ও চরকার নির্মাণ পদ্ধতি ও সেই সঙ্গে কাঠের ও ধাতুর কাজ শিক্ষাশিল্পের অঙ্গীভূত করার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

এখানে আমরা আলোচনা শুধু চরকাতেই নিবদ্ধ রাখিব। প্রতিটি শিক্ষা শিল্পের তিনটি রূপ আছে, যথা ইহার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। চরকা সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। চরকার সহিত ভারতীয় ঐতিহ্যের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক মাত্রেরই অন্ততঃ অতীত ও বর্তমান রূপের সঙ্গে পরিচয় থাকা নিতান্ত প্রয়োজন অর্থাৎ প্রাচীন কালে চরকা কিরূপ ছিল এবং বিবর্তনের পথে চরকা বর্তমানে কিরূপ হইয়াছে তাহা জানিবার বিষয়। অতীতে ও বর্তমানে চরকার আকার, গঠন, ব্যবহার ও উৎকৃষ্টাপকর্ষ বুঝিতে পারিলে ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। নূতন ও উন্নততর চরকার উদ্ভাবন এই পথেই সম্ভব। শিক্ষার মাধ্যমেই এই জ্ঞান সম্যক প্রচারিত হইতে পারে এবং তাহা হইলেই জনসাধারণের সৃষ্টি মূলক প্রতিভা বিকশিত হওয়ার পথ প্রশস্ত হওয়া সম্ভব। তাহা না করিয়া নিছক কলের ন্যায় চরকাকে ব্যবহার করিলে ইহা একঘেয়ে ও নীরস হইতে বাধ্য। চরকা শিল্প সৃজনী শক্তি বিকাশের আধার না হইলে কখনও খাঁটি শিক্ষা শিল্পে পরিণত

হইবে না। আর সেই পথ প্রশস্ত না হইলে বুনিয়াদি শিক্ষার ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিত্থালয়ে চরকা প্রচলনের সার্থকতাও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য।

সমাজজীবনে চরকা শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও লোকপ্রতিভার বিকাশ

যে সকল যন্ত্র বা সরঞ্জামের দ্বারা ভারতীয় কার্পাস শিল্পের অতুলনীয় ঐশ্বর্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, যথাসম্ভব তাহাদের পরিচয় গ্রহণে যত্নশীল হইলে আমরা দেখিতে পাই কত বিচিত্র উপাদানে, সহজ উপায়ে স্থানীয় সুলভ বস্তুর সাহায্যে সাধারণের শিল্প প্রতিভা বিকাশের প্রথা এদেশে স্থিতি লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় কার্পাস শিল্পের সাংস্কৃতির পূর্ণতর রূপ বুঝিতে হইলে প্রাচীন যন্ত্রাদির সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ অত্যাবশ্যক।

আধুনিক কলের যুগে বিশেষজ্ঞের প্রতিভাই শুধু কার্যকরী হইতে পারে ও হইয়া থাকে। জনসাধারণ আধুনিক আবিষ্কারের ফলে পরোক্ষ ভাবে লাভবান হইলেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে লাভবান সামান্যই হয়। অন্য কথায় লোকশিক্ষার মান উন্নয়নে আধুনিক কল সহায়তা করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ নহে। কিন্তু শিক্ষা ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে তাহা সম্ভব। শিক্ষা ক্ষেত্রে শিল্পের প্রসার এরূপ হইবে যাহাতে বিত্থার্থীর জ্ঞান ও সৌন্দর্যবোধের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইতে পারে; শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি ও আসবাব সম্বন্ধে বিত্থার্থী প্রকৃষ্ট জ্ঞান পাইতে পারে; লোক প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে এবং সমাজ জীবনে, সাংস্কৃতিক জীবনে বিত্থার্থী আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সূত্র কর্তন শিল্পে যে সকল যন্ত্রাদি প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হইত কাটুনিরা নিজে অথবা পল্লীর কারিগরের সাহায্যে অত্যাবশ্যক কৃষি যন্ত্রাদির ন্যায় তাহা গড়িয়া লইতেন। তখনকার সামাজিক, অর্থনৈতিক

পরিবেশে ইহা সম্ভব ও সহজ ছিল। দুঃখের বিষয় সূতা কাটিবার প্রাচীন যন্ত্রাদি কলের প্রভাব অতিক্রম করিয়া সামান্যই রক্ষিত হইয়াছে। এদেশের জলবায়ু সেইজন্য কতকটা দায়ী আর কতকটা এদেশবাসীর দারিদ্র্য। কিন্তু প্রধানতঃ দেশের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার যুগে বৃটিশ আমলে সূতা কাটার শিল্প কৌশল প্রগতিহীন হইয়া লুপ্তপ্রায় হওয়ায় এই শিল্পের প্রাণস্বরূপ যন্ত্রাদি ও সরঞ্জাম কালগর্ভে বহুলাংশে হারাইয়া গিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে যখন এদেশ হইতে প্রচুর কার্পাস শিল্পসম্ভার পশ্চিম দেশ সমূহে চালান যাইত তখনও এই শিল্পের সরঞ্জাম পল্লী সমূহেই গঠিত হইত। কালের প্রভাবে বৃটিশ রাজত্ব কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং লাঙ্কাশায়ারের কলের কাপড় এদেশে চালু হওয়ার ফলে, দেশের স্বকীয় সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের দিনে শিল্প সরঞ্জামগুলিও লোপ পায়। সেই সকল রক্ষা পাইলে আজ আমরা নিশ্চিত ভাবে তখনকার শিল্প-সরঞ্জাম নির্মাণে জন প্রতিভার উৎকর্ষ সম্বন্ধে পূর্ণতর ঐতিহাসিক বিবরণ জানিতে পারিতাম।

প্রাচীন ভারতের শিল্প চর্চা পদ্ধতির একটি নিজস্ব ধারা ছিল। শিল্প চর্চার দ্বারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের সঙ্গে শিল্পিগণ সধারণতঃ নূতন নূতন সৃষ্টির বৈচিত্র্য দ্বারা আনন্দের পথও অন্বেষণ করিতেন। নিছক লাভ বা লোভের মোহে শিল্পীরা শিল্পচর্চা করিতেন না। প্রাচীন ভারতের কার্পাস শিল্পের অভাবনীয় উন্নতির মূলেও এই আদর্শ ও প্রেরণা বর্তমান ছিল। তাহা না হইলে ঢাকাই মসলিনের জন্ম হইত না। মোটা কাপড়ে স্বল্পায়াসে মানুষ লজ্জা নিবারণ করিতে পারিত। যে সকল উপাদানের সাহায্যে মসলিন ও তদনুরূপ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল সেই উপাদান সমূহের পরিচয় লাভ ভিন্ন ভারতের কার্পাস শিল্পের পূর্ণ রূপ উপলব্ধি করা কঠিন।

আজকাল বিদ্যালয়ে, শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রে, যুগপৎ ধনী দরিদ্রের কুটিরে, রাষ্ট্রপতি ভবনেও চরকা চলিতেছে। এ সময়ে এদেশের চরকার পরিচয় সকলেরই অল্পাধিক অর্জন করা প্রয়োজন।

চরকার আকারের পরিচয়

চরকা অতি প্রাচীন যন্ত্র। ইহা ভারতীয় কার্পাসশিল্পীর প্রতিভার একটি বিশেষ দান। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের চরকা তৈরী ও ব্যবহৃত হইত। ইহাদের মধ্যে গঠন, আকার ও টেকোর গতির যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু সকল প্রকার চরকার গঠনেই একটি মূলনীতি অনুসৃত হইত।

মহাত্মা গান্ধী চরকাকে পুনরায় চালু করিয়াছেন। তিনি তাঁহার "আত্মকথা বা সত্যের প্রয়োগ' গ্রন্থে লিখিতেছেন "১৯০৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত আমি চরকা কি তা দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না।……..গুজরাটি ভাইয়েরা আমাকে ভরুচ শিক্ষা পরিষদে ১৯১৭ সালে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ……… গুজরাটে ভাল রকম ঘোরার পর অবশেষে বরোদা রাজ্যের বিজাপুরে চরকা পাওয়া গেল।" এই উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি ১৯১৭ সালেই ভারতের প্রাচীন চরকা আবার পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়। ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু এই ঘটনারও পূর্বে ১৯০৫ সালে প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও বাংলাদেশের স্থানে স্থানে প্রাচীন সুপ্ত চরকা সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।*

*"তখন একসময় হঠাৎ দেখি সবাই স্বদেশী হুজুগে মেতে উঠেছে। তখনকার সেই স্বদেশী যুগে ঘরে ঘরে চরকা কাঁটা তাঁতবোনা বাড়ীর গিন্নি থেকে চাকর বাকর দাসদাসী কেউ বাদ ছিল না। মা দেখি একদিন ঘড় ঘড় করে চরকা কাটতে বসে গেছেন। মার চরকা কাঁটা দেখে হ্যাভেল সাহেব তার দেশ থেকে চরকা আনিয়ে দিলেন। বাড়ীতে তাঁত বসে গেল। ঘটাঘট শব্দে তাঁত চলতে লাগল। মনেপড়ে এই বাগানেই সুতো

প্রাচীন চরকার মৌলিক গঠন

চরকার চাকা ঃ—পুরাতন চরকা মাত্রেরই মূল গঠন সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার ও বুঝিবার বিষয়। (ক) গোরুর গাড়ীর জোড়া চাকার মত চরকার চাকা। চাকাটি অক্ষকে অবলম্বন করিয়া কাঠের পাতলা ফালির দ্বারা তৈয়ারী। দুইদিকের ফালিগুলির মধ্যস্থিত অক্ষের নাম "বেলন" অথবা "মাদলা"। মোটা ও শক্ত সূতা দ্বারা বেলনের উভয় পার্শ্বের ফালির বা পাখির মস্তকগুলি সংযুক্ত। ইহাই হইল চরকার চাকা।

চাকা ধারক খুঁটি ঃ—(খ) চাকাটিকে বহন করিবার জন্য দুইটি খাড়া খুটি বা পাওট থাকে। খুটি দুইটি আর একটি কাষ্ঠ খণ্ডের অর্থাৎ পিড়ার উপর দৃঢ়ভাবে অবস্থিত থাকে। আবার খুঁটি দুইটির উপরের অংশে বা মস্তকে গোল খাঁজ; এই খাঁজ দুইটির উপর চাকার অক্ষের বা ধুরার দুইদিক স্থাপিত। কিন্তু ধুরার এক অংশ খুঁটির বাহিরে টানা থাকে, ইহাতে একটি হাতল বসানো থাকে। এই হাতলের সাহায্যেই চরকার চাকা গতি সম্পন্ন করা হয়। একাজে দক্ষিণ হস্ত ব্যবহৃত হয়।

টেকো রাখিবার খুঁটি ঃ—(গ) একটি পৃথক কাষ্ঠ ফলকের উপর একটি অথবা দুইটি (কোন চরকায় তিনটি) খুঁটি বসানো থাকে। এই খুঁটি দুইটিতে টেকো বসান থাকে। মধ্যস্থিত তৃতীয় খুঁটিটি "মালকে" নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। টেকোটি ভুমির সমান্তরালে স্থাপিত।

উপরে বর্ণিত চরকা দুইভাগে বিভক্ত, যথা ঃ—(১) খুঁটি ও হাতল সমেত চাকা এবং (২) টেকো সমেত টেকোর খুঁটি। এই দুইটি অংশ আবার আর একটি কাষ্ঠ ফলক দ্বারা সংযুক্ত। ইহাই হইল প্রাচীন চরকা

রোদে দেওয়া হত। ছোট ছোট গামছা ধুতি তৈয়ারী করে মা আমাদের দিলেন। সেই ছোট ধুতি হাঁটুর উপর উঠে যাচ্ছে, তাই পরে আমাদের উৎসাহ কত।"

—ঘরোয়া, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ

সমূহের সাধারণ গঠন। চরকার চক্রের সঙ্গে টেকোর যোগ হয় একটি দৃঢ় সূত্রের দ্বারা ; ইহার প্রচলিত নাম "মাল"। চক্রটি ঘুরাইলে টেকোও ঘুরিতে থাকে।

মনুষ্য চালিত প্রথম সূতা কাটার কল এই চরকা। অশ্বশক্তিতে চালিত আধুনিক কলের মৌলিক সকল গুণই হস্ত চালিত চরকায় বর্ত্তমান। একই বিজ্ঞান উভয় প্রকার যন্ত্রের মূলনীতি। টেকোকে গতি সম্পন্ন করার জন্য চক্র রহিয়াছে। চক্র ঘুরাইবার হাতল আছে। হাতল ঘুরাইলে চক্র ও টেকো গতি সম্পন্ন হয়। ইহার ফরমূলা এরূপ দাঁড়ায়—

$$\frac{\text{চক্র ব্যাস}}{\text{টেকোর ব্যাস}} = \text{টেকোর গতি}$$

অর্থাৎ চক্রের ব্যাসকে টেকোর ব্যাস দ্বারা ভাগ করিলে টেকোর গতি নির্ণয় করা যায়।
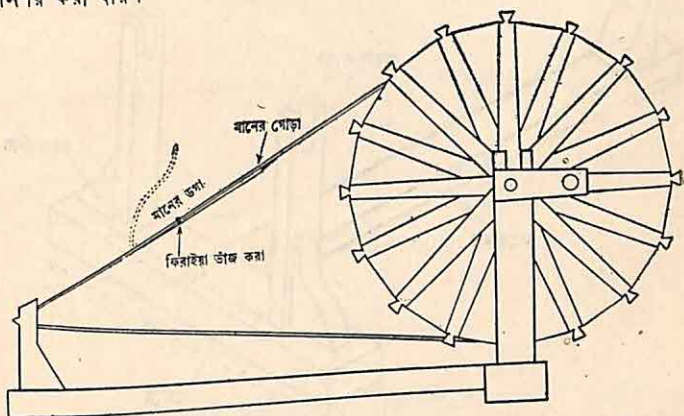
মালদড়ি পরানো রিলিফ চরকা—মালদড়ি পরাইবার ব্যবস্থা এই চিত্রে দেখান হইতেছে

রিলিফ চরকা। প্রাচীন চরকার মূল গঠন নীতি অবলম্বনে তৈরী এই চরকা বাংলা দেশে প্রবর্ত্তন করেন শ্রীসতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত। এই চরকা

এক সময় উত্তর বাংলায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন চরকার মৌলিক গুণ সমূহ ইহাতে বর্ত্তমান আছে। এই চরকার চিত্র, বর্ণনা ও বিবরণ অন্য প্রাচীন ধরনের চরকার বর্ণনা বুঝিতে সাহায্য করিবে।

এই চরকার প্রধান অঙ্গ তিনটি—পিড়া, চাকা ও টেকো।

পিড়ার নিম্নাঙ্গ ইংরাজী T অক্ষরের মত। ইহার সম্মুখ ভাগে টেকোর খুঁটি বসান ও অপর দিকে চরকার পাওট বসান, পাওটের নিম্নদেশ চতুষ্কোণ ছিদ্রের মধ্যে শক্ত করিয়া গাঁথা। পাওট যাহাতে না নড়ে সেজন্য পৃথক কোণ দ্বারা দৃঢ় করা। পাওটের মাথায় হাড়কাঠের মত খানিকটা কাটা। উহাতে চাকা বসাইয়া খিল পরাইবার ব্যবস্থা আছে। এই চিত্রে পিড়ার অংশ দেখান হইয়াছে।
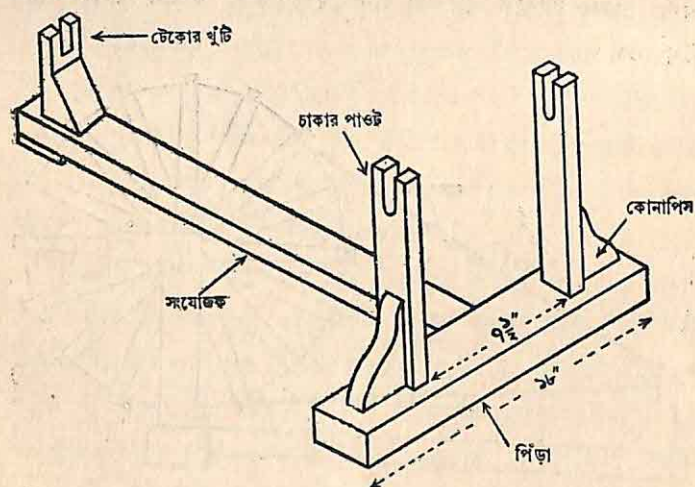
রিলিফ চরকার চক্রবিহীন নিম্নাংগ

চাকা ঃ—গোরুর গাড়ীর ন্যায় চাকাটি কতকগুলি পাখির দ্বারা প্রস্তুত।

একটি ধুরার মধ্যস্থলে পিণ্ডাকার বেলন আছে। তাহাতে পাখিগুলি পরান
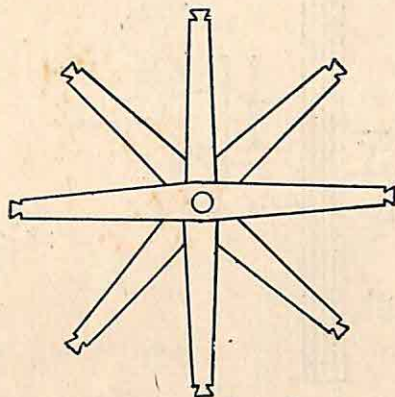
চরকার চাকায় সন্নিবেশিত পাখির দৃশ্য
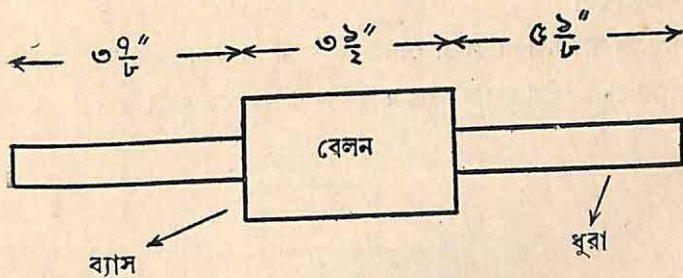
চঃকার চাকার পিণ্ডাকার বেলন

এবং সমভাবে একটি বৃত্ত আট ভাগে বিভক্ত করিয়া সাজান। একদিককার চারখানা পাখি অপর দিককার পাখির সঙ্গে হেরফের করিয়া সাজান।

পাখিগুলি ছোট তারকাঁটার দ্বারা বেলনের সঙ্গে এবং একটি পাখি অন্যটির সঙ্গে আঁটা। শেষে যে পাখি আছে সেটি যাহাতে ঘুরার সময়

খানা পাখি
বাতাসা
হাতল
সংযোজক
সিদ
পুরু

পাখি একত্র করা
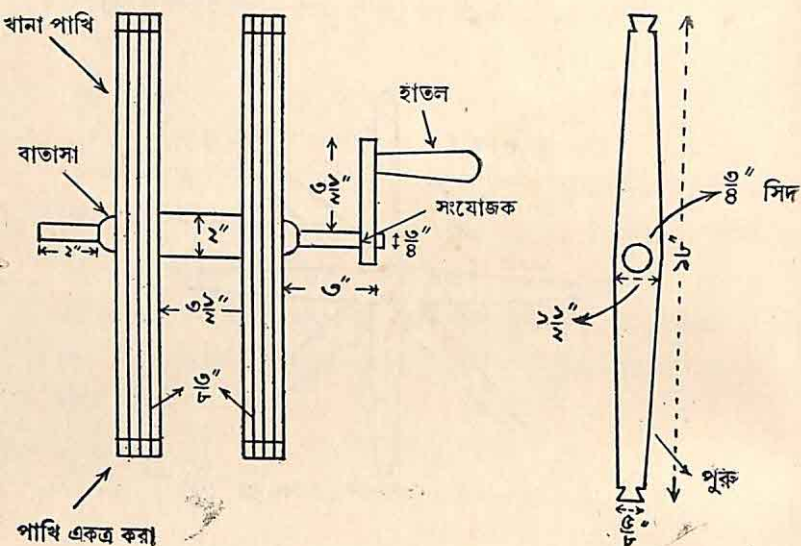
পাওটের সঙ্গে ঘসা না লাগে সেজন্য একখানা বাতাসা (Collar) পরাইয়া দেওয়া হয়। উহাও তারকাঁটার দ্বারা শেষ পাখির সঙ্গে আঁটা।

বাতাসা
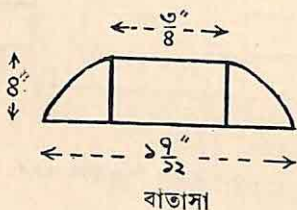
সংযোজক খণ্ডসহ হাতলটি ধুরার দীর্ঘ প্রান্তে পরান। এইটি ধুরার সহিত আঁট করিয়া লাগান এবং খিল দ্বারা দৃঢ় করা। খিল খুলিয়া সংযোজকসহ হাতল পৃথক্ করা যায়।

ধুরা, পাখি, বাতাসা ও হাতল সহ সরঞ্জামই চাকা। উহাই দুই

পাওটের উপর পরান। চাকা বসান হইলে উহার পাখির প্রান্তে হেরফের করিয়া সরু দড়ি চিত্রের অনুরূপ বাঁধিয়া লওয়া হয়।
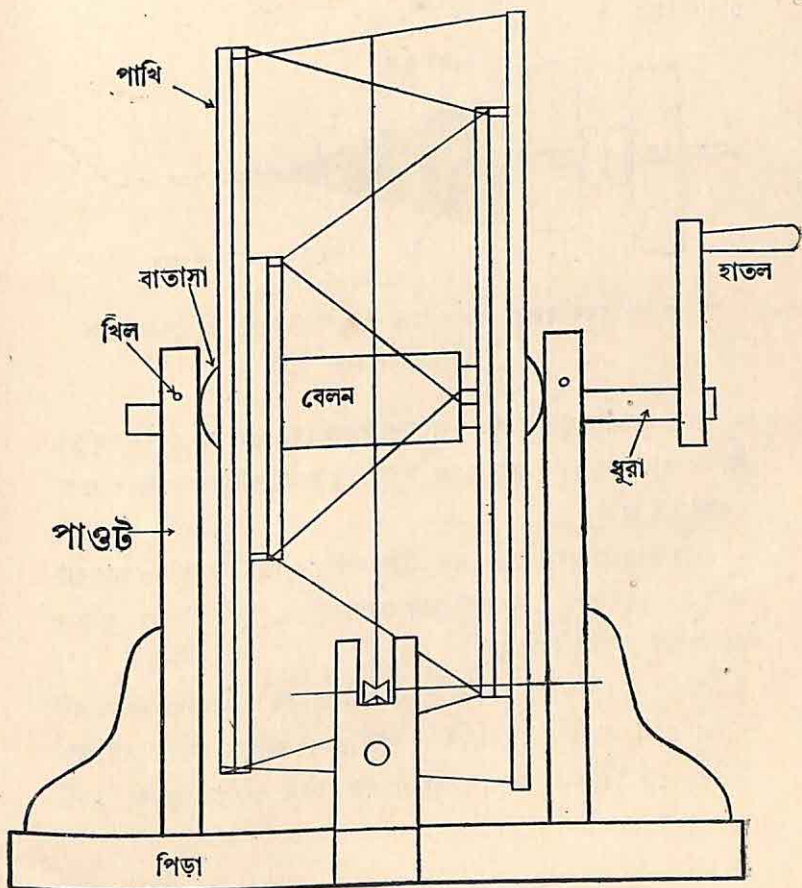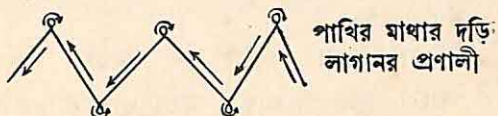
সম্মুখ দিক হইতে চরকার দৃশ্য

টেকোটি ছাতার শালকা অথবা ইস্পাতের তারের তৈরী, লম্বায় ৭ ইঞ্চি। একপ্রান্তে সূচাগ্র। ঐ প্রান্ত হইতে ৪" ইঞ্চি দূরে একটি কাঠের পুলি পরান।

ঢাল—সূতা কাটিবার সময় টেকোতে একটি ঢালের মত চাকৃতি পরাইয়া লওয়া আবশ্যক। নচেৎ সূতা উপযুক্ত ভাবে জড়ান যায় না। একটি চাকৃতি তুই দিকে সূতা জড়াইয়া টেকোর সহিত দৃঢ় করিয়া কাজ চালান যায়।
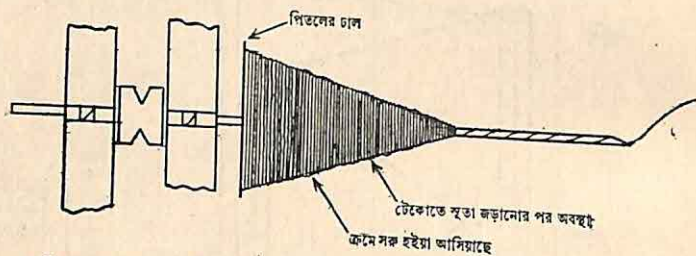
পুলি ও ঢাল সমেত টেকোর দৃশ্য—ডালের বড়ির আকারে সূতা জড়াইবার পদ্ধতি দেখানো হইতেছে

সূতা জড়াইবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন জড়ান ডালের বড়ির আকার ধারণ করে। লম্বা ভাবে যেমন তেমন করিয়া জড়াইলে সূতা তোলা যায় না।

তক্‌লি খুব সম্ভবত প্রাচীনতম সূতা কাটিবার যন্ত্র। তকৃলিও ভারতীয় প্রতিভার অপূর্ব দান। তকৃলির সঙ্গে চরকার তুলনা মূলক বিচার করিলে চরকার গুণ সুপরিস্ফুট হইবে।

অঙ্গুলি দ্বারা তকৃলিকে গতি সম্পন্ন করিতে হয়। তকৃলির গতি বন্ধ করিয়া সূতা গুটাইতে হয়, ফলে বহু সময় ক্ষেপণ করিতে হয়। তকৃলিকে নির্দ্দিষ্ট পথে চালনার অভ্যাস সময়সাপেক্ষ কিন্তু চরকার টেকো একটি

নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া ঘুরিতে থাকে। চরকার টেকোকে আঙ্গুল দ্বারা গতি সম্পন্ন করিতে হয় না। চরকার চক্র ঘুরাইলেই টেকো আপনা হইতে ক্রিয়াশীল হয়। তক্‌লিকে গতিবিশিষ্ট করিবার জন্য যে শক্তি প্রয়োজন, তাহা অঙ্গুলির সাহায্যে সংঘটিত হয়। কিন্তু চরকার ঘূর্ণায়মান চক্রটিই টেকোকে গতিসম্পন্ন করে। হস্তচালিত-শক্তি দ্বারা চক্রের গতি উৎপাদন, নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দিষ্ট পথে টেকোর গতি এই তিনের সমন্বয়ে চরকা চালিত
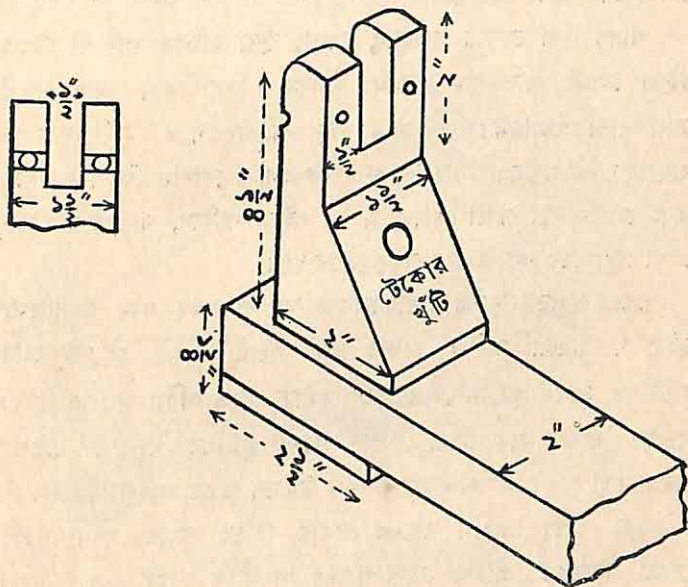
টেকোর খুঁটির দৃশ্য

হয়। আধুনিক সূতা কাটা কলের সঙ্গে চরকার পার্থক্য এই যে চরকা মনুষ্য শক্তি দ্বারা চালিত হয়। কাজেই চরকাকে মনুষ্য চালিত একটি সুপ্রাচীন কল বলা অসঙ্গত নয়—যেমন সেলাইয়ের কল।

এখন বুঝা কঠিন নয় যে টেকোর ব্যাস এক রাখিয়া আমরা চক্রের

ব্যাস যত বড় করিব, টেকো ও সেই পরিমাণে অধিক গতিবিশিষ্ট হইবে। টেকোর গতি যত বাড়িবে, সূতা কাটার গতিও তত বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু দেখিতে হইবে কত বড় •চক্র একজনের পক্ষে সহজে চালনা করা সম্ভব। আবার টেকোর জন্য সূক্ষ্মতর লৌহ শলাকা ব্যবহার করিলেও টেকোর গতিমাত্রা বাড়িতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এই, কত সূক্ষ্ম লৌহ শলাকা টেকোরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আসল কথা চরকার ব্যবহারে, চরকায় সূতা কাটিতে পারদর্শী হইতে হইলে চরকার প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচয় ও ক্রিয়াশীলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই জ্ঞান ছাড়া কাটুনির পক্ষে নির্বিবাদে চরকা ব্যবহার করাই কঠিন। কারণ চরকা নামক কলটির কোথাও কিছু বিগড়াইলে এবং চালক স্বয়ং তাহা শোধরাইয়া না লইতে পারিলে, বারবার চালককে চরকা মেরামতের জন্য অপরের দ্বারস্থ হইতে হয়।

দেশের পুরাতন বিভিন্ন জাতীয় চরকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন অনুসন্ধিৎসু হইয়া পলের্যাচনা করিলে চরকার গঠন সম্বন্ধে আপনা হইতেই জ্ঞান গভীরতর হয়। প্রাচীন ধরনের চরকা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক চরকা সমূহের বিবর্ত্তন পর্যালোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি এই দেশের জনপ্রতিভা কত ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে চরকার উন্নতির প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

এই দেশের প্রাচীন ধরনের চরকার বিভিন্ন অংশের বর্ণনা পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন চরকা গঠনের মূল নীতি সর্বত্রই একরূপ ছিল। বিভিন্ন ধরনের চরকার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে চরকার বিভিন্ন অংশের নাম, মাপ ও ইহাদের কার্যকরিতার সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে। এখানে চরকার বিভিন্ন অংশের পরিচয় জ্ঞাপক নাম উল্লেখ করা যাইতেছে।

(ক) চক্র ও চক্রের ব্যাস (খ) অক্ষ (গ) টকোর স্ট্যাণ্ড(ঘ) চক্রে

ও টেকোর মধ্যে দূরত্ব। (ঙ) টেকো বাহক (চ) টেকোর অবস্থান (ছ) টেকোর মাপ, দৈর্ঘ্য ও পরিধি (জ) কোন্ জাতীয় লোহায় টেকো নির্মিত (ঝ) টেকোর গতি।

কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য প্রাচীন চরকা ও ইহাদের বিশেষত্ব
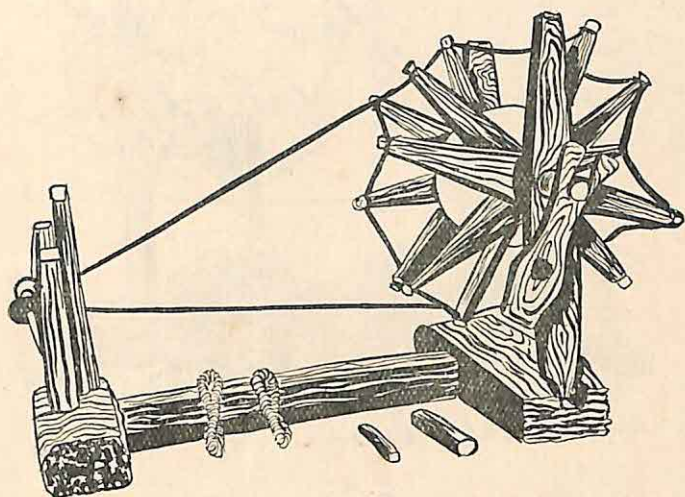
বিহারের মধুবনী নামক স্থানে চলিত চরকা

(১) চরকার নাম শুধু "চরকা"। ইহা বিহার প্রদেশের মধুবনী নামক স্থানে চলিত ছিল। চক্র ব্যাস: ১৭" ইঞ্চি। ইহার কাঠের বেলুনের দৈর্ঘ্য: ৯" ইঞ্চি। বেলন ও টেকোর দূরত্ব: ২৪" ইঞ্চি। টেকোর বাহক: নারিকেল ছোবড়ার রশি। টেকোর অবস্থিতি: ভূমির সমান্তরাল। টেকোর মাপ: ১২"×১৮"। টেকোর লোহা: কাঁচা। টেকোর গতি: ৫০ মাত্র।

বিশেষত্ব: এই চরকার বিশেষত্ব এই যে বেলনের স্থানে একটি বৃহৎ ও

ভারী গোল পাথর বসান হয়, ইহা ভরবেগ (momentum) বাড়াইবার জন্য করা হইত, সন্দেহ নাই।
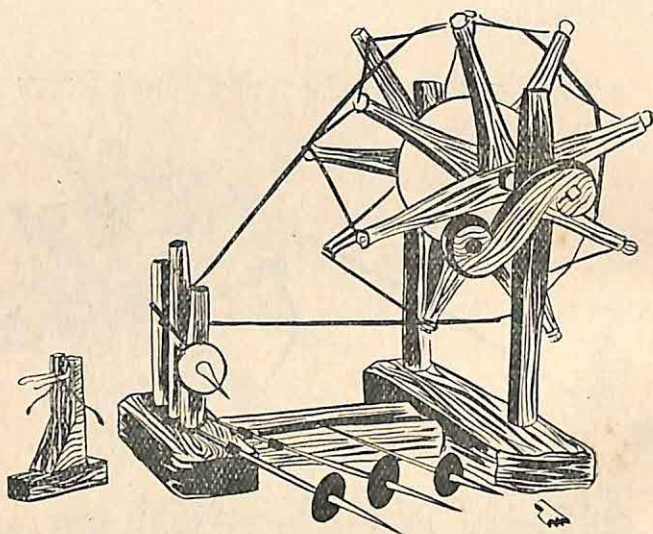
ত্রিপুরা জিলায় চলিত চরকা, ইহা আধুনিক টেকোবাহক রিলিফ চরকার মতো

(২) চরকা; স্থান: কুমিল্লা, ত্রিপুরা। ব্যাস চক্র: ১৭" ইঞ্চি। বেলন: কাঠের। বেলনের মাপ: ৯" ইঞ্চি। দূরত্ব: ১৩"। টেকো বাহক: বেতের। টেকোর অবস্থিতি: ২° ডিগ্রী। টেকোর মাপ: ১৪" ইঞ্চি। টেকোর লোহা: কাঁচা। টেকোর গতি: ৬০।

বিশেষত্ব:—প্রতিবেশী বিহারের চরকার ন্যায় একটি গোল খোদাই করা (পাথরের স্থলে) কাঠের বল বেলনে লাগান আছে। তাছাড়া টেকো সমান্তরাল না রাখিয়া সম্মুখ ভাগে একটু নামানো। সেইজন্য সূতা সহজে ও ঘন ঘন স্থানচ্যুত হইতে পারে না।

(৩) চরকা :—স্থান : কুট্টারাম, কেরল। চক্রব্যাস : ১২″ ইঞ্চি। অক্ষ : কাঠের। বেলন : ২½″ ইঞ্চি। দূরত্ব : ২০″ ইঞ্চি। টেকোর বাহক :
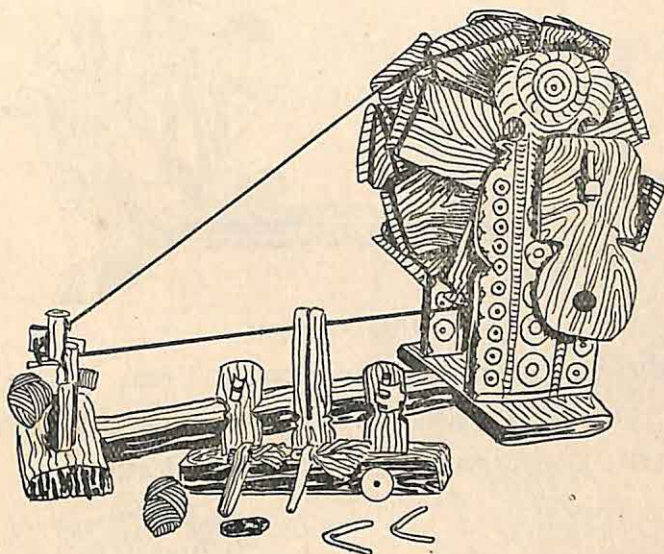
চরকা-স্থান : কুট্টারম, কেরল

বাঁশের কঞ্চিতে নারিকেল ছোবড়ার রশি। টেকোর অবস্থিতি : ১৫° ডিগ্রি : টেকোর মাপ : ১২ ″ ইঞ্চি। টেকোর লোহা : কাঁচা। গতি : ৪০।

বিশেষত্ব : ইহাতে দেখা যায় যে চক্রফালির সংযোগের জন্য স্থানীয় কোন লতা ব্যবহৃত হয়।

(৪) সাওলী চরকা :—স্থান : মহারাষ্ট্র, মূল, চান্দা জিলা ; চক্রব্যাস : ১৫″ ইঞ্চি। বেলন : কাঠের। বেলনের মাপ : ৮½″ ইঞ্চি। দূরত্ব : ২৭″

ইঞ্চি। টেকো বাহক : নারিকেল ছোবড়ার রশি। টেকোর অবস্থিতি : ৪৫
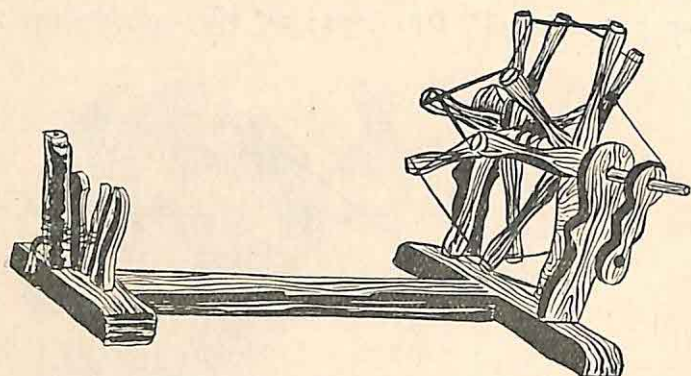
সাওলী চরকা, মহারাষ্ট্র

ডিগ্রি। টেকোর মাপ : ৯″ × ৩/৪″ ইঞ্চি। টেকো লোহা : কাঁচা। গতি : ৫০।

বিশেষত্ব :—কার্পাসশিল্পের ইতিহাসে একটি প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য চরকা। সাওলী চরকায় টেকোর অবস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
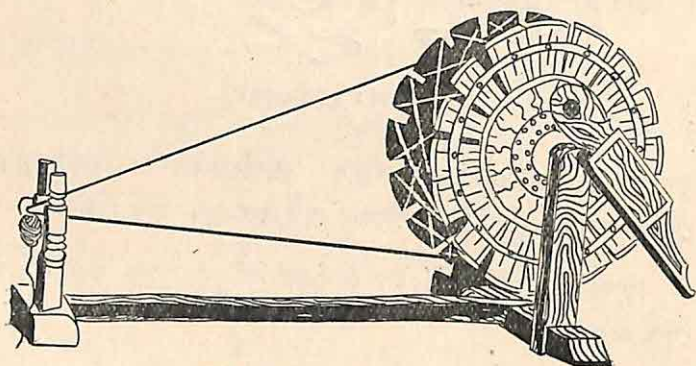
পুরানী গুড্ডি, স্থান—জয়পুর, রাজস্থান

(৫) পুরানী গুড্ডি :— স্থান : গোবিন্দগাদ, জয়পুর রাজ্য, রাজস্থান।

চক্রব্যাস : ১৬" ইঞ্চি। বেলন : লোহা। বেলনের মাপ : ৩½" ইঞ্চি। দূরত্ব : ৩০" ইঞ্চি। টেকো বাহক : চামড়া। টেকোর অবস্থিতি : সমান্তরাল। টেকোর মাপ : ১০" ইঞ্চি। টেকোর লোহা : কাঁচা। গতি : পুরাতন চরকায় ৫০, নূতন চরকায় : ৭০।

মন্তব্য—উক্ত চরকায় পূর্বে ¼" ইঞ্চি মোটা টেকো ছিল। সেইজন্য গতি মাত্র ৫০ ছিল, পরে ১⁄৬" ইঞ্চি টেকো ব্যবহার করায় গতি ৭০ হইয়াছে।
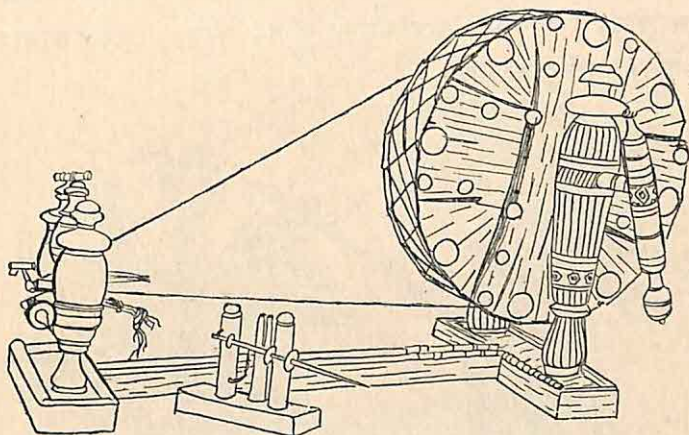
পুরানীগুড্ডি—পাঞ্জাব। কাঁচা লোহার টেকোর জন্য বড় ষ্ট্যাণ্ড ও পাকা লোহার টেকোর জন্য ছোট ষ্ট্যাণ্ড ব্যবহৃত হইত

(৬) পুরানীগুড্ডি : স্থান :—পাঞ্জাব, আদামপুর দোয়ারা, জিলা : জলন্দর। চক্রব্যাস : ১৮" ইঞ্চি। বেলন : কাঠের। বেলনের মাপ : ৪½" ইঞ্চি। দূরত্ব : ২৮" ইঞ্চি। টেকোবাহক : মুঞ্জঘাস। টেকোর অবস্থিতি : সমান্তরাল। টেকোর মাপ : পুরানো চরকায় ১৭"×½" ইঞ্চি। পরিবর্তিত চরকায় : ১০"×⅛" ইঞ্চি। টেকোর লোহা : পুরাতন চরকায় কাঁচা লোহা, নূতন চরকায় পাকা লোহা। গতি—পুরাতনে : ৩৬, নূতনে : ৭০।

মন্তব্য—সাধারণতঃ প্রাচীন চরকা মাত্রেই কাঁচা লোহার টেকো ব্যবহার করা হইত। ইহার পরিবর্তে পাকা লোহার সরু টেকো ব্যবহার করায় টেকোর তথা স্তা কাটার গতি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৭) চরকা।—স্থান : তিরুপুর, তামিলনাদ, দাক্ষিণাত্য। চক্রব্যাস : ১৪½" ইঞ্চি। বেলন : কাঠের। বেলনের মাপ : লোহার ২¾" ইঞ্চি। দূরত্ব : ১৯" ইঞ্চি। টেকোবাহক : বাঁশে ও চামড়ায় তৈরী। টেকোর অবস্থিতি : সমান্তরাল। টেকোর মাপ : ৯" × ¼" ইঞ্চি। টেকোর লোহা : পাকা। গতি : ৪০ মাত্র।
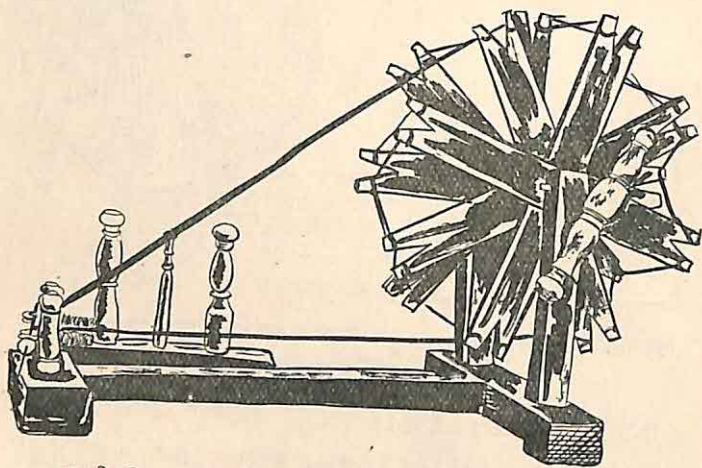
পুরানীগুড্ডি—মীরাট, গান্ধীআশ্রম। কাঁচা লোহার টেকোর জন্য বড় ষ্ট্যাণ্ড ও পাকা লোহার টেকোর জন্য ছোট ষ্ট্যাণ্ড ব্যবহৃত হইত

(৮) পুরানীগুড্ডি।—স্থান : মীরাট, গান্ধী আশ্রম, উত্তর প্রদেশ। চক্রব্যাস : ২০" ইঞ্চি। বেলন : লোহার। বেলনের মাপ : ৪" ইঞ্চি।

দূরত্ব ঃ ২৬″ ইঞ্চি। টেকোবাহক ঃ মুঞ্জঘাস। টেকোর অবস্থিতি ঃ পুরাতন প্রথায় সমান্তরাল, নূতন প্রথায় ৫৫° ডিগ্রী। টেকোর মাপ ঃ পুরাতন ঃ ৯$\frac{১}{২}$″ × $\frac{৩}{১৬}$″ নূতন ঃ ৮$\frac{১}{৪}$″ × $\frac{৩}{১৬}$″ ইঞ্চি। টেকোর লোহা ঃ কাঁচা। গতি ঃ ৭০।

মন্তব্য ঃ পুরাতন চরকায় টেকোর অবস্থান যেরূপ ছিল, নূতন চরকায় ইহা বদলানো হইয়াছে। সেই সঙ্গে টেকোর ধারকেরও রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে।
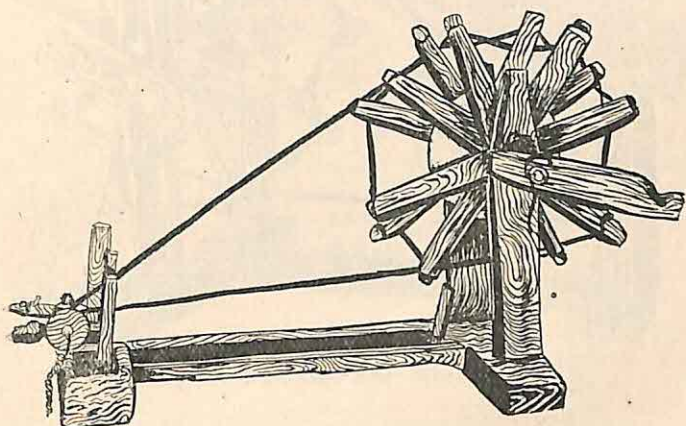
চরকা—উৎকল

(৯) চরকা। স্থান ঃ উৎকল। এই চরকার বিশেষত্ব এই যে অতিরিক্ত ভার বেলনে যোগ করিয়া চক্রের গতি বাড়াইবার জন্য ভারী পাথর হাতে গোল করিয়া বসানো হইয়াছে। এই পাথরের ওজন আন্দাজ ২২ সের। একসময়ে এই জাতীয় চরকার বহুল প্রচার ছিল এবং মাত্র ১৲ টাকায় ইহা বিক্রি হইত।

(১০) বাস্‌নাকা চরকা। স্থান : মূল জিলা, চান্দা, মহারাষ্ট্র। চক্রব্যাস : ১৭" ইঞ্চি। বেলনের মাপ : ৯½" ইঞ্চি। দূরত্ব : ১২" ইঞ্চি। টেকো বাহক : কঞ্চি বাঁশের মধ্যে নারিকেল রশি। টেকোর অবস্থিতি : সমান্তরাল। টেকোর মাপ : ১৩"×⅜" ইঞ্চি। টেকোর লোহা : কাঁচা।
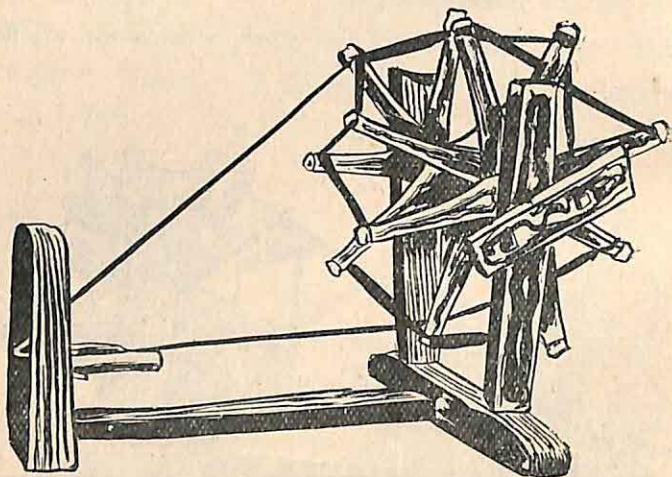
বাস্‌নাকা চরকা ; স্থান—মূল, চান্দা, মহারাষ্ট্র

এই চরকা পূর্বে মাত্র ।৹ আনায় বিকাইত।

(১১) চরকা। স্থান : মধুবনী, বিহার। চক্রব্যাস : ১৬ ইঞ্চি। বেলন : লোহার। বেলনের মাপ : ৩ ইঞ্চি। দূরত্ব : ২১ ইঞ্চি। টেকো বাহক : মুঞ্জঘাস। টেকোর অবস্থিতি : সমান্তরাল। টেকোর মাপ : ১০"×⅝" ইঞ্চি। টেকোর লোহা : কাঁচা। গতি : ৯০।

এই চরকা পূর্বে ৮৹ আনায় বিক্রি হইত।

(১২) পুরাতন কেরল চরকা। স্থান : কেরল। চক্রব্যাস : ১৫ ইঞ্চি। বেলন : লোহার। বেলনের মাপ : ৮$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। দূরত্ব ২১ : ইঞ্চি। টেকো-বাহক : পালম্যারা কাঠ। টেকোর লোহা : কাঁচা। গতি : ৫০।

মন্তব্য :—স্থানীয় কাঠ টেকোবাহকরূপে ব্যবহৃত হইত।
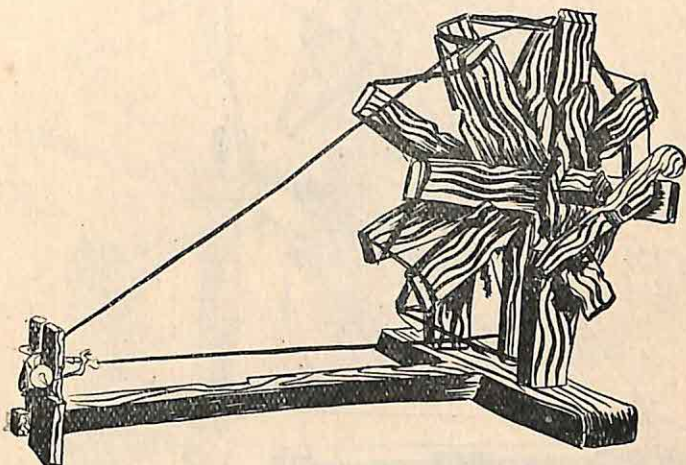
পুরাতন কেরল চরকা

(১৩) চরকা।—স্থান : কারুয়ালাতি, হুবলী, ধারওয়ার। চক্রব্যাস : ২১ ইঞ্চি। বেলন : লোহার। বেলনের মাপ : ১$\frac{৫}{২}$ ইঞ্চি। দূরত্ব : ২৪ ইঞ্চি। টেকোবাহক : কাঠ। টেকোর অবস্থিতি : সমান্তরাল। টেকোর মাপ : ৮ ইঞ্চি। টেকোর লোহা : পাকা। গতি : ৭০।

মন্তব্য :—এই চরকার টেকোতে পুলী (pully) ব্যবহৃত হইয়াছে। ফলে চক্রের বেলনের মাপও অন্য সকল চরকা অপেক্ষা কম।

(১৪) পট্টুশালী চরকা।—স্থান : অন্ধ্র, চিকাকোল, ভিজাগাপত্তম। চক্রব্যাস : ১৩ ইঞ্চি। বেলন : লোহার। বেলনের মাপ : ৩ ইঞ্চি। দূরত্ব :
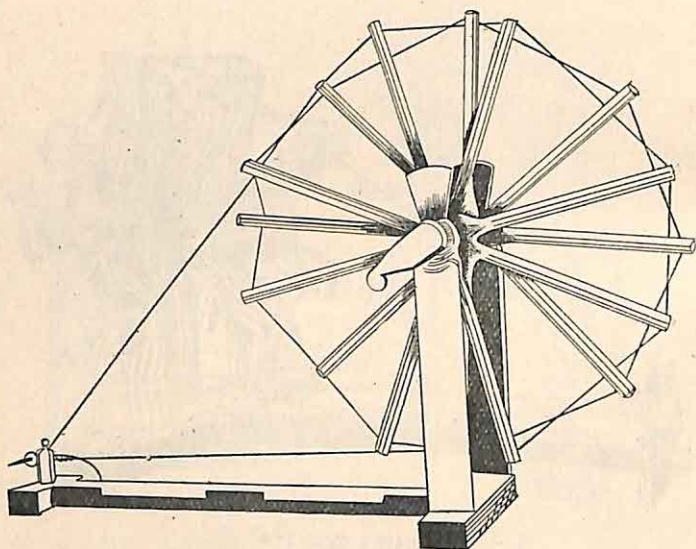
পট্টুশালী চরকা ; স্থান—অন্ধ্র, চিকাকোল, ভিজাগাপত্তম

৩৬ ইঞ্চি। টেকোবাহক : রশি। টেকোর অবস্থিতি : ১০ ডিগ্রি। টেকোর মাপ : ৫½ ইঞ্চি। টেকোর লোহা : পাকা। গতি : ১৬০।

বিশেষত্ব : গতির জন্য ইহা বিখ্যাত।

(১৫) মেটপল্লী।—স্থান: মূল, চান্দা, মহারাষ্ট্র। চক্রব্যাস: ১৭" ইঞ্চি। বেলন: কাঠের। বেলনের মাপ: ৭½" ইঞ্চি। দূরত্ব: ২৪ ইঞ্চি।
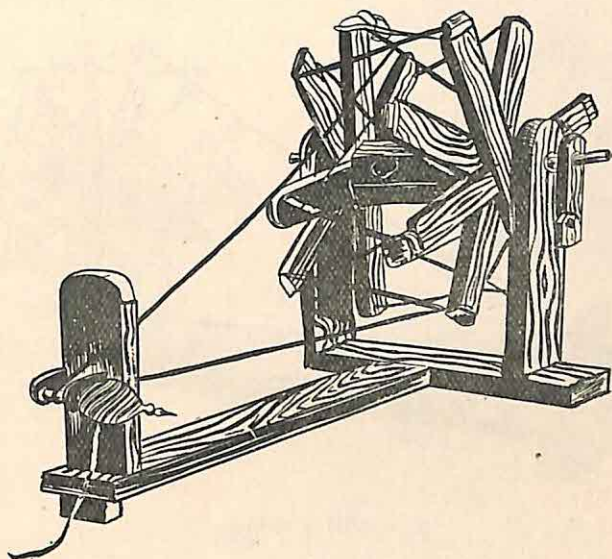
মেটপল্লী চরকা ; স্থান—মুল, চান্দা, মহারাষ্ট্র

টেকোবাহক: মক্কা, কাঠ। টেকোর অবস্থান: সমান্তরাল। টেকোর মাপ: ১০×⅜ ইঞ্চি। টেকোর লোহা: কাঁচা। গতি: ৭০।

(১৬) বারদোলী চরকা।—চক্রব্যাস: ২৪ ইঞ্চি। বেলন: লোহার। বেলনের মাপ: ৮ ইঞ্চি। দূরত্ব: ৩৭ ইঞ্চি। চক্রবাহক: চামড়া। টেকোর

অবস্থিতি ঃ সমান্তরাল। টেকোর মাপ ঃ ৯" (পুলি সহিত) ৩/৮ ইঞ্চি। গতি ঃ ১০০।
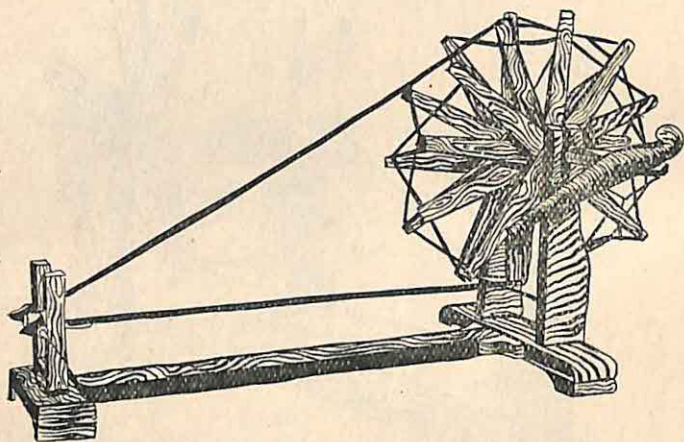
বারদৌলী চরকা

এই চরকায় লপেটাও বেলনে বসাইয়া সূতা গুটাইবার ব্যবস্থা আছে। মূল্য ৩৷৹ টাকা। এই চরকার ব্যবহার এখনও স্থানে স্থানে আছে।

(১৭) গতি চক্রওয়ালা চরকা। স্থান ঃ শ্রীমদন খাদিকুটির, কারলী। শেযোক্ত ১৬ ও ১৭ নং চরকাগুলি বর্তমান খাদি আন্দোলনের সময়ে তৈরী হইয়াছিল।

১-১৫ পর্য্যন্ত উপরে বর্ণিত চরকাগুলির কার্যকারিতা বিশেষভাবে জানিবার বিষয়। এই প্রাচীন চরকাগুলির খুঁটিনাটি পরীক্ষা করিয়াই সুচিন্তিত প্ল্যানে হালফ্যাসনে বারদৌলী চরকা নির্মিত হইয়া ছিল।*
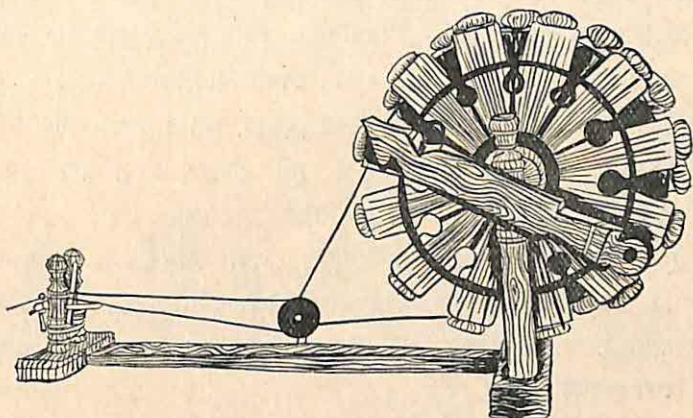
গতিচক্রওয়ালা চরকা ; স্থান—শ্রীমদন খাদিকুটির, কারলী

টেকো ও মালবাহক

প্রাচীন কালে পাকা লোহার টেকো তৈরী হইত না। কাঁচা লোহা ব্যবহার করিতে সকলেই বাধ্য হইত। ফলে কাঁচা লোহার টেকোর বেড় স্বভাবতঃই পাকা লোহার বেড় অপেক্ষা বেশী হইত। ফলে টেকোর গতিও কম হইত। মাল সাধারণতঃ সূতার দ্বারাই প্রস্তুত হইত এবং এখনও হইয়া

* বাংলা ভাষায় চরকা ও চরখা দুইটি শব্দই প্রচলিত কিন্তু বহুপ্রচলিত 'চরকা' শব্দটিই আমরা ব্যবহার করিয়াছি। উদ্ধৃতি করার সময়ে 'চরখা' শব্দটিও ব্যবহৃত হইয়াছে।

থাকে। টেকোর সহিত ইহার সংঘর্ষ হওয়ায় অতি সহজেই মাল নষ্ট হইত। সেইজন্য প্রাচীন চরকার টেকোতে মাল বসিবার স্থানে নেকড়া, তূলা, সূতা, জড়ানো হইত। ফলে টেকোর বেড় মালের স্থানে বাড়িয়া যাইত এবং গতিও কমিয়া যাইত। পুলী বা গিরি ব্যবহার আধুনিক। পুলী-তৈয়ারীর জন্য কুঁদের (lathe) প্রয়োজন। ইহার সাধারণ গৃহস্থ কাটুনির পক্ষে ব্যবহার করা তখনও সম্ভব ছিল না। সেজন্য ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক যে প্রাচীন কালে পুলীর স্থান অধিকার করিত নেকড়া, তূলা ও সূতা। পুরাতন যে চরকায় পাকা লোহার টেকো ও পুলী ব্যবহার করিয়া গতি কত বাড়ানো গিয়াছে, জয়পুর রাজ্যের পুরানীগুড্ডি ইহার চরম দৃষ্টান্ত। প্রাচীন পুরানীগুড্ডিতে ১/২" ব্যাসের কাঁচা লোহার টেকো ব্যবহৃত হইত। তখন গতি ছিল মাত্র ৩৬, পরে একই জাতীয় চরকায় পাকা লোহার ৩/৮ ইঞ্চি ব্যাসের টেকো ব্যবহার করায় গতি ৭০ পর্যন্ত দাড়াইয়াছে অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

চক্রব্যাস

১-১৫ পর্যন্ত চরকাগুলিতে চক্রব্যাস ১২ ইঞ্চি হইতে ৩১ ইঞ্চি পর্যন্ত এবং গতির তারতম্য ৪০ হইতে ১৬০ পর্যন্ত পাওয়া যায়। চক্র যত বড় হইবে ততই ইহা চালানো শক্তিসাপেক্ষ, স্থানও তত বেশী লাগিবে, স্থানান্তরে বহন করিয়া লওয়াও তত কঠিন। গতি পাইবার নিয়ম যথা :—

$\frac{\text{চক্রব্যাস}}{\text{টেকোর ব্যাস}}$ অনুযায়ী চক্রের ব্যাস বড় করিলেই যে শুধু গতি বৃদ্ধি পাইবে এমন নয় সঙ্গে সঙ্গে টেকোর ব্যাস ও দেখিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ৩ নং ও ৭ নং চরকা ধরা যায়। ৩ নম্বরের ব্যাস ১২ ইঞ্চি, গতি মাত্র ৪০, ৭ নম্বরের ব্যাস ১৪১/২ ইঞ্চি কিন্তু গতি একই অর্থাৎ ৪০।

টেকোর দূরত্ব

অক্ষ হইতে টেকোর দূরত্বও বিশেষভাবে জানিবার বিষয়। কারণ মান অনুযায়ী এতদুভয়ের ব্যবধান ঠিক না থাকিলে অর্থাৎ কম হইলে টেকোর সমগতি পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ মাল পিছলাইয়া যাইবার কারণ হয়। ইহাতে স্বাভাবিক গতিও কমিয়া যায়, সূতা কাটিতে বিড়ম্বনা বা বেগ পাইতে হয়।

টেকোর ষ্ট্যাণ্ড
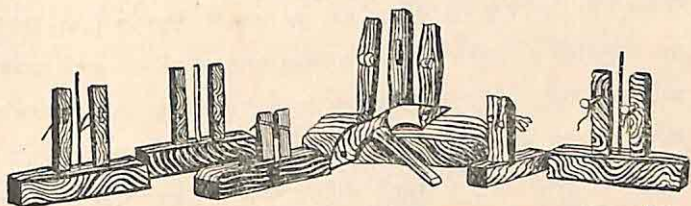
বাম হইতে দক্ষিণে—(ক) প্রাচীন চরকায় সর্বশেষ ধাপে ব্যবহৃত টেকোর ষ্ট্যাণ্ড, (খ) (পশ্চাতে) অন্য একটি নমুনা, (গ) প্রাচীন চরকার টেকোর ষ্ট্যাণ্ড কোন দেওয়া হইয়াছে, (ঘ) (সম্মুখে)—প্রাচীন চরকায় ব্যবহৃত, (ঙ) (পশ্চাতে)—প্রাচীন চরকার মামুলী ষ্ট্যাণ্ড, (চ) পুলিযুক্ত টেকো ব্যবহার করিবার ষ্ট্যাণ্ড, (ছ) এই ষ্ট্যাণ্ডে টেকোকে ধরিয়া রাখিবার জন্য তাঁত (gut) ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীন চরকায় কাঁচা লোহার টেকো লম্বায় ১৪″ ইঞ্চি পর্যন্ত ব্যবহার হইত। সেই জন্য লম্বা টেকোর ষ্ট্যাণ্ডও বড় করিয়া তৈরী হইত। একটি কাষ্ঠ খণ্ডে দুইটি খাড়া কাঠ খাঁজ করিয়া বসানো হইত। ইহাতে টেকোকে ধারণ করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত। কোন কোন চরকায় নির্দিষ্ট পথে মাল চালনা করিবার জন্য দুইটি খুঁটির মাঝখানে আরও একটি মাল নিমায়ক খুঁটি বসানো হইত। পরবর্তীকালে এই তৃতীয় খুঁটির বদলে মোটা তারও ব্যবহৃত হইয়াছে। পাকা লোহার রুস টেকোর সুবিধা দেখিয়া ইহার চলন বৃদ্ধির সঙ্গে টেকোর ষ্ট্যাণ্ডের আকারেরও বিরাট

পরিবর্তন হইয়াছে। (আধুনিক চরকা দ্রষ্টব্য)। আধুনিক ষ্ট্যাণ্ডের তুলনায় প্রাচীন চরকায় টেকো-ষ্ট্যাণ্ড কত বড়োই না ছিল। ইহার কারণও পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে প্রাচীন চরকাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় চক্রব্যাসের পটুশালী চরকার টেকোই মাত্র ৫ ইঞ্চি লম্বা, ইহার চাকার অনুপাতে ষ্ট্যাণ্ডটিও ছোট। দক্ষিণাত্যের বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ভিজাগাপত্তন ও অন্ধ্রদেশের সূতা কাটুনিরা যে কেবল স্থানীয় কার্পাসের গুণে মিহি সূতাই কাটিতেন এমন নহে। অভিজ্ঞতার দ্বারা চরকার গতিবৃদ্ধি কি করিয়া করিতে হয়, সে বিষয়েও তাহাদের চিন্তা বাস্তব রূপ পাইয়াছিল। বিভিন্ন জাতীয় কার্পাসের মধ্যে তারতম্য হেতু আমরা জানি যে, সকল কার্পাসে উচ্চ নম্বরের সূতা কাটা যায় না। ভারতীয় কার্পাসের মধ্যে কন্দাপতি কার্পাসে ১০০ নম্বরের সূতা চরকায় কাটা যায়। স্বভাব-দত্ত উৎকৃষ্ট কার্পাস শিল্পপটু কাটুনীকে চরকা উন্নত করিবার প্রেরণা যোগাইয়াছিল এরূপ অনুমান করা অসংগত নহে।

টেকো ধারক

টেকো যাহাতে বসিয়া ঘুরিতে পারে তাহাই টেকো-ধারক। যে বস্তুর দ্বারাই গঠিত হউক বা কেন, অনবরত গতিশীল টেকোর সংঘর্ষণে ইহা শীঘ্রই ক্ষয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যাইবার কথা; দ্বিতীয়তঃ ঘর্ষণ স্থানের আকার যত বড় হইবে, ঘর্ষণ ও তত বেশী হইবে; ফলে টেকোর গতিও কমিয়া যাইবে এবং ঘর্ষণের স্থানগুলি শীঘ্রই ক্ষঃয়প্রাপ্ত হইবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রাচীনকালের কাটুনিগণ যে বিশেষ চিন্তা করিত তাহা বিভিন্ন বস্তুর দ্বারা বাহক নির্মাণের প্রচেষ্টা হইতে বুঝা যাইবে। কাঠ, বাঁশ, বেত, নারিকেল রশি, মক্কা, ঘাস, নারিকেল পত্র প্রভৃতি স্বভাবজাত বহু জিনিষই ধারক রূপে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন চরকায় ব্যবহৃত হইত। উক্ত ধারকের সর্বশেষ বিবর্তনের

ফল এই যে অধুনা কার্পাস সূতায়ই ইহা বেশী প্রস্তুত হয়। ইহার ব্যবহারের প্রণালীও সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বেত (যথা বাংলা চরকায়), নারিকেল রশি ও (অধিকাংশ পুরানো চরকায়) মুঞ্জ ঘাসের রশি সাধারণতঃ টেকোকে ঘিরিয়া ধারণ করিত। এখন ঠিক তার উল্টা, টেকোর জন্য ষ্ট্যাণ্ডে খাঁজ থাকে, সেই খাঁজে এই সূতার ধারক পরাইয়া দেওয়া হয় আর ইহার গায়ের উপর টেকো ঘোরে। সূতার ধারক টেকোর সংঘর্ষণে সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া কাটিয়া না যায়, সেই জন্য ইহা উঠানামা করিয়া স্থান পরিবর্তনের ব্যবস্থা আধুনিক চরকায় আছে। পাকানো সূতা বলিয়া উহা যেমন সহজে তৈল গ্রহণ করে, তেমনটি কাঠ, বেত, নারিকেল রশি ইত্যাদি গ্রহণ করে না।

টেকোর অবস্থিতি

প্রাচীন চরকামাত্রেই টেকো ভূমি ও অক্ষের সমান্তরাল ভাবে বসাইবার প্রথা ছিল বলিয়া মনে হয়। কোণ করিয়া সামনের দিকে টেকোর মাথা নত করিয়া টেকো বসাইবার প্রথা বর্তমান চরকার আন্দোলনের পূর্বে বর্তমান ছিল কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। চরকা আন্দোলনের সময় প্রাচীন চরকার কোন কোনটাতে কোণ করিয়া টেকো বসানো হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। একথা ঠিক যে, কিছুক্ষণ সূতা কাটিলে পর গুটানো সূতায় টেকো ভরিয়া আসিলে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয় যে সূতা সহজেই ফসকাইয়া যায়, সূতা কাটা কঠিন হয়। ইহা এড়াইবার জন্য অর্থাৎ গুটানো সূতা যাহাতে ফসকাইয়া না যায়, সেইজন্য টেকো কোণ করিয়া বসানো হয়। প্রাচীন চরকাগুলির মধ্যে পট্টুশালী চরকাকে একটি আদর্শ চরকা বলা যাইতে পারে। ইহাতে মধ্যপথ অবলম্বন করা হইয়াছে অর্থাৎ মাত্র ১০ ডিগ্রী কোণ দেওয়া হইয়াছে। পরে আধুনিক চরকার বিবরণীতে আমরা দেখিতে পাইব যে তদ্রূপ কোণ, আধুনিক বহু চরকাতেই দেওয়া হইয়াছে।

পুট্টুশালী চরকায় কোণযুক্ত টেকোর অবস্থিতি যদি প্রাচীন প্রথাই হইয়া থাকে তবে তাহাও অতীত কালের চরকা পরিকল্পনাকারীদের কর্মকুশলতার পরিচয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

খাদি আন্দোলন ও চরকার বিবর্ত্তন

হাতে সূতাকাটার প্রথাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন মহাত্মা গান্ধী। যখন অল্পাধিক সকল শিল্পক্ষেত্রে মেসিন বা কল স্বীয় অধিকার স্থায়ী করিয়াছে, সাধারণের সহজ সৃজনী শক্তির পথকে দুরূহ করিয়া বৈজ্ঞানিক বিশেষের কাজে পরিনত হইয়াছে, তখন চরকার পুনরভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছে মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় বিরাট পুরুষকে অবলম্বন করিয়া ও ইহার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির গুণে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সত্য সংকল্প কর্মীগণ খাদির আদর্শকে গ্রহণ করিয়া বর্তমান কালের চরকা ও অন্যান্য কার্পাসশিল্পের সরঞ্জামাদির যে উন্নয়ন সাধন করিয়াছেন তাহা আমরা আধুনিক চরকা সমূহের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারিব।

বিবর্তনের সূচনা ও বারদৌলী চরকা

চরকা জাগৃতির প্রথম যুগে প্রাচীন চরকাই ছিল নূতন চরকার আদর্শ। আদর্শ প্রাচীন চরকার অনুকরণেই নূতন চরকা তৈরী হইত। নূতন চরকা তৈরী করিতে গিয়া প্রতি চরকা কেন্দ্রেই অল্পবিস্তর পরিবর্তন যে যতটুক পারিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন তাহা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন চরকা সমূহের গুণাগুণ ও খুঁটিনাটি পরীয়া করিক্ষা প্ল্যান করিয়া এযুগে প্রথম যে চরকার উদ্ভব হয় তাহাই বারদৌলী চরকা বলিয়া খ্যাত। প্রাচীন চরকার সকল মৌলিক আকারই ইহাতে বিদ্যমান। যথা—(১) চক্রটি খাড়া—গোরুর গাড়ীর চরকার মত (২) টেকো সমান্তরাল, ইহার

গতি ১০০ অর্থাৎ এক পট্টুশালী চরকা ভিন্ন অন্য সকল প্রাচীন চরকা হইতে বেশী গতিসম্পন্ন। সকলেই ইহা সমভাবে ব্যবহার করিতে পারে। ইহার আর একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে সূতা গুটাইবার নাটাই চক্রের বেলনে বসাইয়া টেকো হইতে সূতা গুটানোর কাজ সহজ ও দ্রুত করা সম্ভব হইয়াছে। ক্রমাগত কয়েক বৎসর ইহা আদর্শ চরকারূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং এখনও কাটুনীদের মধ্যে ইহার চলন আছে।

চক্রের ব্যাস বড় না করিয়া টেকোর গতি বাড়ানোর চিন্তা কিছুকাল চরকা গবেষণাকারীদিগকে মগ্ন রাখিয়াছিল। ইহার প্রথম আভাষ পাওয়া যায় ১৭নং গতি-চক্রওয়ালা চরকায়। ইহা কেরলে শ্রীমদন খাদি কুটিরে প্রথম তৈরী হয়।

বস্তুতঃ ইহার ব্যাপক প্রচলন হইবার পূর্বেই একই ধারায় চরকার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। ইহার আকারও মামুলী ও প্রাচীন ধরনের চরকার মত। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে টেকোর গতি বাড়াইবার জন্য মুল চক্র বড় না করিয়া একটি গতি-চক্র মধ্যে বসানো হইয়াছে। পরবর্তী সময়ের চরকাগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—পরীক্ষামূলক নূতন ধরনের চরকা (২) বিশেষ ধরনের চরকা এবং (৩) আধুনিক চরকা।

পরীক্ষামূলক নূতন চরকা

১৯২১ সাল হইতে দেশের অগণিত লোক চরকার উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর খাদি আন্দোলনের ইহাই প্রত্যক্ষ ফল। পরীক্ষামূলক অগণিত চরকাসমূহের অন্তর্গত চারিটি চরকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা (১) দিবান চরকা (২) গ্রাম চরকা (৩) বাক্স চরকা ও (৪) জীবন চরকা।

দিবান চরকা :—ইহার আবিষ্কারক স্বামী সত্যানন্দ, মৈত্রেয় আশ্রম, নেপল্লী, গুণ্টুর। ইহাতে একটি মাত্র ষ্ট্যাণ্ডে দুইটি কাঠের চাকা ; উপরেরটি

বড়, নিচেরটি ছোট। নিচেরটির সঙ্গে দুইটি ছোট বড় গতিক্রম জড়ান আছে। ইহার সহিত উপরস্থ বড়চক্রের সঙ্গে মালের যোগ আছে। নিম্নের চক্র টেকোর সঙ্গে মালের দ্বারা সংযোজিত। এই উপায়ে চক্রের ব্যাস বড় না করিয়া টেকোর গতি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অধুনা বহুল প্রচলিত যারবেদা চরকা ও কিষাণচরকার পথ নির্দেশক দিবান চরকা। কিন্তু দিবান চরকা বাজারে প্রচলিত হয় নাই।
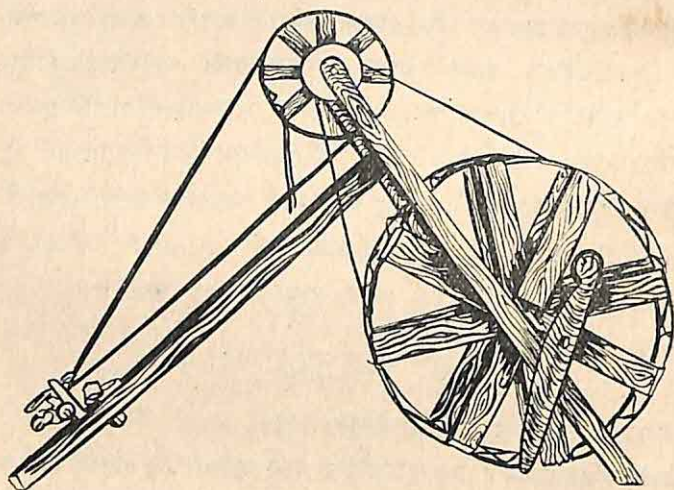
গ্রাম চরকা—আবিষ্কারক প্রভুদাস গান্ধী

(২) গ্রাম চরকা:—ইহার আবিষ্কারক ৺প্রভুদাস গান্ধী, গান্ধী সেবাসদন, আছকপুর। ইনি চরকার উন্নতিকল্পে বহু প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন

এবং বাস্তবরূপ দিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। গ্রামচরকা তাঁহার একটি আবিষ্কার। ইহাতে ছোট বড় দুইটি চাকা ও গতি চক্র আছে। চক্রের গঠন সাবেক কালের চরকার চাকার ন্যায়। চক্রদুইটির অবস্থানও উল্লেখযোগ্য ; Λ এই আকারের ষ্ট্যাণ্ডে কোনাকোনি স্থাপিত। এই চরকাও বাজারে প্রচলিত হয় নাই।
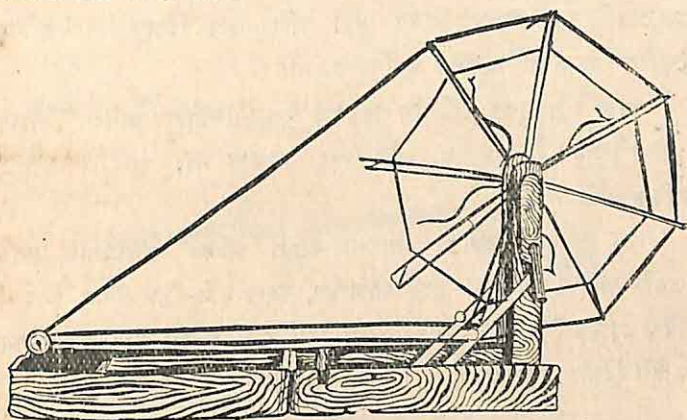
গুটান বাক্স চরকা—আবিষ্কারক শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, খাদি প্রতিষ্ঠান

(৩) গুটান বাক্স চরকা :—স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ইহার আবিষ্কারক। ইহার নাম হইতে বুঝা যায় যে চরকাটি বাক্সে নিহিত থাকে। খোলা চরকা প্যাক না করিয়া সঙ্গে লইয়া চলা অসুবিধাজনক ; সেই জন্য এই প্রথম বাক্স চরকার উদ্ভাবন। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে বাক্সের এক অংশে চাকাটি (খাড়া প্রাচীন চরকার অনুরূপ) গুটাইয়া রাখা যায়। কাজের সময় তারের পাখাগুলি খুলিয়া দেওয়া যায় —যেমন ছাতার বেলায় হইয়া থাকে। সূতা গুটাইবার লপেটা বা নাটাইও ইহাতে গুটাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে ; প্রয়োজন মত মেলিয়া

বেলনে বসাইয়া সহজে সূতা গুটানো যায়। টেকোতে সূতা গুটানোর জন্য পৃথক চাক্‌তি সহ নলী আছে। ইহার কার্যকারিতা এই যে সূতা গুটাইবার কালে টেকো হইতে বদল করিতে হয় না, নলীটি খুলিয়া লইলেই চলে। কোন কোন চরকায়ও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল বলিয়া জানা যায়। চরকাকে গুটাইয়া সঙ্গে লইয়া চলার উপায় উদ্ভাবন এই প্রথম। ইহার প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ চিন্তা করিয়া করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা তৈরীর খরচ অত্যধিক বলিয়া প্রচলিত হয় নাই।

কাকা কালেল্‌কর এই বাক্স চরকাকে সস্তায় তৈয়ারী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বর্তমানে এই উভয় নমুনাই বর্ধা মগন সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে।

(৪) জীবন চরকা ঃ—বাক্সবন্দী করিয়া চলিতে সুবিধাজনক আর একটি এক চাকার চরকা বাহির হইয়াছিল, ইহার নাম ছিল জীবন চরকা। কিন্তু বহনের উপযুক্ত উৎকৃষ্টতর চরকা আবিষ্কৃত হওয়ায় ইহারও প্রচলন নাই (বিদ্যালয়ে ব্যবহার যোগ্য চরকা দ্রষ্টব্য)।

বিশেষ চরকা

মগন চরকা ঃ—বিশেষ ধরনের চরকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য প্রসিদ্ধ মগন চরকা। ইহার চাকা একটি কিন্তু টেকো দুইটি। দুই হাতে দুই টেকোতে একসঙ্গে সূতা কাটা যায়। ইহাতে পাদল আছে। হাতে চাকা না ঘুরাইয়া পাদল চালাইয়া চক্র গতিসম্পন্ন করা যায়। চক্রের ব্যাস ২৭ ইঞ্চি। টেকোদ্বয়ের দূরত্ব যথাক্রমে ৩৪ ইঞ্চি ও ৪২ ইঞ্চি। 'মোড়িয়া'তে স্প্রিং আছে। চাকা একবার ঘুরাইলে দুই টেকোতে মিলিয়া ২০০ শত গতি পাওয়া যায়। ইহাতে ৭ ঘণ্টায় ১১ গুণ্ডি পর্যন্ত সূতা কাটা গিয়াছে। চরকা বিশেষজ্ঞগণ এখনও ইহাকে আরও উন্নত

করিবার চেষ্টায় আছেন। ইহা সকল প্রকারেই নূতন ও বিশেষ ধরনের চরকা।
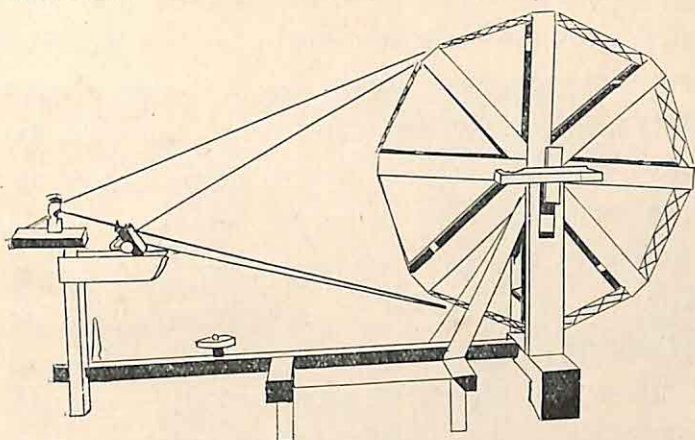
মগন চরকা

ধনুষ চরকা ঃ—ইহা আর একটি বিশেষ চরকা। আধুনিক কিষাণ বা যারবেদা চরকার সঙ্গে ইহার মৌলিক পার্থক্য নাই। বরং বলা যায় যে ইহা তূলা ধুনিবার ধুন্‌কি ও কিষাণ চরকার একটি সমষ্টি। ধুন্‌কিটি
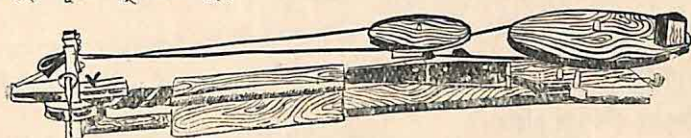
ধনুষ চরকা

৩৩ ইঞ্চি লম্বা। ইহার গায়েই কিষাণ চরকার অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রয়োজন মত চাকা ও মোড়িয়া খুলিয়া ধুনকিটি তূলা ধুনিবার জন্য ব্যবহার করা যায়। ইহার ব্যাপক প্রচলন নাই, তবে উল্লেখ যোগ্য চরকা বটে (যারবেদা চরকা দ্রষ্টব্য)।

বিদ্যালয়ে ব্যবহারযোগ্য আধুনিক চরকা

আধুনিক চরকা বলিতে যারবেদা চরকা ও কিষাণ চরকা বুঝিতে হইবে। পরীক্ষামূলক বিভিন্ন চরকা সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে; ইহাদের চরম উৎকর্ষ হইল যারবেদা চরকা। ইহা বলাই বাহুল্য যে চরকার উন্নতি সাধনের অনুপ্রেরণা সকলেই লাভ করিয়াছেন একটি বিশেষ উৎস হইতে। আর সেই উৎসস্থল খাদি প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং। তাঁহার যারবেদা জেলে অবস্থান কালে প্রসিদ্ধ যারবেদা চরকা পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে। ইহাতে নিয়মিত কাটুনিরূপে মহাত্মার নিজের অভিজ্ঞতার দানও কম নহে। ১৯৩১ সালে এই চরকা সর্বসাধারণের জন্য বাজারে চালু করা হয়। ইহা দুই চাকার গতি-চক্রওয়ালা বাক্স চরকা। ইহা সহজেই বহন করা যায় বলিয়াই আধুনিক কাটুনিদের প্রিয়; সেই জন্য ইহার প্রচলনও ক্রমশঃ বাড়তির পথে চলিয়াছে। বিভিন্ন সরঞ্জামের কার্যালয়ে হাজার হাজার যারবেদা চরকা তৈরি হইতেছে। একসময় একমাত্র নালওয়ারী সরঞ্জাম কার্যালয়েই প্রতিবৎসর কমপক্ষে ৫০০০ এ জাতীয় চরকা তৈয়ারী হইত।

ইহার বাক্সটি সমান দুই অংশে বিভক্ত এবং কব্জায় জোড় দেওয়া বাক্সের অর্ধাংশে বড় চাকা ও গতি-পুলি সমেত ছোট চাকা বসানো আছে। বাক্সের দ্বিতীয় অংশে স্প্রীংযুক্ত 'মোড়িয়া' কাছে। 'মোড়িয়া' ইচ্ছামত আগাইয়া পিছাইয়া দৃঢ় করা যায়। ছোট চাকার সঙ্গে মালের সংযোগ রহিয়াছে টেকোর সহিত।

মামুলী প্রাচীন চরকার সঙ্গে ইহার প্রধান অসামঞ্জস্য এই যে চক্র ইহাতে খাড়া নহে, ভূমি ও বাক্সের সমান্তরাল আছে।

কিষাণ চরকা :—যারবেদা চরকার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা কিষাণ চরকায় বর্তমান। তফাৎ এই যে এক-খণ্ড কাঠের ফালির উপর ইহার সমস্ত ব্যবস্থা সাজানো; অর্থাৎ বাক্সের মধ্যে নহে, ফলে বাক্স চরকা (যারবেদা চরকা) হইতেও ইহার

তৈয়ারী খরচ কম। এই কারণে ইহার চল্‌তি ক্রমশঃই বাড়িতেছে। উভয় চরকাই মূলতঃ এক হইলেও যারবেদা চরকা অপেক্ষা গুণে কিষাণ চরকা উৎকৃষ্টতর, অভিজ্ঞ কাটনি মাত্রেই এই কথা স্বীকার করিবেন।
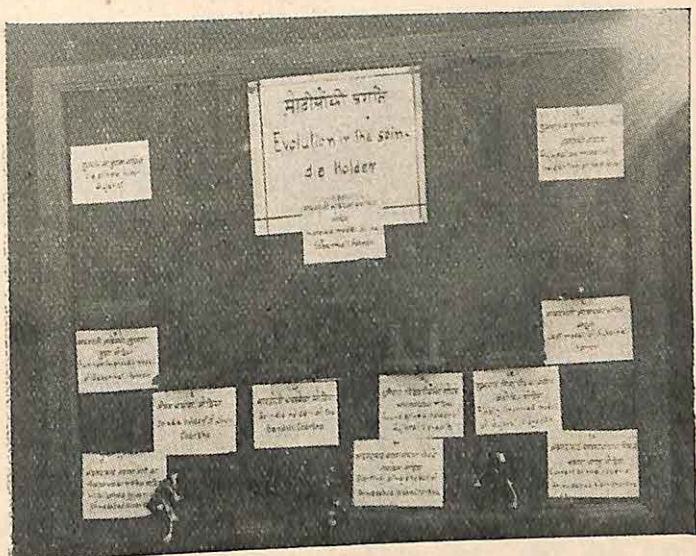
আধুনিক চরকা বিবর্তনের ফলে টেকো-স্ট্যাণ্ডের অর্থাৎ মোড়িয়ারও (Spindle holder) বিবর্তন ঘটিয়াছে। এই চিত্রে মোড়িয়ার বিবর্তন দেখান হইতেছে। বর্ধা মগন সংগ্রহালয়ের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে মোড়িয়া বিবর্তনের এই চিত্র গৃহীত হইয়াছে। বিভিন্ন মোড়িয়ার তথ্য হিন্দিভাষায় দেওয়া আছে।

যারবেদা ও কিষাণ চরকার মধ্যে পার্থক্য

সত্য বটে যে যারবেদা চরকা বাক্সবন্দী হওয়ায় ইহা লইয়া যথাতথা চলাফেরা করা সহজ; কিষাণ চরকার বেলায় ইহা অপেক্ষাকৃত কঠিন, কারণ চক্র দুইটি যখন তখন খুলিয়া যাইতে পারে, এবং খুলিয়া পড়িলে ক্ষতি হইতে পারে। অপর পক্ষে যারবেদা চরকায় চক্র দুইটি বাক্সের এক অর্ধাংশে

এবং মোড়য়া অপর অর্ধাংশে স্থাপিত। ফলে চক্র ও মোড়িয়া এক ভূমিগত না হওয়ার বাক্স খুলিয়া কাজের অর্থাৎ সূতা কাটিবার সময় যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি করে। ইহার কারণ কি? সাধারণতঃ যে জমির উপর বাক্সটি রাখিয়া আমরা সূতা কাটি, তাহা এক লেভেলের হয় না। বাক্সের দুই অংশ খোলা অবস্থায় ঠিক একই লাইনে অর্থাৎ সরল কোণে স্থিত হয় না। এই সম্বন্ধে আমি বহু পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। মনে করুন আপন ঘরে বসিয়া যারবেদা চরকায় সূতা কাটিলাম। ইহা বেশ কাজ করিল। কিছুক্ষণ পরে স্থানান্তরে যাইয়া বাক্স খুলিয়া কাজ আরম্ভ করার সময় দেখি যে মোড়িয়ার পূর্বের অবস্থান এখানে কাজ করিতেছে না। সূতা কাটা বন্ধ করিয়া মোড়িয়া ঠিক করিয়া লইলাম। তারপর সূতা কাটিতে গিয়া দেখি যে ইহার গতি পূর্বের ন্যায় সচল নয়, ভার গতি-সম্পন্ন। কোন কোন অভিজ্ঞ কাটুনি ইহা লক্ষ্য করিয়া বাক্সের দুই অংশকে খোলা অবস্থায় এক রেখায় রাখিবার পৃথক ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার ফলও খুব সন্তোষজনক নয়। কিষাণ চরকায় উক্ত কারণগুলি সম্পূর্ণ অবর্তমান, সেই জন্য ইহার সমগতি সকল ক্ষেত্রেই অটুট থাকে। কাটুনি, শিক্ষক এবং চরকা সরঞ্জাম কার্যালয়ের কর্মীদিগের পক্ষে সকল প্রকার চরকার সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যে সকল পুরানো ধরনের চরকা ও আধুনিক চরকা এখন আর ব্যবহৃত হয় না ও যে সকল চরকা আধুনিক চরকা আবিষ্কারের পথে জন্ম লইয়াছিল ইহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিলে শিক্ষকের নিজের শিক্ষাদানের কার্য সহজতর হইবে, চরকা যন্ত্রের কলা কৌশল সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান যুগপৎ শিক্ষাদান কার্যকে ও শিক্ষার্থীকে অধিকতর অনুপ্রাণিত করিবে এবং স্থানীয় প্রতিভার খাদ্য যোগাইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানৈতিক কারণেই বিভিন্ন চরকার গঠন কৌশল আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে যন্ত্র বিজ্ঞানের তথ্যগুলি প্রত্যক্ষ ও অনুভব সিদ্ধ হইয়া উঠে।

অম্বর চরকা

সম্প্রতি অম্বর চরকা সম্বন্ধে লোক সভায় আলোচনা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ইহার কার্যকারিতার প্রশংসা করিয়াছেন। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায়
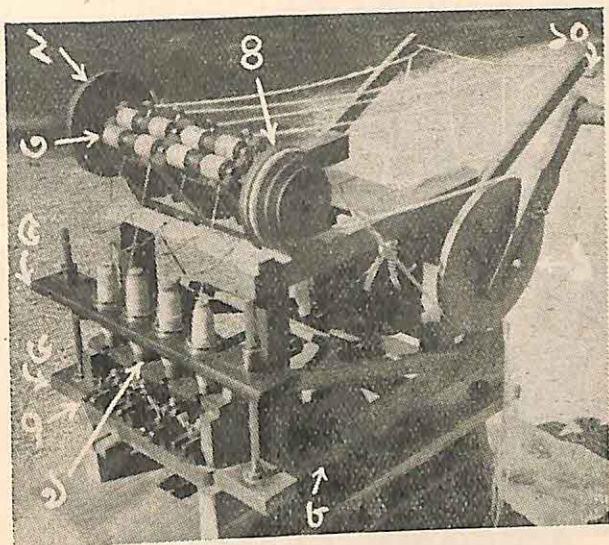
১। হাতলবুক্ত মুখ্যচক্র : এই চাকা ঘুরাইলে চরকার অন্যান্য চাকা ও অংশগুলি আপনা হইতেই সক্রিয় হয়।

২। পাকড় বেলন চক্র ইহা রবারী গুটকাকে সক্রিয় করে।

৩। রবারী গুটকা : ইহা পুণির উপর চাপদিয়া ঘুরে এবং সেই সঙ্গে সূতা ববিনে আসে।

৪। যেক্ বেলন চক্র ; ইহা রবারী গুটকাকে ঘুরায়।

৫। চুড়ি পট্টি : ইহা উঠানামা করে; ফলে ববিনের উপর সূতা ভালভাবে গুটাইয়া যায়।

৬। টেকো চৌকাঠ : ইহার উপর টেকোগুলি বসান থাকে।

৭। টেকো মোড়িয়া : ইহার সাহায্যে টেকোগুলি খাড়া থাকে।

৮। পান : ইহা রিংপট্টিকে উঠাইতে ও নামাইতে সাহায্য করে।

৯। ববিন : ইহার উপর সূতা গুটান হয়।

১০। পুনিপট্টি : ইহার উপর দিয়া সূতা রবারী গুটকার মধ্যে আসে।

ইহার প্রসারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতীয় চরকাশিল্পের ইতিহাসে অম্বর চরকা আধুনিকতম।

সরকারের প্রচেষ্টায় অম্বর চরকা দেশে প্রচলিত হইতেছে এবং বহু লোকের অন্ন সংস্থানের পথ সুগম করিতেছে। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন সম্প্রতি অম্বর চরকার সূতা উৎপাদন সম্পর্কে সার্ভে করিয়াছেন। ইহা
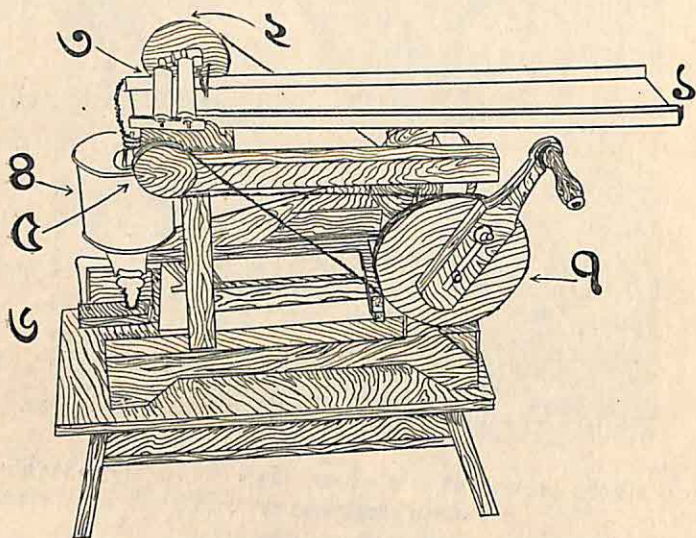
অম্বর চরকার বেলনী

১। টিন নলী ২। পকড় চক্র ৩। মুখ্যচক্রের মালদড়ি ৪। ডাব্বা ৫। যেক্ চক্র ৬। স্ট্যাণ্ড ৭। হাতলসহ মুখ্য চক্র

হইতে জানা যায় যে ১৯৫৮ সালে অম্বর চরকা হইতে ২০ মিলিয়ন গজ সূতা পাওয়া গিয়াছে এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে সূতার পরিমাণ দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪০ মিলিয়ন গজ হইবে।

চরকার বিবর্তনের ইতিহাসে অদ্যাবধি সর্বাধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে অম্বর চরকায়। এই চরকার রূপায়ণের পিছনে বহু বিজ্ঞ ও নিরলস কর্মীর কঠোর সাধনা রহিয়াছে। অম্বর চরকার আবিষ্কর্তা শ্রীএকাম্বরনাথমের
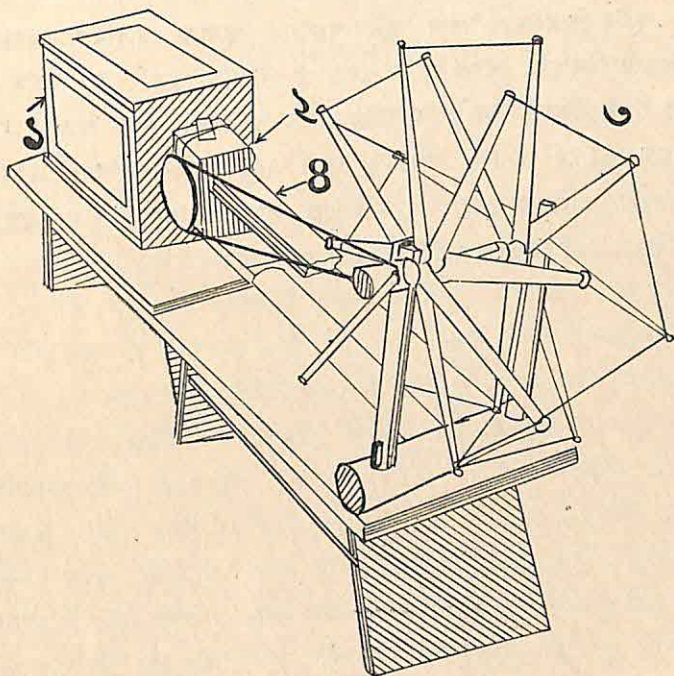
অম্বর চরকার অংশ

১। লোপ পেটি : ধুনাই করিবার সময় ধুনাই তুলা ইহার মধ্যে প্রবেশ করে।
২। যুনাই মোডিয়া : ইহার সাহায্যে তুলা ধুনাই করা হয়।
৩। পাখী চরকা : ধুনাই মোড়িয়াকে বেশী জোরে ঘুরাইবার জন্য ইহার প্রয়োজন।
৪। নালী : ইহার উপর দিয়া তুলা ধুনাই মোড়িয়াতে প্রবেশ করে।

নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। এই নীরব কর্ম সাধকের জীবনেতিহাস বড় বিচিত্র। ইনি তাঁহার মাতৃভাষা তামিল

ব্যতীত কোন ভাষাই জানিতেন না। যন্ত্র সম্বন্ধেও কোন বিশেষ জ্ঞান ছিল না। কেবল মাত্র স্বীয় অভিজ্ঞতা ও অনলস চিন্তার দ্বারা তিনি এই অভিনব চরকা আবিষ্কারে সক্ষম হইয়াছেন।

কুটির শিল্পে অম্বর চরকা স্থান পাইলেও পূর্বোক্ত আধুনিক চরকা বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে, শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র ও সমবেত সূত্র যজ্ঞে, উন্নত-তর চরকা উদ্ভাবন না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। ইহা আশা করা অন্যায় নয় যে পূর্বোক্ত আধুনিক চরকা সমূহ ও সর্বশেষ অম্বর চরকা ভারতীয় প্রতিভার শেষ দান নহে এবং বুনিয়াদি শিক্ষাপ্রাপ্ত নাগরিক ভবিষ্যতে উন্নততর চরকা সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

শিক্ষাশিল্পে তক্‌লির স্থান

জাতির জনক ও তক্‌লি

বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনানুসারে দেশের সর্বত্র বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। পরিকল্পনাকারী জাতির জনক তক্‌লিকে বুনিয়াদি শিক্ষায় বিশেষ স্থান দিয়াছেন। যে পরিকল্পনা তিনি শিক্ষাব্রতী ও দেশবাসীর নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ :—

"আজ আমি যে পরিকল্পনা আপনাদের সমীপে উপস্থিত করিয়াছি, তাহার দ্বারা আমরা আমাদের ছেলে মেয়েকে আত্মবিশ্বাসী করিয়া তুলিতে পারি। এই সাত বৎসর তাহারা শুধু তক্‌লি চালনাই শিখিবে না। আমার মতে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে ছেলেরা অল্প অল্প তূলা ধুনা শিখিবে। তারপর কার্পাসের ক্ষেত হইতে তূলা সংগ্রহ করা শিখিবে। এ-সব শিক্ষার পরে তাহারা প্রথমে তক্‌লি ও পরে চরকার সাহায্যে সূতা কাটা শিখিবে। এইরূপ পর্যায়ে সূতাকাটা শিক্ষার পর তাহাদিগকে তক্‌লি, চরকার নির্মাণ পদ্ধতি শিখাইতে হইবে। সেজন্য তাহারা কাঠের ও ধাতুর কাজও শিখিবে। এই ভাবে যদি সমগ্র কোর্সটিকে সাত বৎসরের জন্য প্ল্যান করা যায়, তবে পরিকল্পনাটি সাফল্য মণ্ডিত হইবেই।"—মহাত্মা গান্ধী

এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য কতখানি কার্যকরী হইয়াছে, তাহা আজ বিশেষ ভাবে যাচাই করার সময় আসিয়াছে। বিদ্যালয়ে তক্‌লির ব্যবহার ঠিক পথে চলিয়াছে কিনা এবং তাহার ফলাফলই বা কি হইয়াছে, তাহা অনুধাবনের বিষয়।

খাদি আন্দোলনে সমগ্র দেশ সাড়া দিয়াছিল, ফলে চরকার অভিনব

উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। তকলি চরকা হইতেও প্রাচীন। কালের অন্তরাল হইতে এই অতি প্রাচীন ও আদিম সূতা কাটার তকলিকে জনপ্রিয় করিয়াছেন আচার্য বিনোবা ভাবে। বাংলা ভাষার অভিধানে এই আদিম সূতা কাটার যন্ত্রের একাধিক নাম পাওয়া যায়। যথা :—টক্র, টাকু, টেকো, তকু ইত্যাদি। হিন্দী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় টেকোর প্রতিশব্দ তকলি। আমরা এখানে সর্বভারতে প্রচলিত তকলি শব্দই ব্যবহার করিব।

বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষককে কার্পাস শিল্প শিক্ষার উপকরণ, তাহা তৈরির উপাদান ও পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষার সেই ব্যবস্থা থাকিবে। প্রয়োজন হইলে শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার মেয়াদ দীর্ঘতর করিতে হইবে। নতুবা কার্পাস শিল্পের শিক্ষানৈতিক রূপ কখনই সফল হইবে না। শিক্ষা ক্ষেত্রেও এই শিল্পের স্থান ও মান সঠিকভাবে নির্ণীত হইবে না।

প্রাচীন বাঁশের তকলি

অধ্যাপক ক্রাফর্ড প্রাচীন বাঁশের তকলির এরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :—
"The point of the spindle (a fine needle of bamboo, with a little pellet of clay at the bottom) rested in a dish, containing water, to moisture the fingers of the spinner. The act of spinning was performed by twirling this little sliver of bamboo and working the fibres between the fingers. It was a matter of exquisite training, not a complex implements or processes. You can no more explain such spinning than you can describe how Fritz Kreisler plays a violin."

চরকা অতি প্রাচীন কাল হইতে সর্বভারতের সাধারণ সূতা কাটার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইলেও মসলিন এবং মিহি কাপড়ের জন্য সূক্ষ্ম সূতা কাটা হইত এই তকুলির সাহায্যে। ইহা হয়ত সর্বপ্রাচীন সূতাকাটার যন্ত্র। সূতা কাটিবার যন্ত্রের মধ্যে তকুলির স্থান অতি উচ্চে ও ব্যাপক। কারণ :—
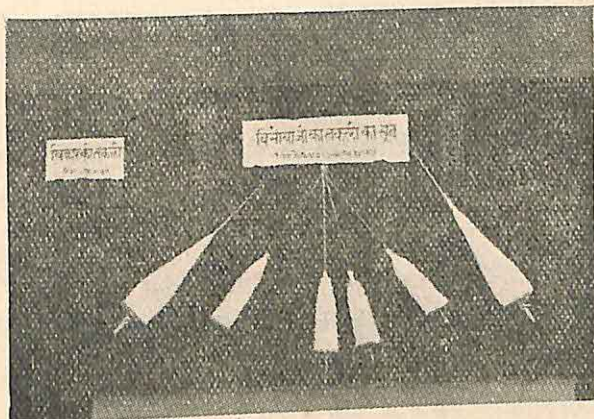
আচার্য বিনোবা বাহে কর্তৃক তকলিতে উচ্চ নম্বরের কাটা সূতার নমুনা। ইহা মগন সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে। সংগ্রহালয়ের সৌজন্যে ফটো গৃহীত হইয়াছে।

(১) ইহা সহজে সঙ্গে লইয়া যথা তথা যাওয়া চলে (২) ইহার তৈরির খরচ নগণ্য। (৩) যেখানে খুশি যে কোন অবস্থায় ইহা চালনা করা যায়। (৪) ইহা আঙ্গুলের সচলতা বৃদ্ধি করে, নিজের ইচ্ছাধীনে অঙ্গুলি চালাইবার নৈপুণ্যের ফল শিক্ষাবিদ মাত্রেই অবগত আছেন। (৫) তকুলি এত সাধারণ যন্ত্র যে, সকল কাটুনীই অল্পায়াসে তকুলি তৈয়ার করিয়া লইতে পারেন।

উক্ত পাঁচ পর্যায়ে তকুলির গুন যাহা বলা হইল, তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রত্যেকটি গুণের পৃথক বিচার করা প্রয়োজন।

(১) তক্‌লিকে সঙ্গে লইয়া যথা তথা গমনাগমন করা যায়। ইহার অর্থ এই যে একটি তক্‌লির ওজন অল্পাধিক দেড় তোলা মাত্র। ক্ষেত্র বিশেষে চরকা লইয়া চলা কঠিন হইতে পারে। কিন্তু বিনা আয়াসে তক্‌লি সঙ্গে করিয়া চলা যায়, যেমন চশমা ব্যবহারকারী আপন চশমা সঙ্গে করিয়া চলেন।

(২) ইহা তৈয়ারির খরচা অতি নগণ্য বলিতে কি বোঝায়? মামূলী চল্‌তি তক্‌লির দুইটি অংশ যথা:—একটি লৌহশলাকা ও একটি চাক্‌তি। মামূলী লৌহ শলাকা ও পিতলের চাক্‌তি বিশিষ্ট তক্‌লির দাম যুদ্ধের পূর্বে মাত্র ৴১০ পয়সা ছিল। বাঁশের তক্‌লির দাম আরও কম ছিল। যাহারা পয়সার অভাবে চরকা কিনিতে বা তৈরী করিয়া লইতে অসমর্থ, তাঁহারা তক্‌লির ব্যবহার করিয়া বস্ত্র-স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারেন।

(৩) যেখানে খুশি যে কোন অবস্থায় ইহা চালনা করা যায়। এক সময়ে এই তক্‌লি চালনা একটি বিশেষ কলায় পরিণত হইয়াছিল। আটাইশ প্রকার অঙ্গভঙ্গীতে তক্‌লি চালনার পদ্ধতি বর্তমান ছিল। দৃষ্টান্ত:—যেমন ডান হাতের চারি অঙ্গুলি ও অঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে চারি প্রকার। অনুরূপ বাম হাতেও চারি প্রকার। ডান ও বাম পদের বিভিন্ন স্থানে, বসিয়া, দাঁড়াইয়া গল্পগুজব করিবার সঙ্গে সঙ্গে তক্‌লি চালনা করা যায়। বস্তুতঃ তক্‌লির ন্যায় অবসর সময়ের ক্লান্তিবিনোদক অথচ লাভজনক কাজের যন্ত্র দ্বিতীয়টি আজও পর্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছে কিনা জানা যায় না। বস্ত্র-শিল্প সম্পর্কে পৃথিবীর অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক ক্রাফর্ড তক্‌লি চালনাকে পৃথিবী বিখ্যাত বেহালাবাদক ফ্রিজ ক্রেইস্‌লার-এর বাদ্যনৈপুণ্যের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন এবং তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তক্‌লির ব্যবহারের গুরুত্ব

ইহা অঙ্গুলির সচলতা বৃদ্ধি করে, অঙ্গুলি নিজের ইচ্ছাধীন চালাইবার

নৈপুণ্যের ফল শিক্ষাবিদ মাত্রেই আবগত আছেন। শিক্ষা শিল্পের ক্ষেত্রে ইহার স্থান অদ্বিতীয়।

শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সচল রাখিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যায়াম চর্চার প্রয়োজন হয় তাহা সকলেই জানেন। অঙ্গুলির সাহায্যে আমরা নিজ চিন্তাকে বাস্তব কর্মে রূপ দিই, যেমন চিত্রকর অঙ্গুলির সাহায্যেই তুলি চালনা করেন, ভাস্কর অঙ্গুলির সাহায্যেই পরিকল্পনা অনুযায়ী মূর্তি গড়েন, বাদ্যকর অঙ্গুলির সাহায্যেই সুললিত স্বর বাহির করেন অর্থাৎ আমরা অঙ্গুলির সাহায্যেই শিখি। অঙ্গুলি চালনার সঙ্গে মস্তিষ্কের সচলতার কত যোগ, বিশেষ করিয়া অল্প বয়সে তাহা শিক্ষাব্রতীরা ভালভাবেই জানেন। সে জন্য হস্ত চালনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিবার জন্য নানাবিধ প্রয়োজনীয় শিল্প শিখাইবার ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন দেশে হইয়াছে। এরূপ স্থলে তক্‌লির প্রবর্তন যে অতি উপযোগী সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যে কোন কলার পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গেলেই প্রথমে অঙ্গুলিকে স্ববশে আনিতে হয়। শিক্ষা গ্রহণের বয়সেই ইহা আরম্ভ করিবার প্রকৃষ্ট সময় এবং এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তক্‌লির চালনা একটি বিশেষ পন্থা।

(৫) তক্‌লি এত সাধারণ যন্ত্র যে কাটুনি মাত্রেই নিজ নিজ তক্‌লি অল্পায়াসেই তৈরি করিয়া লইতে পারেন।

তক্‌লির দুইটি অংশ আছে। যথা, টেকো ও চাকৃতি। টেকো :—পাঁজ হইতে সূতা বাহির করিয়া পাক দিবার জন্য টেকো ব্যবহৃত হয়। ইহার আর একটি ব্যবহার পাক দেওয়া সূতা ইহার গায়ে জড়াইয়া রাখা। পাকা লোহার টেকো সাধারণতঃ বাতিল ছাতার শিক হইতে লওয়া হয়। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ফলে ইহার দৈর্ঘ্য ৬২"—৭" ইঞ্চি নির্ধারিত হইয়াছে। সূতা টানিয়া বাহির করা এবং পাক দেওয়া এই দুই কাজ এক সঙ্গে চলে।

ইহাই সর্বোত্তম রীতি। সূতা যাহাতে ফসকাইয়া না যায় সেজন্য টেকোর অগ্রভাগে খাঁজ করিয়া লইতে হয়। চাকৃতি :—পাকা লৌহের টেকোর জন্য ধাতুর চাকৃতি প্রয়োজন। চাকৃতি দুইটি উদ্দেশ্য পূরণ করে। যথা, ইহা টেকোর গতিকে স্থির রাখে, ইহার অবর্তমানে টেকো স্থির হইয়া ঘুরিতে পারে না। চাকৃতির ওজন থাকায় স্থির গতিশীল টেকোতে দীর্ঘ একটানা সূতা কাটা সম্ভব। চাকৃতির অন্য প্রয়োজনীয়তা এই যে, ইহা সূতা গুটানোর নিম্নতম আধার বিশেষেরও কাজ করে।

ধাতব চাকৃতির জন্য লোহা, ইস্পাত, সীসা, তামা ও পিতল ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাদের গুণাগুণও বিবেচনার বিষয়। লোহা ও ইস্পাতে সহজেই মরিচা পড়ে। ইহাতে সূতার ক্ষতি হইতে পারে। তবে যাহারা রোজই সূতা কাটেন তাঁহাদের টেকোর চাকতিতে মরিচা পড়ার সম্ভাবনা কম। সীসার চাকৃতি টেকসই হয় না, টেকো বসাইবার গর্তটি সহজেই বড় হইয়া ঢিলা হইয়া যায়। তবে সীসার সঙ্গে অন্য ধাতু মিশ্রিত করিয়া লইলে সীসাও কার্যকরী হয়। ইস্পাতের চাকৃতি কাঁচা লোহার চাকৃতি অপেক্ষা ভাল। ইহা অপেক্ষা ভাল হয় তামা বা পিতলের চাকৃতি। অভিজ্ঞতা বা স্বাভাবিক কারণ হেতু দেখা গিয়াছে যে পাকা লোহার টেকোর জন্য ধাতব চাকৃতির ব্যাস ১" ইঞ্চি ও ওজন ১ তোলা হইলে সর্বাপেক্ষা ভাল গতি পাওয়া যায়। উক্ত মাপের ব্যাস এবং ওজন ঠিক রাখিয়া চাকৃতি কত পুরু হইবে ইহা স্থিরীকৃত হয়। অভিজ্ঞতাই এক্ষেত্রে আমাদের পরিচালক। ছাঁচে ধাতু গলাইয়া চাকৃতি করা যায় বটে কিন্তু ইহাতে ঠিক ঠিক গোল চাকৃতি যায় পাওয়া না। গোলের সামান্য বিকৃতি ঘটিলে প্রকৃষ্ট গতি পাওয়া যায় না। সেজন্য কুঁদের সাহায্যে চাকৃতি তৈরি করিতে হয়। কুঁদের কারিগরদ্বারা চাকৃতি তৈরি করাইয়া লওয়া অথবা সমবায় উপায়ে প্রতি পল্লীতে বহু কাটুনি মিলিয়া
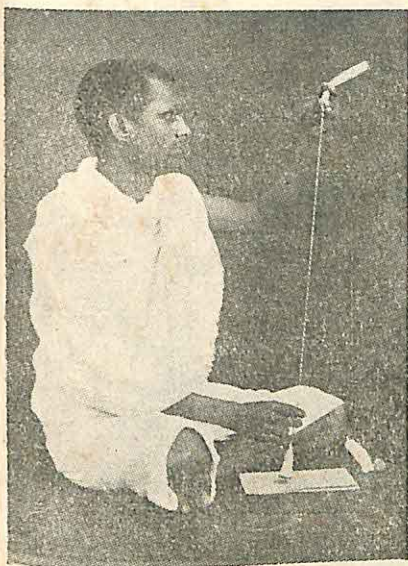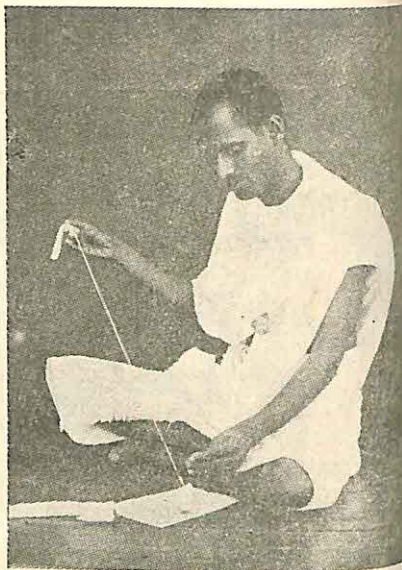
—বিভিন্ন ভঙ্গীতে তক্‌লি চালনা—

বিভিন্ন ভঙ্গীতে তক্‌লি চালনার পদ্ধতি সাতটি চিত্রের সাহায্যে দেখান হইয়াছে। তক্‌লি চালক শ্রীসত্যেন ভাই একজন বড় শিল্পী। ১৯৪২ সালে নালওয়ারী আশ্রমে অবস্থান-কালে ফটোগুলি গৃহীত হইয়াছে।

কুঁদ রাখা এবং প্রয়োজনমত ব্যবহার করা সম্ভব। অন্য উপায়েও তকলির চাকতি তৈরি করা যায়। পোড়া মাটি, যেমন মাটির কলস, হাঁড়ি প্রভৃতির টুকরা, ভাঙ্গা শ্লেট, টালি অথবা নরম পাথর দ্বারা চাকতি করিয়া লওয়া সম্ভব। এই জাতীয় টেকোর জন্য উপরোক্ত মাপ ও ওজনের চাকতি হওয়া চাই। পোড়া মাটি বা শ্লেট বা পাথর যাহাই হোক প্রথমে দুই পিঠ ঘষিয়া পরে কেন্দ্র ঠিক করিয়া ডিভাইডারের সাহায্যে গোল লাইন আঁকিয়া ঘষিয়া গোল করিতে হইবে। পরে কেন্দ্রে টেকো বসাইবার জন্য ছিদ্র করিতে হইবে। হ্যাণ্ডড্রিলে অতি সহজেই ছিদ্র হইবে। ছিদ্রটি টেকোর ব্যাস অপেক্ষা অতি সামান্য ছোট করা প্রয়োজন, যাহাতে টেকোটি দৃঢ় হইয়া নির্দিষ্ট স্থানে বসিতে পারে। ছিদ্র করিবার এবং টেকো বসাইবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন টেকো এবং চাকতির যোগস্থল সমকোণী থাকে।

বাঁশের টেকো

প্রাচীন কালের কাটুনিরা তকলিতে বাঁশের টেকো ব্যবহার করিত। কোঁদাই করা কাঠের বা পোড়া মাটি কি শ্লেট, পাথর ইত্যাদির চাকতি ব্যবহৃত হইত। এখনও বিহারের কাটুনিদের মধ্যে এই প্রথা বর্তমান। কিন্তু ধাতব তকলির গতি বেশী, ফলে অল্প সময়ে অধিক সূতা কাটা সম্ভব হয়। অপর পক্ষে বাঁশের টেকো ও কাঠের চাকতির তকলিতে যত অধিক নম্বরের সূতা কাটা যায় ধাতব তকলিতে তাহা কাটা অপেক্ষাকৃত কঠিন। এখানে বিবেচ্য এই, অধিক বা উচ্চ নম্বরের সূতা কাটিবার প্রয়োজন হইলে উক্ত বাঁশের তকলিই প্রশস্ত; আর সূতার গতি কাটুনির লক্ষ্য হইলে ধাতব তকলিই ব্যবহার্য। বাঁশের তকলি কাটুনি নিজেই তৈরি করিতে পারেন।

ধাতব তক্‌লি মেরামত করিবার উপায়

ধাতব তক্‌লি ব্যবহারকারী মাত্রেরই নিম্নলিখিত যন্ত্র সঙ্গে রাখা প্রয়োজন ; কারণ টেকো অনেক সময় সামান্য বাঁকিয়া গেলেই আর উপযুক্ত কাজ পাওয়া যায় না, সে জন্য টেকো সঙ্গে সঙ্গে সরল করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

(ক) টেকোর বাঁক পরীক্ষা করিবার জন্য একটি ষ্ট্যাণ্ড।

(খ) একটি সমতল পৃষ্ঠযুক্ত লৌহ খণ্ড ১"×২"×৮"।

(গ) ৫ আউন্স ওজনের একটি ছোট লোহার হাতুড়ি।

এ-সকলই স্থানীয় কারিগর দ্বারা করাইয়া লওয়া যায় বা নিজে করিতে পারা যায়।

ধনুষ তক্‌লি

ইহার নাম হইতে বুঝা যায় যে তক্‌লির সঙ্গে ধনুষের অর্থাৎ ধনুকের যোগ আছে। খাদি আন্দোলনের সময়ে অনেকের চিন্তা সূতা কাটিবার যন্ত্রের উন্নতির প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছিল। চরকা ও তক্‌লির প্রগতি সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। ধনুষ তক্‌লি নামক সূতা কাটিবার যন্ত্র আবিষ্কারের গৌরব মহাত্মা গান্ধীর এক অনুরক্ত পাশ্চাত্যদেশীয় ইঞ্জিনীয়ারের—নাম মরিস ফ্রীড্‌ম্যান। এদেশে তিনি স্বামী ভারতানন্দ নামে পরিচিত। অষ্ট্রিয়ার কোন ইহুদি বংশে এঁর জন্ম। মহাত্মা গান্ধীর সেবাগ্রাম আশ্রমে অবস্থান কালে ইনি হাতে সূতা কাটিবার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তক্‌লির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন এবং তাঁহার প্রয়াসের ফল ধনুষ তক্‌লি। তক্‌লি ও চরকার মাঝামাঝি যন্ত্র এই ধনুষ তক্‌লি। চরকার ন্যায় টেকোকে ধারকের মধ্যে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। তক্‌লিতে গতি দেওয়া হয় হাতে, চরকায় চক্রের সাহায্যে আর ধনুষ তক্‌লিতে গতি দেওয়া হয় একটী পাত চামড়ার গুণবিশিষ্ট ধনুকের সাহায্যে। ধনুকের গুণ তথা পাতচামড়া দ্বারা গতি দিবার কালে পিছলাইয়া যায় বলিয়া আঠালো দ্রব্য

(যাহা সহজে শুকায় না) চামড়ার গায়ে প্রয়োগ করিতে হয়। টেকোর গায়ে দুইবার টান দিবার মধ্য সময়ে যাহাতে টেকোর গতির বিকৃতি অর্থাৎ কমতি না হয়, অন্য কথায় সমগতি সম্পন্ন হয়, সে জন্য তক্‌লির ন্যায় একটি ভারি চাকতি লাগান থাকে। ইহাই টেকোর গতির সমতা রক্ষা করে।

সাধারণ তক্‌লি ও ধনুষ তক্‌লির মধ্যে সামঞ্জস্য এই যে উভয়েই একটানা গতির দ্বারা (যেমন চরকার টেকো) চালিত নহে এবং উভয়েরই চাক্‌তি গতির শক্তির সমতা রক্ষা করে। ধনুষ তক্‌লিতে টেকোকে ধারক মধ্যে আবদ্ধ করাটা চরকার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ধনুষ তক্‌লির নিজস্ব বিশেষত্ব চামড়ার গুণবিশিষ্ট ধনুকটি, যাহার দ্বারা টেকোকে গতি সম্পন্ন করা হয়।

ধনুষ তক্‌লির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

ধনুষ তক্‌লি চারটি পৃথক অংশের সমষ্টি। যথা—(ক) টেকো (খ) দেহ (গ) ধনুষ (ঘ) নাটাই।

(ক) টেকো—টেকোর গায়ে একটী চাক্‌তি, দুইটি ওয়াশার ও একটি বুশ (bush) আছে।

(খ) দেহ—একটি কাঠের পিড়ার উপর টেকো বহন করিবার দুইটি খুঁটি, পায়া, পেগ ও চাপিয়া বসিবার জন্য কাঠের পাটি।

(গ) ধনুষ—একটি বাঁশের টুকরা, হাতল, কোন, চামড়ার জ্যা, দুইটি কাঠি জ্যাকে ঠিকস্থানে রাখিবার জন্য।

(ঘ) নাটাই— ধনুষ তক্‌লি হইতে সূতা গুটাইবার জন্য নাটাইয়ের প্রয়োজন। ইহা বাঁশের তৈরি।

কার্পাস শিল্পের অন্যান্য উপকরণ

চরকি ঃ—তূলার বীজ ছাড়াইবার যন্ত্র

তক্‌লি ও চরকার ন্যায় অতি প্রাচীন কালেই কার্পাস হইতে বীজ ছাড়াইয়া পৃথক করিবার যন্ত্র এই চরকির জন্ম এদেশে হইয়াছিল। এই বিরাট দেশের ভিন্ন ভিন্ন কার্পাস শিল্প কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকারের চরকি তৈরী ও ব্যবহৃত হইত। কিন্তু মৌলিক সাদৃশ্য সকল চরকিতেই বর্তমান। তক্‌লি ও চরকার মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, সেইরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হয় হাতে অথবা পায়ের দ্বারা বীজ ছাড়ানো ও কলের চরকির মধ্যে। এই বৃহৎ দেশের স্থানে স্থানে কোথায় কিরূপ কার্পাস বীজ ছাড়াইবার কৌশল বর্তমান আমরা এখানে তাহার পরিচয় পাইব।
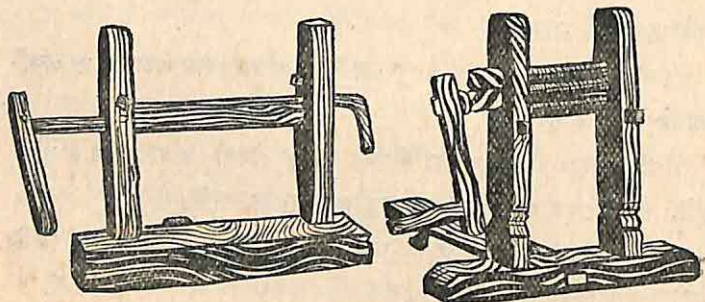
বামে ঃ (১) ছাপরা জেলা, দ্বারভাঙ্গ, পাটনা প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত। ৮ ঘণ্টায় ১৫-২৫ সের কার্পাস বীজমুক্ত করা যায়।

দক্ষিণে ঃ (২) অন্ধ্র, মছলীপট্টম প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত হয়। বেলন দুটি কাষ্ঠ নির্মিত।

(১) চরকি। স্থান ঃ—বিহার। ইহাতে দুই ব্যক্তি কাজ করে, এক জন হাতল চালায় আর অপর জন কার্পাস যোগায়। একসময়ে ইহার মামুলী

দাম বারো আনা মাত্র ছিল। ছাপরা জেলা, দ্বারভাঙ্গা ও পাটনার প্রায় পাঁচশত গ্রামের কাটুনী ব্যবসায়ীরা ইহা ব্যবহার করিত ও করে। সাফুটা কাঠ দ্বারা বেলন বা রোলার তুইটি তৈরী হয়।

(২) চরকি। স্থান :—কেরল, ইহাতে ৮ ঘণ্টায় ১৩ পাউণ্ড তূলা বীজমুক্ত করা সম্ভব। ইহার রোলার তুইটি যুইল কাঠের।
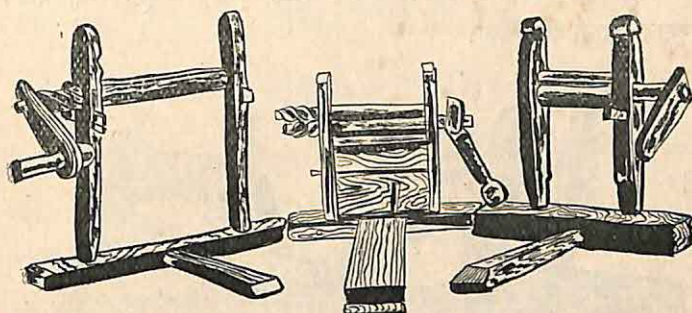
বামে স্থান : (৩) গান্ধী আশ্রম, মীরাট। বেলন-বাবলা অথবা শিশমকাঠের। ৮ ঘণ্টায় ৩০ পাউণ্ড কার্পাস। মধ্যে : (৪) অখিলভারত চরকা সঙ্ঘের কেরল শাখায় ব্যবহৃত। বেলন-যুইল কাঠের। দক্ষিণে : (৫) অখিলভারত চরকা সঙ্ঘের বিহার শাখায় ব্যবহৃত।

(৩) মীরাট চরকি। স্থান :—গান্ধী আশ্রম, মীরাট ; সংযুক্ত প্রদেশ। ৮ ঘণ্টায় ৩০ পাউণ্ড তূলা পাওয়া যায়। রোলার বাবুল বা শিরীষ কাঠে তৈরি।

(৪) বারদোলী চরকি। স্থান :—সবরমতী আশ্রমের সরঞ্জাম কার্যালয়ে প্রস্তুত। বারদোলী চরকা যেমন সুচিন্তিত প্ল্যানে তৈরী হইয়াছিল তদনুরূপ বারদোলী চরকিও প্রাচীন চরকিসমূহের গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ করিয়া একটি নূতন প্ল্যানে তৈরি। খুঁটি তুইটির শিরে স্ক্রু লাগানো আছে, যাহার সাহায্যে

রোলারকে ঢিলা বা আলগা করা যায়। লোহার রোলারটিতে প্যাচ কাটা দাগ আছে। বীজ ছাড়ানো তূলা যাহাতে সহজে বাহিরে আসে সেজন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহাতে ৮ ঘণ্টায় ৪০ পাউণ্ড তুলা বীজমুক্ত করা যায়। এক সময়ে সারা গুজরাটে ইহা প্রচলিত হইয়াছিল।

(৫) চরকি—সাধারণত দ্বারভাঙ্গা, সাঁওতাল পরগনা ও হাজারিবাগ অঞ্চলে ব্যবহৃত হইত। ৮ ঘণ্টায় ১০ পাউণ্ড তূলা বীজমুক্ত করা যায়। মূল্য ॥০ আনা মাত্র ছিল।
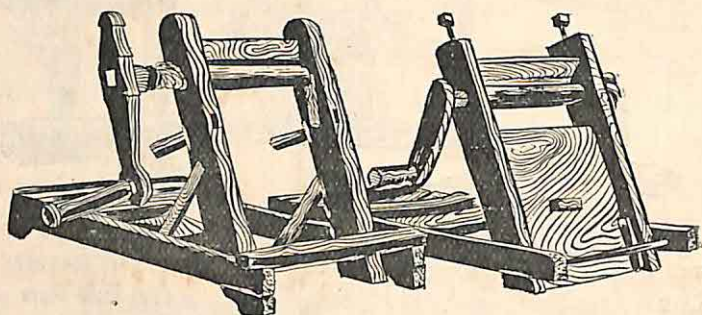
বামে : (৬) মহারাষ্ট্র চরকা সঙ্ঘ কর্তৃক ব্যবহৃত। ৮ ঘণ্টায় ৪০ পাউণ্ড কার্পাস বীজমুক্ত করা যায়।

দক্ষিণে : (৭) সরঞ্জাম কার্যালয়, সবরমতী, বিশেষত্ব : মধ্যস্থিত গোল লৌহখণ্ডের গায়ে কাটা কাটা দাগ ও উপর হইতে স্ক্রু আটিবার ব্যবস্থা।

(৬) নালওয়ারী চরকি। স্থান—বর্ধা শহরের নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ নাল-ওয়ারী আশ্রমের অন্তর্গত সরঞ্জাম কার্যালয়ে প্রস্তুত। ইহাকে আধুনিকতম চরকি বলা যাইতে পারে। ইহার গঠন বারদৌলীর অনুরূপ হইলেও রোলার আটকাইবার বা ঢিলা করিবার জন্য সহজতর ব্যবস্থা অর্থাৎ কাঠের চাবি রোলারের নীচে খুটির মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। ফলে বারদৌলী চরকি অপেক্ষা

ইহার প্রস্তুত প্রকরণ সহজ ও সস্তা হইয়াছে। ইহাতে ৪০ পাউণ্ড তূলা ৮ ঘণ্টায় পাওয়া যায়।

হাতে ও পায়ে কার্পাসবীজ ছাড়াইবার কৌশল

চরকির পূর্বে হাতে বীজ ছাড়াইবার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইংরাজীতে ইহাকে Hand gin বলা হয়। Hand gin এর ন্যায় foot gin অর্থাৎ পদদ্বারা বীজ ছাড়াইবার প্রথাও প্রাচীন এবং উল্লেখযোগ্য।

হাতে বীজ ছাড়াইবার পাটা (Hand gin)

স্থান :—অন্ধ্র, চিকাকোল, ভিজাগাপত্তম। ইহার দুইটি অংশ ; যথা—(ক) ৪"×৪"×১২" সিশম কাঠের একটি টুকরা। (খ) ২" ইঞ্চি ব্যাসের একটি লৌহ শলাকা। ইহার উভয় দিক ক্রমশ সরু।

ব্যবহার প্রণালী :—প্রথমে মাছের কাঁটা দিয়া কার্পাসের আঁশগুলিকে সোজা করিয়া লওয়া হয়। পরে উক্ত কাষ্ঠাধারের উপর স্থাপন করিয়া দুই হাতে লৌহ শলাকা দ্বারা বেলান কাঠির ন্যায় ঘষিয়া বীজ ছাড়ানো হয়। ইহার জন্ম স্থানে অর্থাৎ অন্ধ্রে এখনও ইহা প্রচলিত আছে, শুধু তাহাই নহে অন্ধ্রের প্রসিদ্ধ মিহি সূতার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কার্পাসের বীজ এই ভাবেই প্রাচীন কালেও ছাড়ান হইত। সেদেশের বাজারে কাষ্ঠখণ্ডটি ৵০ আনা ও লৌহ শলাকাটি।০ আনায় বিক্রি হইত। পর পৃষ্ঠার বামের ছবি দ্রষ্টব্য।

পায়ে বীজ ছাড়াইবার পাটা (Foot gin)

স্থান :—প্রাচীন হুবলী, দ্বারওয়ার, কর্ণাটক। উপরের হ্যাণ্ডজিনের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে কাঠের বদলে পাথর এবং হাতের বদলে দুইটি পা ব্যবহৃত হয়। পাথর খণ্ডের মাপ ২½"×৬"×১০"; লৌহ শলাকা

$\frac{3}{4}$"× ১২" উভয় দিকে ক্রমশ সরু হইয়া $\frac{1}{4}$" ইঞ্চি পর্যন্ত এবং দুইটি সমান মাপের বাঁশের টুকরা মাপ $\frac{3}{4}$"× ১$\frac{1}{4}$"× ১১"।
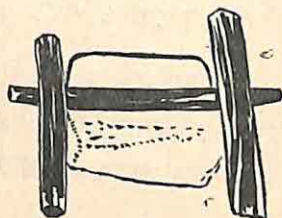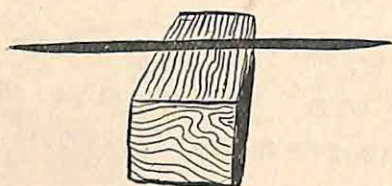
হাতে বীজ ছাড়াইবার পাটা।
(বামে) স্থান: চিকাকোল, অন্ধ্র, মছলীপট্টম।
সিসম কাঠ: ৪"× ৪"× ১২"।
লোহার রড: $\frac{1}{2}$"× ১৭"

পায়ে বীজ ছাড়াইবার পাটা।
(দক্ষিণে) স্থান: কর্ণাটক। পাথর: ৬"× ১৩"× ২"। লোহার রড: $\frac{3}{4}$"× ১২" বাঁশের পাদল।

ব্যবহার প্রণালী:—একটি কাঠের (১৪"—১৬" ইঞ্চি উচ্চ) আসনে বসিতে হইবে। পাথরের উপর কার্পাস রাখিয়া লৌহ শলাকাটি তাহার উপর আড়াআড়িভাবে রাখিতে হইবে। দুইটি পা দুইদিকে বাঁশের উপর রাখিয়া চালনা করিতে হইবে। এই উপায়ে বীজ ছাড়ানো অভ্যাস সাপেক্ষ। সেজন্য অভ্যাস এবং দক্ষতানুযায়ী ৮ ঘণ্টায় ২১ হইতে ৪২ পাউণ্ড পর্যন্ত কার্পাসের বীজ ছাড়ানো যায়।

বীজ ছাড়াইবার আধুনিক পাটা

ইহা অন্ধ্র দেশের পাটার অনুকরণেই গঠিত। প্রভেদ শুধু আকারের তারতম্যে। নিজের হাতে নিজের প্রয়োজনীয় কার্পাসের বীজ ছাড়ানোর জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। কাষ্ঠখণ্ডটি একটি পিঁড়ির মত। ইহার মাপ ৮"× ৪", দুইটি পায়া ১"× ১"× ৮" এবং লৌহ শলাকা $\frac{3}{8}$" ইঞ্চি

ব্যাসের ১২" ইঞ্চি লম্বা। তকলির ন্যায় অবসর সময়ে গল্পগুজব করিতে করিতেও ইহা চালান যায়; আকারে ছোট বলিয়া সঙ্গে লইয়া চলাও সহজ।

কার্পাসকে সূতা কাটিবার উপযোগী করা

আমরা গাছ হইতে প্রথমে কার্পাস সংগ্রহ করি। তারপর পাতা, বোঁটা ইত্যাদি আবর্জনা হাতে করিয়া পরিষ্কার করি। পরে বীজ ছাড়াইয়া তূলা পৃথক করি। তূলাকে ধুনিয়া পাঁজের উপযুক্ত করা হয়। এই প্রকরণগুলিকে সংক্ষেপে বলা যায়, যথা (ক) গাছ হইতে কার্পাস সংগ্রহ (খ) বীজ ছাড়ানো ও (গ) তূলা ধুনা।

বীজ ছাড়ানোর বিভিন্ন প্রথা সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। তূলা ধুনিবার জন্যও বহু প্রকার ধুন্‌কী দেশের স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইত, এখনও হয়।

পিঞ্জন বা ধুন্‌কী

বাংলা ভাষায় তূলা ধুনিবার ধনুকাকৃতি যন্ত্রকে পিঞ্জন, ধুন্‌কী, ধনুখা, ধনুখারা, ধুন্‌চি ধুনাচি এবং যে তূলা ধুনে তাহাকে ধুন্‌কর বলা হয়। পিঞ্জনকে স্থানে স্থানে কাম্প্‌তা বলা হয়। পিঞ্জন চালাইবার জন্য একটি কাঠের হাতল প্রয়োজন হয়। এই হাতল 'তুন্দুর', 'গুটিলা' প্রভৃতি একাধিক নামে দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিচিত।

বারদৌলী পিঞ্জন* :— এই যন্ত্র চরকারই ন্যায় অত্যন্ত যত্নের সহিত খাটান ও ব্যবহার করা আবশ্যক।

একগজ একখণ্ড বাঁশের মাথায় দুই টুকরা তক্তা চিত্রানুরূপ কাটিয়া বসান

---

* বারদৌলী পিঞ্জনের বর্ণনা শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের "চরকার ব্যবহার" নামক পুস্তিকা হইতে গৃহীত।
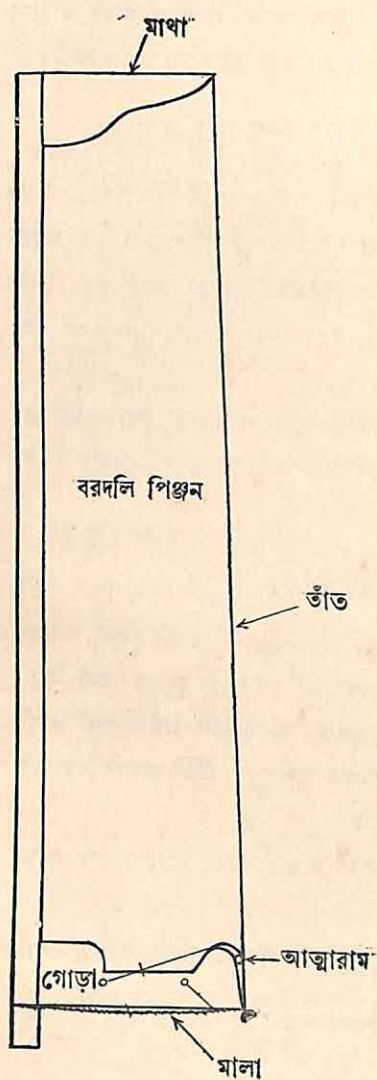
বারদৌলী পিঞ্জন

আছে। উহার মাথার উপর দিয়া তাঁত আসিয়া এক গুচ্ছ তুলা বাঁধা প্রান্তে শেষ হইয়াছে। গোড়ার দিকে এক টুকরা মালার মত তাঁত লাগান আছে। উহাতে ঐ তূলার গুচ্ছ পরাইয়া টানিয়া তাঁত চড়াইতে হয়। একখণ্ড কাঁচা চামড়া গোড়ার এক প্রান্তে বাঁধা আছে ও অপর প্রান্তে মালার ভিতর একখণ্ড কাঠি দ্বারা মোড়ন দিয়া টান করিবার ব্যবস্থা আছে। চামড়ার নীচে একটি পুঁটুলী পরান হয় যাহা তাঁত কেবল ছুঁইয়া যায়। ঐ পুঁটুলীটি (আত্মারাম) একটু আগু পিছু করিয়া দেখিতে হইবে কোন অবস্থায় তাঁতে ঘা দিলে ঠিক আওয়াজটি বাহির হয়। যতক্ষণ না এই আওয়াজ বাহির হইবে জানিবে যে ততক্ষণ বাঁধা ঠিক হয় নাই। চিত্রে আত্মারামের স্থান দেখান হইয়াছে।

তাঁতের এক প্রান্ত বাঁশের উপর ধরিয়া জড়াইবে ও মাথার উপর দিয়া অপর প্রান্তে তুলার ঝুঁটি বাঁধিবে।

বাঁশের উপর অতিরিক্ত সূতা জড়ান থাকে। বাঁশের উপর মারা চামড়া যে স্থানে শেষ হইয়াছে তাহার নিম্নে গায় গায় তাঁত জড়াইবে। যেমন রিলের উপর সূতা জড়ান থাকে তেমনি; ইহা না করিলে লম্বা প্যাচে জড়াইলে তুন্দুরের টানে তাঁত একটু একটু খুলিয়া ঢিলা হইয়া যাইবে। পাশাপাশি জড়াইলে খুলিয়া আসিতে পারে না। তাঁত চড়াইবার সময় মাপ ঠিক করিবার জন্য ডান হাতে তুলার ঝুঁটি ধরিবে ও বাম হাতে জড়ান তাঁত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আলগা দিবে। ঝুঁটি যখন আত্মারামের নিকট পৌছিবে তখন ঝুঁটি ধরিয়া রাখিয়া বাঁ হাতে জড়ান তাঁত মোড়াইয়া টান করিবার চেষ্টা করিবে, পরে ঝুঁটি গোড়ার তাঁতের মালায় পরাইয়া টানিয়া
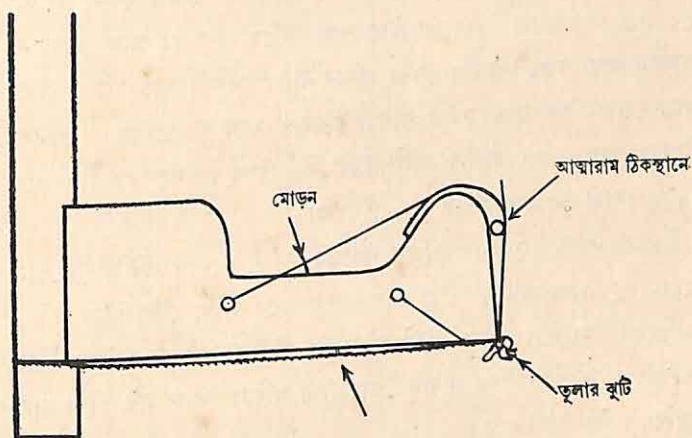
আত্মারামের অবস্থান দেখান হইয়াছে

চড়াইবে। মালায় মোড়ন দিয়া তাঁত আরও বেশী টান করিবে। এই মোড়ন কম বেশী করিয়া ও আত্মারাম চড়াইয়া তাঁত হইতে ঠিক আওয়াজ বাহির করিবে। আত্মারামের উপরিস্থিত চামড়া সর্বদা খুব টান রাখিবে।

তজ্জন্য চামড়ার ভাঁজ ছোট করিবার এবং মোড়ন দিবার ব্যবস্থা আছে। আত্মারামের ব্যাস ছোট বড় করিয়াও আওয়াজ ঠিক করা দরকার হয়। আত্মারামটি গোড়া হইতে দূরে থাকিবে। কিন্তু একেবারে প্রান্তে যেখানে তক্তা গোল হইতে আরম্ভ হইযাছে তত দূরে থাকিবে না। গোলের উপর আত্মারাম রাখিয়া আওয়াজ বাহির করিলে আত্মারাম সরিয়া যাইতে পারে। এমন স্থলে উহার ব্যাস কমাইলে আবার গোলপ্রান্ত হইতে দূরে সরিয়াই বাঞ্ছিত আওয়াজ দিবে। চিত্রে আত্মারাম দেখান হইতেছে।

বারদৌলী পিঞ্জন একটি বাদ্য যন্ত্রের ন্যায়। বেহালা কি সেতারের তারে গেরো দিয়ে যেমন বাজান যায় না, ঢাকের চামড়ায় তালি দিলে যেমন চলে না তেমনি পিঞ্জনের তাঁতে গেরো দিয়াও ধোনা যায় না। গেরো কেন, তাঁতের কোনও অংশে যদি তুলা জড়াইয়া শক্ত ঢিবির মত হয় আর তাহা না ছাড়ান যায় তাহা হইলেও ধোনা চলিবে না। ৩ গজ তাঁত যদি একবারে ধনুকে চড়ান হয় তাহাতেই ৫ বার ছিঁড়িলেও বদল করা যাইবে। কেননা ইহা আন্দাজ করা হয় যে প্রতিবারেই কিছু তাঁত ধনুকের আগার অংশে ছিঁড়িয়া পুরা এক গজ তাঁতই বাদ যাইবে না।

প্রথম তাঁত চড়াইয়া দেখিবে তাঁতের আঁশ কোন দিকে। কোন গাছের খুব নরম বাকল লইয়া তাঁতের যে দিকে আঁশ সেই দিকে চাপিয়া মাজিবে। মাজিবার সময় দুইদিকে অর্থাৎ উঠিতে নামিতে আঁশের দিকে ও তাহার বিপরীত দিক সমান জোর দিয়া ঘষিলে তাঁত নষ্ট হইয়া যায়, খস্‌খসে আঁশ উঠিয়া পড়ে।

মাজিবার উদ্দেশ্য তাঁত পালিশ ও মসৃণ করা, উল্টা ঘষায় উদ্দেশ্য বিফল হয় এবং যে আঁশ জাগিয়া উঠে তাহাতে তুলা জড়ায়। ঐ প্রকার উল্টা আঁশ দেখা দিলে যত্ন করিয়া মাজিয়া যাহাতে আঁশ বসিয়া যায় সে চেষ্টা করিবে। গাছের বাকল যদি নরম ও ভিজা না হয়, তাহাতে

যদি শক্ত পরদা বা কাঠের অংশ থাকে তবে তাঁত নষ্ট হইবে। মাজার পর ২।৩ মিনিট পিঞ্জন খানা রৌদ্রে রাখিলে উপযোগী হইবে।

তাঁত সহজে ছিঁড়েনা। ৫।৭ সের সূতা ধুনিলেও তাঁত ছিঁড়িবার কথা নয়। তাঁত ছিড়িবার অনেক কারণ আছে। যদি তাঁত চড়ান ঠিক না হয় তবে তূলা জড়াইয়া যায়। তূলা না জড়াইলেও আওয়াজ ঠিক না হইলে তাঁত ছিঁড়িবে। যদি বেশী তূলা ধুনিবার জন্য তাঁতে ধরান হয় তবে তাঁত ছিঁড়িবে। যদি তুন্দুর দ্বারা উপর হইতে নিম্নদিকে ঘা না দিয়া হেঁচকা টান দেওয়া হয় তবে তাঁত খস্‌খসে হয় এবং ছিঁড়ে। তুন্দুরের ওজন কম বেশী হইলে এবং উহার মাথায় পিটাইবার অংশের ভাঁজ ঠিক না হইলেও তাঁত ছিঁড়িবে। তুন্দুরের বিষয় পরে বলা হইয়াছে।

তাঁত ছিঁড়িলে গেরো দিবে না। যে অংশ ছিঁড়িয়াছে তাহা বাদ দিয়া নূতন তূলার ঝুটি বাঁধিয়া লইবে। তাঁতে গেরো দিয়া ধুনিতে চেষ্টা করা অন্যায়।

তাঁতগুলি গোরু বা মহিষাদির অন্ত্র হইতে প্রস্তুত। সদ্যমৃত জন্তুর অন্ত্র জলে পরিষ্কার করিয়া সূতলীর মত করিয়া পাকাইয়া লওয়া হয়। পরে রৌদ্রে শুকান হয়। এই জিনিষ শুষ্ক অবস্থায় যেমন টান সহে এবং স্থিতিস্থাপক হয় ভিজিলে তেমনি নরম ও গলিয়া যাইবার মত হয়। শীতের সকালে কুয়াশায় বসিয়া ধুনিতে চেষ্টা করিলে যেমন তূলা নষ্ট হইবে তেমনি তাঁত নষ্ট হইবারও সম্ভাবনা। যাহাতে তাঁতে ভিজা হাওয়া, জলের ছাট না লাগে সে চেষ্টা করিবে। তাঁতের ৪।৫ ইঞ্চি একটা টুক্‌রা জলে ভিজাইয়া পরে দেখিবে কি জিনিষ ও কেমন করিয়া তৈরী। তাঁত জান্তব পদার্থ বলিয়া কুকুর, বিড়াল, ইন্দুঁরের অত্যন্ত প্রিয়। ইহারা যাহাতে তাঁত নষ্ট না করে দেখিবে। ধনুকে চড়ান তাঁত ইন্দুর কাটিয়াছে, কুকুরে ছিঁড়িয়াছে ইহা প্রায়ই দেখা যায়। ধনুকের কাঁচা চামড়াও কুকুর চিবাইয়া

নষ্ট করে। পাড়াগাঁয়ে গৃহে কাপড় রাখিবার বাঁশ (আলনা) যেমন সরার মধ্য হইতে ঝুলাইয়া ইন্দুর আসা বন্ধ করে, পিঞ্জনটিও সেই প্রকারে সরার মধ্য হইতে ঝুলাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। ঐ প্রকার ঝুলাইয়া রাখিলে ছেলেপুলেও জিনিষটি নষ্ট করিতে পারে না।

তুন্দুর

তুন্দুরটি ঠিকমত না হইলেও কাজ ভাল হইবে না, ঠিক তুন্দুর কি তাহা বুঝিতে শিখিবে। যে তুন্দুরের ওজন চারি তোলা এবং যাহা ধুনিবার সময় বেশি পিছলায় না এবং টানে না তাহাই ঠিক তুন্দুর। তুন্দুরের ঘর্ষণ
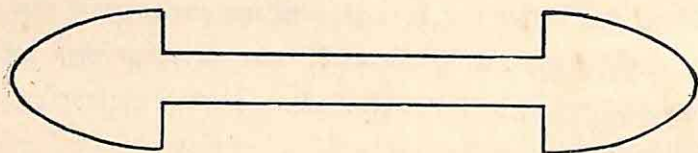
তুন্দুর

কোণটি এক সমকোণ হওয়া চাই, কম না হয়। গোড়ার দিকে তুন্দুর দ্বারা মারিবে আর মাথার দিকে তূলা লাগাইবে ও ধুনিবে। ধুনিবার সময় জোড়াসন হইয়া বসিবে, পরে ধনুক বাম হাতে ধরিয়া বাঁ হাঁটু উঁচু করিয়া তাহার উপর বাঁ হাতের কনুইয়ের ভার রাখিবে। বাম হাত সোজা থাকা চাই। একটি ডগা সরু এক গজ লম্বা কাঠি রাখিবে, তাহা দ্বারা তূলা একত্র করিবে ও পাল্টাইবে।

তূলা ময়লা হইলে বানা ব্যবহার করিবে। মাছ ধরিবার জন্য ফাঁক ফাঁক বাঁশের কাঠির মাদুরকে বানা বলে। বানার উপর রাখিয়া ধুনিলে ময়লা ফাঁকে ফাঁকে গলিয়া বাহির হইয়া যায়। ধুনিবার সময় সিকি তোলা মাত্র তূলা এক একবারে ধনুকে ধরাইবে।

ধুনিবার সময় বেশ লক্ষ্য রাখিবে যে ধোনা তূলায় গুটী না থাকে। একবার পিঁজিতে আরম্ভ করিলে আর হাত দ্বারা তূলা স্পর্শ করিবে না। কাঠি দ্বারা স্পর্শ করিবে। পেঁজা তুলা ফেলিয়া রাখিবে না, হাওয়া লাগিলে নষ্ট হয়। যেমন যেমন ধোনা হয় তেমনি পাঁজ করিবে।

পাঁজ কাঠি ৭ ইঞ্চি লম্বা আধ ইঞ্চি মোটা হওয়া চাই। একদিকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া আসিবে।
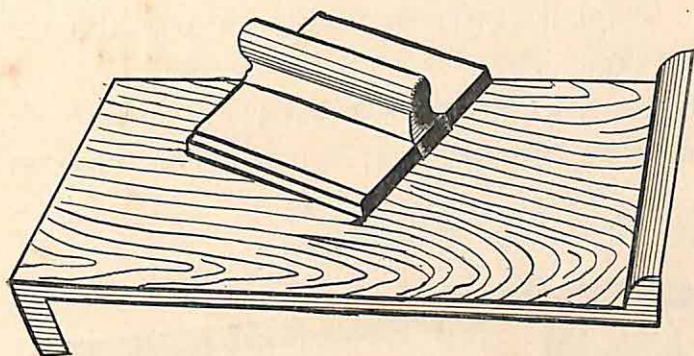
পাঁজপিড় ও চাপা দিবার হাত পাটা

তূলা পাঁজ কাঠিতে তুলিয়া লইয়া মসৃণ পিড়ার* উপর ফেলিবে। হাত দিয়া চাপিবে না, কেবল সমান করিয়া বিছাইবে। পরে পাঁজ কাঠির দুই প্রান্ত চাপিয়া জড়াইবে। অল্প চাপা পাঁজ সহজে সূতা ছাড়ে। পাঁজগুলি ন্যাকড়ায় জড়াইয়া বারকোসে তুলিয়া রাখিবে। কোনও প্রকার চাপ না লাগে।*

অন্ধ্র দেশীয় ধুন্‌কী :—তিন পায়ের দুই দাঁতযুক্ত বাঁশের ধুন্‌কী। অন্ধ্র দেশের মিহি সূতার তূলা ধুনিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

---

* পাঁজ তৈরি করিবার পাটাকে পাঁজপিড়িও বলা হইয়া থাকে।

ধুন্‌কী বা কাম্প্‌তা ঃ—বাঁশের ধনুক। ইহাতে তাঁতের বদলে মুঞ্জঘাসের রশি ব্যবহার করা হয়। ইহা হাতের অঙ্গুলি দ্বারা চালনা করা হয়। উৎকৃষ্ট তূলা ৮ ঘণ্টায় ৮ তোলা, সাধারণ তূলা ৪০ তোলা পরিমিত ধুনা যায়। ভাগলপুর অঞ্চলে ইহা প্রচলিত।

ধুন্‌কী ঃ—সবরমতী আশ্রমে আধুনিক ধুন্‌কী প্রবর্তনের পূর্বে ইহা ব্যবহৃত হইত। পাঁচ পাকের তাঁত ইহাতে আছে।

কাম্প্‌তা, বাংলা ধুন্‌কী ঃ—ইহাতে তাঁতের বদলে মধ্যস্থানে ঘাসের সূতা ব্যবহৃত হয়।

মধ্যম পিঞ্জন ঃ—ইহা বর্তমানে উৎকৃষ্টতম ধুন্‌কী বলিয়া বিবেচিত এবং সারা ভারতে ইহার প্রচলন আছে। ইহা চালাইবার জন্য কাঠের হাতল (তুন্দুর) প্রয়োজন।
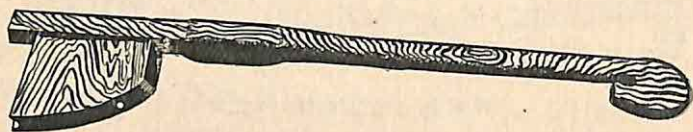
যুদ্ধ পিঞ্জন

যুদ্ধ পিঞ্জন ঃ—মধ্যম পিঞ্জনের আকারেই গঠিত। কেবল ইহা আকারে ছোট মাত্র। ইহাতে কাঠের হাতল (তুন্দুর) দ্বারা তাঁতে ঘা দিতে হয়।

মন্তব্য—উপরে যে সকল পিঞ্জনের বর্ণনা দেওয়া হইল, তন্মধ্যে শেষোক্ত দুইটি মান (standard) পিঞ্জন হিসাবে গণ্য। কিন্তু নিজের ব্যবহারের সামান্য তূলা ধুনিবার জন্য বাঁশের ছোট ধনুকের চলন আছে। অল্পায়াসে এবং অল্প খরচে সকলেই ইহা তৈরি করিতে পারেন। সেজন্য বিদ্যালয়ে বাঁশের ধনুক ব্যবহার্য।

ধুনা তূলার জন্য চালুনি

তূলা ধুনিবার প্রধান উদ্দেশ্য আঁশগুলিকে সমানভাবে পৃথক্ করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, ধুনিবার কালে বিজাতীয় জিনিষ, যথা—মরা আঁশ অপক্ক আঁশ, ধূলাবালি ও অন্যান্য আবর্জনা পৃথক্ হইয়া যায়। এই বিজাতীয় আবর্জনারাশি যাহাতে ধুনা তূলা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া যায় সেজন্য ছিদ্রযুক্ত একটি চালুনির উপর তূলা ধুনিতে হয়। চালুনির ফাঁকে ধূলাবালি ইত্যাদি আপনা হইতেই নীচে পড়িয়া যায়।

চালুনিটির আয়তন দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৪´×৩´ হইলেই চলে। বাঁশের শলাকা দ্বারা চিকের ন্যায় অতি সহজে ইহা তৈরি করিয়া লওয়া যায় অথবা বাঁশের পাতলা চটির দ্বারা বুনিয়াও লওয়া যায়। শেষোক্ত স্থলে বাঁশের উপরি-ভাগের চটি হইলেই টিকসই হয়। সর্বদাই বুনা চালুনির চারিদিক মুড়িয়া দেওয়া প্রয়োজন। নতুবা ব্যবহারের সময় চটি এক একটি করিয়া খুলিয়া গিয়া ক্রমে অব্যবহার্য হইয়া পড়িবে।

চিক চালুনি ঃ—চিক চালুনির বাঁশের শলাকা ⅛" ব্যাসের ৪´ ফুট লম্বা হওয়া প্রয়োজন।

বাঁশের চটির চালুনি ঃ—¼" ইঞ্চি মাপের ৫´ ফুট লম্বা একরকমের পাতলা বাঁশের চটি তৈয়ার করিয়া পরে বুনিয়া লইতে হয়। ইহাতে ⅛" ইঞ্চি ফাঁক থাকা প্রয়োজন।

অন্যপ্রকার চালুনি ঃ—চালুনির কাজ হইতে পারে তেমন তারের জালে ফ্রেম লাগাইয়া লইলে উত্তম ও স্থায়ী চালুনি হইতে পারে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাপেক্ষ।

লপেটা, নাটাই

বাংলা ভাষায় নাটাই শব্দের প্রচলন আছে। কিন্তু লপেটা খুব সম্ভবতঃ

নাই ; ইহার বদলে নাটাই শব্দটা ব্যবহৃত হয়। এদেশে বিভিন্ন আকারের নাটাই ব্যবহৃত হইত। সূতা গুটাইবার জন্য সাধারণ কাটুনিগণ স্বভাব-

দেশের বিভিন্ন স্থানের লপেটার দৃশ্য। নীচের সারিতে বাম হইতে (১) বাঁশের পরাণী বা আটেরন ঃ কেরল চরকা সঙ্ঘ, কুট্টারম, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত হইত। (২) তক্‌লি লপেটা ঃ তিন টুকরা কাঠের ফালির দ্বারা ⌶ এই আকারে তৈরী। অখিলভারত চরকা-সঙ্ঘের মীরাট শাখায় প্রচলিত ছিল। (৩, ৪ ও ৫) আধুনিক লপেটার প্রথম অবস্থা। ৩ নংটি মীরাট গান্ধী-আশ্রমে রূপ লইয়াছিল। (৬) ত্রিপুরার অন্তর্গত বড়কান্তা কেন্দ্রে এইরূপ নাটাই এক সময়ে ব্যবহৃত হইত। (৭) তিরুপুর, তামিনাদ প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত ৪ আকারের প্রাচীন ধরণের লপেটা। সম্ভবত ইহা আধুনিক লাপটার পথ প্রদর্শক। উপরের সারিতে বাম হইতে (১) ইহা নীচের সারির ২নং লপেটার অনুরূপ। (২) বাঁশের ফাল্‌কা ঃ খুলনা জেলার (অধুনা পাকিস্তান) দামোদর খাদি কেন্দ্রে চলতি ছিল। (৩) পরেতা ঃ এইরূপ লপেটা পাটনা, কটক প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত হইত। (৪) ফাল্‌কা ঃ এই ধরণের লপেটা বিহারের মধুবনী দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত হইত।
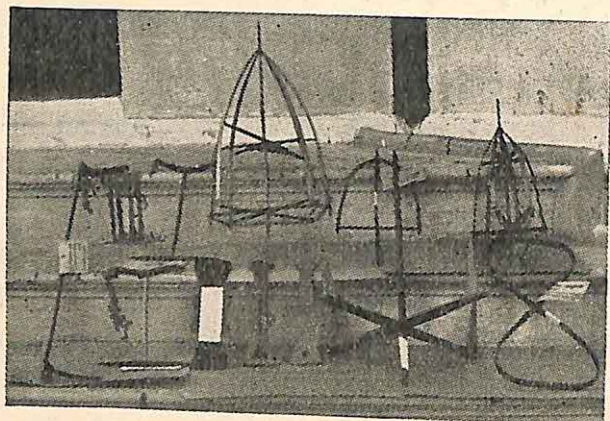
জাত বিভিন্ন দ্রব্যকে এই কাজে লাগাইত, এরূপ প্রমাণ আছে। কঞ্চি, বাঁশের লপেটা ইহার এক দৃষ্টান্ত। মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে এখন

সকল বস্তুই সকলের ব্যবহারযোগ্য মান (standard)-এ পরিণত হইয়াছে। আধুনিক চরকা, যথা—কিষাণ ও যারবেদা ইহার প্রমাণ। সেরূপ লপেটাও ক্রমে প্রমাণ লপেটায় পরিণত হইয়াছে। চরকা তকলির ক্রমোন্নতির সঙ্গে এই লপেটারও অনেক বিবর্তন ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তকলি-লপেটার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আধুনিক রূপ লইবার পূর্বে অন্য অনেক আকারের লপেটা প্রস্তুত হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছিল। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে আধুনিক তকলি লপেটাই প্রমাণ পরিমাণের লপেটা বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে।

প্রাচীন নাটাইয়ের আকার

নাটাই :—দামোদর, জিলা খুলনা, (পূর্বপাকিস্থান)। বাঁশের তৈরী, ইহা মোচার ন্যায়, মধ্যস্থলে অক্ষ।

নাটাই :—মধুবনী, জিলা দ্বারভাঙ্গা, বিহার। ইহাও পূর্বোক্ত নাটাইয়ের মতোই, তবে অপেক্ষাকৃত ছোট।

নাটাই :—ইহা বাঁশের তৈরি, আকারে ৪-এর মত। ইহা প্রাচীন কালের, হয়ত বা আধুনিক তকলি-লপেটার অগ্রদূত। স্থান তিরুপুর, তামিলনাদ, দাক্ষিণাত্য।

নাটাই :—বড়কান্তা, জিলা ত্রিপুরা। ইহার বেড় ৪½ ফুট।

লাপেটা :—প্রাচীনকালের বাঁশের লাপেটা। স্থান কোট্টারাম, কেরল।

মীরাট লাপেটা :— ⌶ এই আকারে তিন টুকরা কাঠে তৈরী। ইহা বাঁশের তৈরী। স্থান—ইন্দু পাটনা, উৎকল (কটক)।

আধুনিক লপেটার বিবর্তন :—আধুনিক চরকার সঙ্গে আধুনিক নাটাইয়ের যোগ ঘনিষ্ঠ। আধুনিক চরকায় আড়াআড়ি দুই কাঠের নাটাই ব্যবহৃত হয়। ইহার জোড়ের স্থানে (মধ্যস্থানে) একটি গর্ত থাকে। গতিচক্রে বসাইয়া দ্রুত সূতা গুটান যায়। যারবেদা চরকায় ৩′ ফুট পরিধির নাটাই

ব্যবহৃত হইত। কিন্তু আধুনিক সর্বভারতীয় মানের মাপ "তার" হিসাবে ৪′ ফুট পরিধি বিশিষ্ট নাটাই ব্যবহারের প্রথা শুরু হইয়াছে। ১/২″ × ১″ × ১৭″ ইঞ্চি মাপের দুইটি টুকরা কাঠের মধ্যস্থলে আড়াআড়ি সমকোণে খাঁজ কাটিয়া জোড়া দিতে হয়। কাঠের চতুষ্প্রান্তে খাড়াদণ্ড বসাইলে ৪′ ফুট ঘেরের নাটাই হয়।

ধনুষ চরকায় তক্‌লি হইতে সরাসরি সূতা গুটাইবার অনুরূপ ব্যবস্থা আছে, তবে ইহার আকার অন্যরূপ। চরকা বা ধনুক তক্‌লির টেকো হইতে সহজে দ্রুত সুতা বাহির হয় কিন্তু তক্‌লির বেলায় টেকোর হুকের জন্য তাহা সম্ভব নয়, সে জন্য তক্‌লির লপেটা পৃথক্ ধরনে তৈরী হয়।

সূতা কাটার যন্ত্রের ব্যবহার

নূতন শিক্ষার্থীই হউন আর শিক্ষকই হউন, সূতা কাটিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে গোড়া হইতেই সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। পদ্ধতির অঙ্গ :—
(ক) সূতা কাটিবার যন্ত্র (তক্‌লি, চরকা বা ধনুষ তক্‌লি, লপেটা ইত্যাদি) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যত প্রকার যন্ত্র মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে, প্রত্যেকটির মূলে একটি বিজ্ঞান রহিয়াছে, উদ্দেশ্য বিশেষ ধরনের যন্ত্র চালাইয়া বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট কাজ বা ফল পাওয়া। কারণ প্রত্যেক যন্ত্র বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত। ইহা জ্ঞাত না থাকিলে যন্ত্রের অপব্যবহার হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। ফলে যন্ত্র বিকল ও স্বল্পায়ু হওয়ার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। নৈতিক ও আর্থিক উভয় দিক হইতে এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। যাঁহারা ঘরে বসিয়া সূতা কাটিয়া উপযুক্ত ফল লাভ করিতে চান তাঁহাদিগের উচিত নিজের যন্ত্রটির ব্যবহার-প্রণালী উত্তমরূপে জানিয়া লওয়া। যাঁহারা শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপৃত, তাঁহাদিগের প্রধান কর্তব্য শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া। একাধিক শিক্ষার্থী থাকিলে প্রথমে

নিজে যন্ত্রটি সম্পূর্ণ ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত। পরে প্রত্যেককে ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ ব্যবহার-প্রণালী নিজ নিজ হাতে করিতে দেওয়া প্রয়োজন। ইহা এই ভাবে হইতে পারে। (১) আসনভঙ্গী। (২) যথাস্থানে যন্ত্রস্থাপন। (৩) যন্ত্র ব্যবহার করন। (৪) যন্ত্রের কোনে প্রকার বিকৃতি ঘটিলে তাহার কারণ প্রদর্শন।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পচর্চার অভ্যাস

প্রাথমিক অভ্যাস ঃ—প্রাথমিক অভ্যাস ঠিক না হইলে অথবা অবৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যবহারে অভ্যস্ত হইলে ইহার পরিণাম সকল দিক দিয়াই শোচনীয় হয়। ইহাতে সময়, শক্তি, যন্ত্রের ঘন ঘন বিকৃতি ও জিনিষের অপচয় ঘটে। এসকল অপেক্ষা বড় ক্ষতির কারণ—অকৃতকার্য হওয়ার ফলস্বরূপ আত্ম-বিক্ষোভ, গ্লানি ও ইহাদের চরম পরিণতি-কাজে বিতৃষ্ণা। ইহা যাহাতে কোনো স্বাভাবিক শিক্ষার্থীর বেলায় না ঘটে সেজন্য শিক্ষকের সর্বদাই সচেতন থাকা প্রয়োজন। বস্তুতঃ উপযুক্ত সময়মধ্যে শিক্ষার্থীর উপযুক্ত কৃতকার্যতা লাভ শিক্ষকের চরম পুরস্কার।

যে কোন শিল্পই হউক না কেন, ইচ্ছানুরূপ বা পরিকল্পনানুযায়ী রূপ দিবার জন্য আমরা উপযুক্ত যন্ত্রের আশ্রয় লই। যন্ত্র আমাদের চোখ, মস্তিষ্ক ও হাতের পেশীর সঙ্গে একযোগে কাজ করে। মস্তিষ্কে ব্যক্তির পরিকল্পনাটি থাকে, পরিকল্পনানুযায়ী হাত কাজ করিতেছে কি না চোখ সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এই তিনের পূর্ণঐক্য ঘটিলেই কাজে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়। ঐ ঐক্য সাধনে কানের কাজও কম নয়। যন্ত্র ব্যবহার কালে যে শব্দ উত্থিত হয় তাহা ঠিক কি বেঠিক কানই তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ। কাজে হাতটিকে মাথা ও চোখের অনুগত করিতে পারিলেই শিল্প রচনায় উত্তম ফল পাওয়া যায়। প্রত্যেক মানুষের জীবনে ইহা চরম কাজ। মানুষের

পরিপূর্ণতা অর্থাৎ শক্তিবিকাশের চরম উৎকর্ষের সূত্রপাত এই ঐক্যের সাধনায়; শিল্পমাত্রেই পারদর্শিতা লাভের ইহাই পথ। কাজেই দেখিতে হইবে যে কোন্ কাজে কি প্রণালীতে কোন্ কোন্ অঙ্গুলি দ্বারা যন্ত্র চালনা করিতে হইবে। এই প্রাথমিক বিষয়ে একটিও ভুল থাকিলে কাজে যেমন উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না, তেমনি আবার ভুল অভ্যাস শোধরান পরে আরও কঠিন হয়। কারণ হাতের, স্নায়ুর, চোখের ও পেশীর কোনো ভুল অভ্যাস হইয়া গেলে, পরে তাহা সঠিক পথে চালনা করা কত কঠিন, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। মস্তিষ্কের অর্থাৎ চিন্তাশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির চালনা না করিয়াও মানুষ শুধু অনুকরণ করিয়া যন্ত্রের ন্যায় কাজ করিতে পারে, কিন্তু ইহাতে বুদ্ধির বিকাশ হইতে পারে না। অবশ্য অনুকরণ করিতেও বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয় লইতে হয় কিন্তু তাহা পরকীয় বুদ্ধি। স্বকীয় বুদ্ধি প্রয়োগ না করিয়া শুধু অনুকরণ দ্বারা কাজকে নিজের করিয়া লওয়া যায় না। অনুকরণে যতটুকু পাওয়া যায় তদতিরিক্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। নূতন কিছু করা দূরের কথা। হস্তচালনার দক্ষতার সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির যোগ গভীর। ইহা আজ শিক্ষাবিদ মাত্রেরই নিকট স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সেজন্য হাতের কাজকে শিক্ষাদানের বাহন করিবার প্রচেষ্টা সর্বদেশেই চলিয়াছে। উপরে যাহা বলা হইল, তাহা সকল প্রকার শিল্পজ্ঞান অর্জন করার পক্ষেই প্রযোজ্য।

সূতাকাটা শিক্ষার সঙ্গে উপরোক্ত রীতি-নীতির যোগাযোগ কি, তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। আমি বহু কাটুনির সংশ্রবে আসিয়াছি। এক কাটুনি দিনে ৭।৮ ঘণ্টা সূতা কাটিত। সূতা কাটাই ছিল তাহার পেশা এবং ইহার দ্বারা সে জীবিকার্জন করিত। খাদি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় আমি তখন কয়েকটি কাটুনিকে সূতা কাটায় নিয়োগ করিয়াছিলাম। কাটুনি নির্বাচন করিতে গিয়াই প্রথম দেখিলাম যে যন্ত্রচালিতের মত অনুকরণপ্রিয়

কাটুনির সঙ্গে সক্রিয় বুদ্ধিযুক্ত কাটুনির প্রভেদ কত গভীর। প্রথমোক্ত সম্বন্ধেই প্রথমে বলিতেছিঃ আমি তাহাকে আমার যারবেদা চরকায় সূতা কাটিতে দিলাম। উৎকৃষ্ট স্থূর্তি কার্পাসের অতি যত্নে প্রস্তুত নিজের পাঁজ তাহাকে দিলাম। প্রথম ৫ মিনিট কাটিবার কালে সে আমার তূলা ও পাঁজের খুব প্রশংসা করিল। ছয় মিনিটের সময় পুরাতন মালটি ছিড়িয়া গেল। সে আবার নিজের হাতে একটি মাল তৈয়ারি করিয়া লইল। আমি ঘড়ি সম্মুখে রাখিয়া তাহার সূতা কাটা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম, এবারে সে এক ঘণ্টা সূতা কাটিল। কিন্তু এই সময় মধ্যে সে ৪৫ বার সূতা ছিঁড়িয়াছিল। সূতা এত ঘন ঘন ছিঁড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে আমার চরকা নূতন ও ভারী বলিয়া দোষটি যন্ত্রের ঘাড়ে চাপাইয়া দিল। আমি বারংবার যন্ত্রের গলদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াও যথাযথ কোনো উত্তর পাইলাম না। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, মালের গাঁটটি টেকোর গায়ে লাগিবার ফলে বিশেষ করিয়া সূতা গুটাইবার বেলায়ই সূতা ছিঁড়ে এবং অতিরিক্ত মোটা গাঁটটি যে সেজন্য প্রধান ভাবে দায়ী—সে বিষয়ে কোনো সংশয় ছিল না। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, সে ঘরে সাধারণতঃ রোজিয়া তূলার পাঁজ ব্যবহার করে। এবং ১৬ নং সূতার উপর কখনও কাটে না। এবার সে কাটিয়াছিল ২২ নং-এর সূতা। কাজেই তাহার এত ঘন সূতা ছেঁড়ার কারণস্বরূপ আমি নোট করিলাম:—(১) মালের অতিরিক্ত মোটা গাঁট (২) নূতন চরকা (৩) বিজাতীয় উৎকৃষ্ট তূলার পাঁজ (৪) মিহি সূতা।

কাটুনি আপন ঘরে ঘড়ি চরকা* চালাইত। আমি তাহাকে নিজের চরকায়

---

* আচার্য বিনোবা বাহে এই চরকা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বর্দ্ধা অঞ্চলে বহু কাটুনি কএ সময়ে এই চরকা ব্যবহার করিত।

সুতা কাটিয়া দেখাইতে বলিলে সে আমাকে তাহার ঘরে নিমন্ত্রণ করিল। একদিন আমি তাহার বাড়ীতে গেলাম। সে নিজ হস্তে প্রস্তুত রোজিয়ার পাঁজে নিজের ঘড়ি চরকায় আধঘণ্টা সূতা কাটিল। এবার সূতা ছেঁড়ার সংখ্যা ১২। আমি লক্ষ্য করিলাম যে এবারেও মালের গাঁটটি বিশেষ ভাবে দায়ী। কিন্তু কাটুনির লক্ষ্য ইহাতে নিবদ্ধ হয় নাই। তাহার পক্ষে সূতা ছেঁড়া একটি সাধারণ ব্যাপার। যেন এরূপ হইয়াই থাকে। দীর্ঘ ৪।৫ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে তাহার সূতা বেশ সম আকারে দাঁড়াইয়াছিল। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দেওয়া যায়। এক সময়ে আমি প্রায় ৩০ জন কাটুনির সঙ্গে দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূতা কাটিতাম। তখন বিভিন্ন কাটুনির যন্ত্র হইতে উত্থিত শব্দের তারতম্যে এতখানি অভ্যস্থ হইয়াছিলাম যে, না দেখিয়াই বুঝিতে পারিতাম কার যন্ত্রে কি প্রকার গলদ ঘটিয়াছে। প্রতিটি গলদের নিজস্ব শব্দ আছে। অভ্যাসের ফলে শব্দ দ্বারাই যন্ত্রের গলদ অনুমান করা যায়। এ কথা প্রায় সকল শিল্পশিক্ষার বেলায় কম বেশী সত্য। যেমন ধরা যাক, কাঠের উপর করাত র্যাঁদা বা হাতুড়ি বাটালির কাজ। অভিজ্ঞ শিক্ষক এক্ষেত্রেও শব্দের বিকৃতি দ্বারা যন্ত্র চালনার দোষ বা যন্ত্রের দোষ অনায়াসে বুঝিতে পারেন। উৎকৃষ্ট সূতা কাটুনির পক্ষে প্রথমেই যন্ত্রটি ঠিক কাজ করিতেছে কিনা দেখিয়া যথারীতি সম গতিতে সূতা কাটা আরম্ভ করা উচিত। উপরে যে সকল ত্রুটির কথা উল্লেখ করা হইল, তাহা ছাড়া সকল কাটুনিরই উচিত, যন্ত্রে কোনো বিকৃতি ঘটিলেই সূতা কাটা বন্ধ করিয়া তাহা শোধরাইয়া লওয়া। না লইলে এক উপসর্গ হইতে বহুবিধ উপসর্গের সৃষ্টি হয়। ইহাতে যন্ত্রের ক্ষতি করে। চরকা বা ধনুষ তক্‌লির কথাই ধরা যাক। ইহাদের প্রত্যেকটিই একাধিক অংশের সমষ্টি। কোনো অংশ বিকল হইলে অন্য অংশও কমবেশী বিকলতা প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা। আর এক অংশের বিকলতা দূর না করিয়া সূতা কাটিয়া যাইতে থাকিলে

অন্য অংশের বৈকল্য ঘটাও অনিবার্য। কাজেই সূতা কাটা সম্বন্ধে আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে ঃ—

(ক) সূতা কাটার বিহিত প্রকরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

(খ) প্রাথমিক অভ্যাসগুলি সঠিক হওয়া প্রয়োজন।

(গ) যন্ত্রচালিতের ন্যায় যন্ত্র না চালাইয়া যন্ত্রের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যকারিতা ও যোগাযোগ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। কারণ, পূর্বে বলা হইয়াছে যে প্রত্যেকটি যন্ত্র বিশিষ্ট উপায়ে চালাইয়া সর্বোত্তম ফল পাওয়ার জন্যই তৈরি হইয়াছে। কাজেই যন্ত্রজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিলে এক ভুল শোধরাইতে গিয়া অন্য ভুল হওয়া স্বাভাবিক, কাজে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্ত প্রচেষ্টা সম্ভব নয়। ইহার ফল পূর্বেই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সময়, শক্তি, যন্ত্র ও দ্রব্যের অপব্যবহার এবং স্নায়ু ও পেশীর উপর খারাপ প্রতিক্রিয়া। উপরে যে যন্ত্র-ব্যবহার-প্রণালী বলা হইল, তাহা সকল শিল্পক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সাঁতার দিবার কৌশল না বুঝিয়া বা নীতির অনুশাসন না মানিয়া একা জলে গেলে সাঁতার শিক্ষা অপেক্ষা জলে ডুবিবার সম্ভাবনাই বেশী। অন্য পক্ষে সন্তরণ প্রকরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়া চেষ্টা করিলে অল্পসময়ের মধ্যে উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হয়। আর একবার জলে দেহ ভাসাইয়া রাখিবার কৌশল আয়ত্ত হইলে মানুষ কাত হইয়া, চিৎ হইয়া, ডুব দিয়া বহু প্রকারে নিজের সন্তরণ কৌশল দেখাইতে পারে। শিল্প-শিক্ষা-ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। মোট কথা এই যে শিল্পকাজে আত্ম-প্রকাশের প্রথম ও প্রধান ধাপ আত্ম-প্রকাশের কৌশলগুলি আয়ত্ত করা। শিক্ষকের কাজ কৌশলগুলিকে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি ও অভ্যাসগত করিতে সাহায্য করা। শিল্পচর্চার সঙ্গে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যোগাযোগ গভীর অর্থাৎ শারীরিক বিকাশও ইহাতে

হয়। সে জন্য এসম্পর্কে খুঁটি-নাটি তথ্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বোধগম্য হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। এই শেষোক্ত বিষয়েও সংস্কারমুক্ত হইয়া জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা চালিত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। সকলেই জানেন যে দেশী গ্রাম্য ছুতার বসিয়াই কাজ করে, র‍্যাঁদা করে ও করাত চালায়। কিন্তু যাঁহারা এ বিজ্ঞান লইয়া কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, ইহাতে কাজের ত্রুটিই বা কতটুকু ঘটে, শরীরের ক্ষতিই বা কতটুকু হয়। সে জন্য আমি এক স্থানে দাঁড়াইয়া কাজ করিবার জন্য বেঞ্চ করিয়াছিলাম, কিন্তু কর্তৃপক্ষের কেহ কেহ অনুমান করিলেন যে এও বিদেশী প্রথা, কাজেই পরিত্যাজ্য।

এ সম্বন্ধে সর্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন যে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেশী বিদেশী বলিয়া কিছু নাই। যাহা কল্যাণকর তাহা যে-কেহই আবিষ্কার করুক না কেন তাহা গ্রহণীয়, আর যাহা অকল্যাণকর তাহা সর্বদাই পরিত্যাজ্য।

সংস্কারমুক্ত হইতে পারিলেই কর্মে ও চিন্তায় প্রগতিশীল হওয়া যায়। প্রগতি মানুষের ধর্ম। প্রগতির পথ রুদ্ধ করিলে শিক্ষার উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করা হয়।

বিদ্যালয়ে সূতাকাটা ও আবহ

সূতা কাটার উপর আবহের প্রভাব

তূলা বা তূলার পাঁজ নিতান্ত কোমল জিনিষ। তূলার পাঁজ অগণিত পৃথক্ পৃথক্ আঁশের সমষ্টি। উত্তাপ আর্দ্রতা প্রভৃতি নৈসর্গিক শক্তির প্রভাবে ইহার অবস্থান্তর ঘটে। নৈসর্গিক প্রভাব কাটুনির অর্থাৎ মানুষের দেহ ও মনের উপরও সামান্য নহে। যে সকল নৈসর্গিক শক্তির প্রভাব সূতা কাটার প্রতিকূল, সেগুলি এড়াইয়া চলাই সূতা কাটার পক্ষে উৎকৃষ্ট পন্থা। বিশেষতঃ বিদ্যালয়ে সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া সূতা কাটার ব্যবস্থা ও সময় নির্দেশ করা উচিত। আমি যখন হইতে সূতাকাটা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন হইতে আমার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা যথাসম্ভব লিখিয়া রাখিতাম। সেই অভিজ্ঞতা শিক্ষকদের কাজে লাগিতে পারে মনে করিয়াই এ বিষয়ের অবতারণা।

আলো

সূতা কাটার স্থানে আলো থাকা প্রয়োজন। আলোর সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার বিবরণ দুই একটি দিতেছি।

বসন্তকালে আমরা অনেকে একটা বৃহৎ হলে বসিয়া সূতা কাটিতাম। হলে বেশ আলো আসিত। একদিন সূতা কাটিবার সময় সহসা বেগে হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিলে সন্মুখের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। পিছনের জানালা দুইটি খোলা ছিল। পাশের আলোতে আমার চোখ সূতার উপর ঝলসাইয়া যাইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত সূতা কাটিতেই

অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। পরে এ সম্বন্ধে নানা ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে সম্মুখের আলোই সূতাকাটার পক্ষে উৎকৃষ্ট।

ভারতের কোনো কোনো স্থানে গ্রীষ্মকালে গরম হাওয়া "লু" বয়। তখন সাধারণতঃ দরজা জানালা দিনের বেলায় বন্ধ করিয়া রাখা হয়। তখন ভোর বেলা সূতা কাটার পক্ষে প্রশস্ত সময়। ভালো আলোর ব্যবস্থা থাকিলে রাত্রিবেলাও সূতা কাটা যায়। দিনের বেলায় বন্ধ ঘরে সূতা কাটায় অসুবিধা আছে সত্য, কিন্তু আমি হাওয়ার বিপরীত দিকের বন্ধ দরজার ফাঁকের আলোতে বসিয়া স্বচ্ছন্দে সূতা কাটিয়াছি। ইহা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব কিন্তু ক্লাসের পক্ষে সম্ভব নয়।

বায়ু

নৈসর্গিক প্রতিকূলতার মধ্যে হাওয়ার বেগ সূতা কাটার একটি পরম শত্রু। বায়ু জোরে বহিলে সূতা কাটা সম্ভবই নয়। পরন্তু হাওয়ার গতির তারতম্যের উপর সূতা কাটার গতিও কমবেশী হয়। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বাড়ীতে গতিশীল হাওয়া এড়াইবার স্থান নির্দেশ করতঃ সূতা কাটা সহজ। সেজন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই, কিন্তু বিদ্যালয়ে ও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে,—যেখানে সম্বৎসর নির্দিষ্ট সময়ে দলে দলে শিক্ষার্থী বা কাটুনি বসিয়া সূতা কাটে সে ক্ষেত্রে বিহিত ব্যবস্থার প্রয়োজন। সে সব স্থলে কাঁচের জানালা থাকা সর্বাবস্থায় বিধেয়। তাহা হইলে হাওয়া বা বৃষ্টির সময়েও নির্বিবাদে সূতা কাটা সম্ভব।

শীত

আমরা অনেকে মিলিয়া একটা হলে বসিয়া সূতা কাটিতাম। শীত পড়িল, প্রভাত রৌদ্রালোকে সূতা কাটা স্থির হইল। আমি তখন তকলি

ব্যবহার করিতাম। শীত সেদিন হঠাৎ বেশী পড়িয়াছিল। তকলি হাতে লইয়া ইহাকে অঙ্গুলি দ্বারা চালনা করিতে গিয়া দেখি অঙ্গুলি আড়ষ্ট, কিছুতেই তক্‌লি যথারীতি ঘুরাইতে পারি না। ১৫।২০ মিনিট চেষ্টা করিবার পর অঙ্গুলির জড়তা অনেকটা কাটিয়াছিল। এরূপ অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই হইয়াছিল। চরকার বেলায় অবশ্য হাতল চালনায় শীতাধিক্য প্রতিকূল নহে। কারণ চরকার টেকোর গতি অঙ্গুলির উপর নির্ভর করে না, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অত্যধিক শীতে তূলার মোম জমাট বাঁধিয়া ভঙ্গপ্রবণ হয়।

উত্তাপ

উত্তাপের তারতম্য সূতা কাটার পক্ষে একটি বিশেষ ব্যাপার। পূর্বে বলিয়াছি যে, সূতার আঁশের গায়ে মোম থাকে, ইহা সূতা বাহির করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। কিন্তু ৬৮° ডিগ্রির কম উত্তাপে ইহা জমাট বাধিয়া থাকে, ফলে আঁশকে ভঙ্গুর করিয়া দেয়। শীতপ্রধান পার্বত্য স্থান ভিন্ন দেশের সর্বত্রই ৬৮° ডিগ্রির উপর উত্তাপ দিনের কোনো না কোনো সময় পাওয়া যায়। শীতকালে শীতপ্রধান আবহাওয়া হইলে দিনের উত্তাপাধিক্য-কাল সূতা কাটার জন্য নির্বাচন করা উচিত।

শুষ্ক বায়ুযুক্ত গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে প্রাতঃকাল বা শান্ত সন্ধ্যাকাল সূতা কাটার পক্ষে প্রশস্ত। স্থান কাল ভেদে উত্তাপ লক্ষ্য করিয়াই সূতা কাটার সময় নির্দিষ্ট করিতে হয়। শুষ্ক আবহাওয়া অপেক্ষা আর্দ্র আবহাওয়া সূতা কাটার পক্ষে প্রশস্ত, কিন্তু যেখানে ঘাম বেশী হয়, কাজ করিতে গেলেই হাত ঘামিয়া উঠে, সেই স্থানে অপেক্ষাকৃত শান্ত শীতল কালই সূতা কাটার পক্ষে প্রশস্ত। সেজন্য কাটুনিমাত্রেরই নিকট বর্ষাকাল অতি প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

নৈসর্গিক শক্তির প্রভাব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তদ্ভিন্ন পাঁজের

সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পাঁজে বায়ু প্রবেশ করিলে ফুলিয়া উঠে। গ্রীষ্মকালেই ইহা ঘটে। সেজন্য সর্বদাই পাঁজকে ভাল করিয়া মুড়িয়া রাখা প্রয়োজন। পাঁজ খোলা অবস্থায় কখনও ভূমিতে রাখিতে নাই; কারণ পাঁজের গায়ে ধূলা বালি মিশ্রিত হইলে সূতা কাটার সময় ঘন ঘন সূতা ছিঁড়িয়া যায়, সেজন্য ইহা নিতান্তই অবাঞ্ছনীয় ও পরিত্যাজ্য।

সমগুণ বিশিষ্ট সূতা কাটার পদ্ধতি

তকলিতেই হোক আর চরকাতেই হোক, সূতা কাটা আরম্ভ করিলেই প্রথমে লক্ষ্য হওয়া উচিত কি করিয়া সমগুণবিশিষ্ট সূতা হয়। চরকায় সূতা কাটিবার সময় একখানা কালো রঙের কাপড়ের টুকরা (৬" × ১৮") বিছাইয়া রাখা হয় এবং ইহার উপর সূতা কাটা হয়। কালো জমির উপর সাদা সূতার দোষগুণ, মিহি মোটা সহজে চোখে পড়ে। এরূপ ব্যবস্থা ধনুষ তকলির বেলায়ও চলিতে পারে। কিন্তু ইহাতে সূতার একটি মাত্র গুণই লক্ষ্য করা যায়। সমগুণ সূতা কাটিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

(১) চাকার আবর্তন সমগুণী হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে টেকো এক গতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে।

(২) পাঁজ হইতে সূতা টানিয়া বাহির করাও এক গতি বিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ কখনও ধীরে কখনও তাড়াতাড়ি এরূপ অদল বদল করিয়া পাঁজ হইতে সূতা বাহির করিলে সূতা অসমগুণসম্পন্ন হইতে বাধ্য।

এক হাতে চাকা ঘুরান, অন্য হাতে পাঁজ হইতে সূতা বাহির করা এক তালে চলা উচিত; অর্থাৎ প্রত্যেকটি কাজের গতির সমতা রক্ষা করিয়া চলিবে। পাঁজের হাত যদি হঠাৎ ধীর হইয়াই যায় তবে সূতার পাক

পাঁজের ভিতর চলিয়া যায়, ফলে পরমুহূর্তেই যে সূতাটুকু বাহির হয় তাহা স্বভাবতই অধিক মোটা হইয়া থাকে। এই অধিক মোটা সূতা শক্ত করিতে হইলে অধিক পাক দিতে হয়। কিন্তু এই অধিক পাক ক্ষীণ সূতার পক্ষে অতিরিক্ত হইয়া যাইবে। সে জন্য দেখা যায় যে, সূতার মোটা অংশগুলি স্বভাবতই দুর্বল।

সমগুণবিশিষ্ট সূতা উৎপাদন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলেরই গোড়া হইতে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে যদি গতি কমও হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই। কারণ সূতা উত্তম না হইলে গতি বাড়াইয়া কোনই লাভ নাই। অপচয় না করিয়া ধীর গতিতে উত্তম সূতা কাটিবার অভ্যাস করিলে পরে গতি আপনা হইতেই বাড়ে।

প্রয়োজনীয় শক্তিবিশিষ্ট সূতা

সমগুণবিশিষ্ট সূতা সর্বত্র সমান পাকের হইলে সমান ভাবে শক্তিবিশিষ্ট হয়। সূতার শক্তির চরম প্রয়োজন তাঁতে কাপড় বুনিবার কালে। প্রত্যেক নম্বরের সূতার শক্তির মাপ বা মান আছে। প্রথমে সূতার নম্বর বাহির করিয়া পরে সূতার শক্তি নির্ণয় করিতে হয় অর্থাৎ সূতার শক্তি নির্ধারণ করিতে হইলে অগ্রে ইহার নম্বর জানা চাই।

সূতার শক্তি পরীক্ষার যন্ত্র আছে। যাঁহারা যন্ত্র রাখিতে অসমর্থ, তাঁহারা নিকটবর্তী খাদি কেন্দ্রে বা বিদ্যালয়ের যন্ত্রে পরীক্ষা করাইয়া লইতে পারেন।

সাধারণ উপায়

সাধারণভাবে কাটুনি নিজেই নিজের সূতার নম্বর বাহির করিতে পারেন। উপযুক্ত পাকের সূতা ছিঁড়িবার সময় একটি শব্দ হয়—যেমনটি হয় তার ছিঁড়িবার বেলায়। অপক্ক অর্থাৎ কম পাকের সূতা বিনা শব্দেই পৃথক্ হয়।

আধুনিক চরকার টেকো হইতে নাটাইয়ে স্থতা গুটাইবার কালে সাধারণতঃ স্থতাকে একটি হুকের মধ্যে দিয়া নির্দিষ্ট পথে চালনা করা হয়। তখন উৎকৃষ্ট পাকের স্থতা চলিবার কালে এক প্রকার শব্দ হয় আর কম পাকের স্থতা চলিবার কালে এবং ছিঁড়িয়া বা পৃথক্ হইয়া যাওয়ার কালে শব্দই হয় না। বস্তুতঃ কম পাকের স্থতা 'ছিঁড়িয়া যাওয়া' কথাটাই ঠিক নয়, কম পাকের স্থতার আঁশ পিছলাইয়া আলাদা হইয়া যায়।

অতিরিক্ত পাকের স্থতা

কম পাকের স্থতার ন্যায় অতিরিক্ত পাকের স্থতাও ভাল নয়। অতিরিক্ত পাক বলিতে এই বুঝায় যে, পাকের জন্য তূলার আঁশগুলি ভাঙ্গিয়া মুচড়াইয়া দুর্বল হইয়া যাওয়া। সেজন্য ইহাও সহজে ছিঁড়িয়া যায়। সাধারণতঃ যাহারা পাঁজ হইতে কোনো প্রকার স্থতা বাহির করিয়া পরে স্থতা আর লম্বা না করিয়া অতিরিক্ত পাক দেয়, তাহাদের স্থতায় অতিরিক্ত পাক পড়িয়া যায়। নিয়ম এই যে, পাঁজ হইতে স্থতা বাহির হওয়ার কালেই স্থতার উপযুক্ত পাক পড়িবে। ইহা ঠিক বুঝিয়া চক্রের ও পাঁজের গতি ঠিক করা প্রয়োজন।

বস্তুত সমগুণবিশিষ্ট উপযুক্ত ও যথাযথ শক্তিবিশিষ্ট স্থতা কাটা সকল শিক্ষার্থীর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। উপরে যাহা বলা হইল, তাহা সাধারণতঃ চরকা ও ধনুষ তক্‌লির বেলায় প্রযোজ্য। ধনুষ তক্‌লিতেও যাহাতে তক্‌লির গতি সমভাবে চলে, সেই ভাবেই ধনুষের প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কিন্তু তক্‌লির বেলায় ব্যাপারটা অন্যরূপ। কারণ তক্‌লিকে হাতের দ্বারা চালনা করিতে হয়। তক্‌লিই একমাত্র যন্ত্র যাহাতে স্থতা কাটিতে হস্তচালনার নৈপুণ্য পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ পায়। শুধু তাহাই নহে, পাঁজ হইতে রেশগুলি কেমন করিয়া একটির পর একটিকে জড়াইয়া পাক খায় তাহা সম্পূর্ণ চোখে দেখা যায়, হাতে অনুভব করা যায়। ফলে

সূতা তৈরির সঙ্গে কাটুনির অনুভূতির যোগ অতি গভীর হয়। তকলির এই গুণসমূহ বিবেচনা করিলে শিক্ষানীতির দিক দিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সূতা কাটার প্রথম ধাপে তকলি ব্যবহার করাই সঙ্গত। সূতার গুণাগুণ ও অঙ্গুলিচালনার নৈপুণ্য ইহাতে প্রকট হয়।

গতির মান

শিক্ষার্থী ও সাধারণের সূতা কাটার গতির দক্ষতা সম্বন্ধে কতকগুলি মান স্থিরীকৃত হইয়াছে। যেমন আধুনিক যারবেদা ও কিষাণ চরকায় দুই ঘণ্টায় এক গুণ্ডি (সূতা গুটানসহ) নির্দিষ্ট আছে। এই গতিতে কাটিতে পারিলেই বুঝা গেল যে, প্রমাণ গতি লাভ করা গিয়াছে।

ধাতব তকলিতে ঘণ্টায় ১২০ তার প্রামাণিক গতি বলা হইয়া থাকে। কিন্তু গতির সম্পূর্ণ নির্দেশ পাইতে হইলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিরও উল্লেখ প্রয়োজন। যথা—(ক) তূলার জাতি (খ) সূতার নম্বর (গ) সময়।

(ক) তূলার জাতির পার্থক্যের সঙ্গে সূতার যোগ কত ঘনিষ্ঠ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

(খ) সূতার নম্বরের উপর গতিও নির্ভর করে। মামুলী ২০ নম্বরের সূতা যে গতিতে কাটা যায়, ১০০ নম্বরের সূতা তত দ্রুত কাটা সম্ভব হয় না।

(গ) কোন্ সময় কাটা হইয়াছে, তাহার উপরও গতি নির্ভর করে। সব ঋতুতে ও দিনের সকল সময়ে এক গতিতে চরকায় সূতা কাটা যায় না, সূতা কাটার গতি সম্বন্ধে বলা যায় যে, বিভিন্ন গতির টেকোতে সূতার গতির তারতম্য হইবে। যে চরকায় টেকোর গতি ৬০ মাত্র তাহার ১২০ গতিসম্পন্ন চরকার সঙ্গে তুলনা বা প্রতিযোগিতা হইতেই পারে না।

সূতার পরিমাপের একক

বর্তমানে এদেশে সূতার তুইটি মাপ প্রচলিত আছে। এই ভিন্নতার কারণ বিভিন্ন পরিধির লপেটা বা নাটাই।

চরকাতে ৩ ফুট বা এক গজ এবং ৪ ফুট বা এক তার পরিধির লপেটা সাধারণত ব্যবহৃত হয়। তকলি লপেটায় ৪ ফুট অর্থাৎ এক তারের মাপ আছে।

নাটাই-এর এক পাক=৩ ফুটে	—১ গজ
২১০ গজে	—১ লণ্ডি
৪ লণ্ডিতে (৮৪০ গজ)	—১ গুণ্ডি
নাটাই-এর এক পাক=৪ ফুটে	—১ তার
১৬০ তারে	—১ লণ্ডি
৪ লণ্ডিতে বা ৬৪০ তারে	—১ গুণ্ডি

গুণ্ডির হিসাবের তুলনায় তারের হিসাবে ৪০ ফুট সূতা বেশী লাগে ; আবার গজহিসাবেও সাধারণতঃ ৩ গজ বেশী অর্থাৎ ৮৪৩ গজ গুণ্ডিতে গণনা করা হয়। অতিরিক্ত ৩ গজ সূতা বেশী লইবার কারণ সূতার অপচয় পূরণ করা।

গজের হিসাবে গুণ্ডির নম্বর নির্ণয় :

$$\frac{\text{৮৪০ গজ (১ গুণ্ডি)} \times \frac{৩}{৪}}{\text{আনায় গুণ্ডির ওজন}} = \text{সূতার নম্বর}$$

$$\text{যেমন—}\frac{৮৪০ \times \frac{৩}{৪}}{\text{(২ তোলা অর্থাৎ) ৩২ আনা}} = \frac{৬৩০}{৩২} = \text{১৯ নং সূতা}$$

ভগ্নাংশ সাধারণ হিসাবে গননা করা হয় না।

× × × × × × ×

তারের হিসাবে গুণ্ডির নম্বর নির্ণয় :

$$\frac{৬৪০ \text{ তার}}{৩২ \text{ আনা}} = ২০ \text{ নম্বর}$$

× × × × × × ×

আরো সহজতর পদ্ধতিতে হিসাব করিবার উপায় :

গুণ্ডির ওজন তোলাতে আনার পর সেই তোলার রাশিদ্বারা ৪০কে ভাগ করিলেই সূতার নম্বর বাহির হইবে। উদাহরণ :

এক গুণ্ডির ওজন দেখা গেল দুই তোলা। এক্ষণে ২ দ্বারা ৪০কে ভাগ করিলে ২০ পাওয়া যায়। ইহাই গুণ্ডির সূতার নম্বর।

যথা— $\frac{৪০}{২ \text{ তোলা}} = ২০$ নম্বর ; $\frac{৪০}{২\frac{১}{২} \text{ তোলা}} = ৪০ \times \frac{২}{৫} = ১৬$ নং ; $\frac{৪০}{৩} = ১৩\frac{১}{৩}$ নম্বর ইত্যাদি।

কাটা সূতার শক্তি নির্ণয় প্রকরণ

শক্তি নির্ণয় মাপের একক (unit) : এক নম্বর সূতা পুরাপুরি অর্থাৎ ১০০% বা শত ভাগই মজবুত হইলে ৩৬০০ তোলা বহন করিতে পারিবে। এই হিসাবেই সূতার নম্বর দ্বারা ইহার শক্তি নির্ণয় করিতে হইবে। নমুনা : ১০ নং পুরাপুরি মজবুত হইলে কত তোলা বহন করিবে ?

উত্তর—১নং = ৩৬০০ তোলা

$$১০\text{নং} = \frac{৩৬০০}{১০} = ৩৬০ \text{ তোলা}$$

$$২০\text{নং} = \frac{৩৬০০}{২০} = ১৮০ \text{ তোলা}$$

কিন্তু ১০ নং সূতা যদি ৩৬০ তোলা বহন করিতে না পারে, অর্থাৎ ৩৬০

তোলার কম ওজনেই ছিঁড়িয়া যায় তবে শতকরা হিসাবে ইহার শক্তির মান কত তাহা এক্ষণে নির্ধারণ করিতে হইবে।

পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যায় যে, যে কোনো নম্বর সূতার শক্তি কমপক্ষে শতকরা ৬০ ভাগ হওয়া উচিত অর্থাৎ পূর্ণ শক্তির শতকরা ৬০ ভাগ।

১০নং সূতার পূর্ণ বহন শক্তি—৩৬০ তোলা

ইহার $\frac{৬০}{১০০}$ শক্তি $= \frac{৩৬০ \times ৬০}{১০০} =$ ২১৬ তোলা

অর্থাৎ ১০নং সূতা ২১৬ তোলা ওজনে ছিঁড়িয়া গেলেই বুঝিতে হইবে যে ইহার শক্তি শতকরা মাত্র ৬০ ভাগ। কিন্তু ৬০ ভাগের কম শক্তি-সম্পন্ন সূতা বয়নের পক্ষে উপযোগী হয় না।

শিক্ষাশিল্পের নীতি, পদ্ধতি ও শিক্ষকশিক্ষণ

শিক্ষাশিল্পের প্রসার ও শিক্ষকশিক্ষণ

দেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষাশিল্পের প্রসার বাড়িতেছে, বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বাড়িতেছে। আবশ্যিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু শিক্ষাশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়িতেছে না। শিক্ষাশিল্পের পূর্ণতর রূপায়নের পথে ইহা এক প্রতিবন্ধক। ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কথা এই যে, সকল শিক্ষক সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠানে যে পরিমাণ শিল্প শিখিবার সময় ও সুযোগ পান তাহা অতি নগণ্য। ইহার আশু প্রতিকারে দেশবাসী ও শিক্ষানীতিনিয়ন্ত্রকগণ অবহিত না হইলে শিক্ষাশিল্পের প্রবাহ অচল অবস্থায় পৌছিবে। প্রসার ব্যাহত হইবে, উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা। বর্তমানে নিম্ন, উচ্চ, বুনিয়াদি ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় শিল্প উপযুক্ত স্থান পাইয়াছে কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পকে যথার্থ স্থান দিতে হইলে ইহার নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা ও রূপায়নের পদ্ধতি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলোচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষাশিল্পের নীতি ও পদ্ধতি

শিক্ষাশিল্প শিক্ষাদানের নীতি ও পদ্ধতি শিক্ষকমাত্রেরই জানা প্রয়োজন। সত্য বটে যে, একমাত্র শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়া এবং পরীক্ষা পাশ করিয়া শিল্পশিক্ষাবিশারদ হওয়া যায় না। গুরুর নিকট শিক্ষা দ্বারা শিল্প-বিদ্যার আদর্শ ও কৌশল জানা যায় বটে কিন্তু সেই কৌশলকে নিজের

করিয়া লইতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। সেই আকাঙ্ক্ষার অভাব থাকিলে শিক্ষক হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, খাঁটি শিক্ষাশিল্প-শিক্ষক স্থান, কাল ও পাত্রভেদে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা করেন। শিক্ষকশিক্ষণ সম্পর্কে কেহ কেহ মনে করেন যে, শিক্ষক-সাধারণ নিজেরা চিন্তা করিয়া কিছু করিতে অপারগ; সুতরাং তোতাপাখীর মতো তাহাদিগকে শিক্ষণীয় সকল বিষয় শিখাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু এও সত্য যে. শিক্ষককে গুরু শিক্ষানীতির সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে পারেন মাত্র, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে বা বিদ্যালয়ে ইহা রূপায়নের দায়িত্ব ভাবী শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। অন্তরে প্রেরণা থাকিলে সেই দায়িত্ব পালনের পথও উন্মুক্ত হয়।

শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভাবী শিক্ষকতার প্রস্তুতি মাত্র হইতে পারে। সেই প্রস্তুতির জন্য যাহা জানার প্রয়োজন শুধু সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে।

শিল্পবিশারদ ও শিক্ষাশিল্পবিশারদের মধ্যেও পার্থক্য আছে। শিল্প-বিশারদ শিল্পবিশেষ শিখাইবার যোগ্যতা রাখেন কিন্তু শিক্ষাশিল্পবিশারদ শিল্পকে সাধারণ শিক্ষার আধাররূপে বিদ্যার্থীর শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। শিক্ষাশিল্পের প্রস্তুতির জন্য ভাবী শিক্ষককে কয়েকটি মৌলিক নীতি স্মরণ রাখিতে হইবে।

এক:—শিল্পে স্বাভাবিক রুচি থাকা প্রয়োজন। যথার্থ রুচি ও স্পৃহা আছে কিনা তাহার খাঁটি উত্তর নিজের অন্তর হইতেই পাওয়া যায়। যান্ত্রিক উপায়ে শিক্ষক হওয়া যায় না। জীবনে ইহার প্রেরণা থাকিবে।

দুই:—উদ্দেশ্যকে সার্থক রূপ দিবার নীতি ও পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে হইবে।

তিন:—শিক্ষাশিল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই।

চার:—যন্ত্রের সাহায্যে ঠিক পদ্ধতিতে শিল্পকাজ যথাযথ করার দক্ষতা অর্জন করিতে হইবে।

উক্ত চারিটি বিষয় পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। যেমন—হাতকে, মাথাকে—শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে পৃথক্ ভাবে ভাবা যায় না সেইরূপ উক্ত চারিটি গুণের একটিও বাদ দিয়া শিক্ষাশিল্পশিক্ষক হওয়া যায় না।

একজন দক্ষ কারিগর হইতে পারেন কিন্তু অপরকে সেই দক্ষতা অর্জনের পন্থা কিভাবে শিখাইতে হয় জানিতে নাও পারেন। আবার সকল শিক্ষাশিল্প-বিশারদ নিজে সকল কাজ একেবারে নিখুঁত করিতে সমর্থ নাও হইতে পারেন কিন্তু সামগ্রিক শিল্পজ্ঞান ও শিক্ষাপদ্ধতির উপর দখল থাকিলে শিখাইতে পারেন।

শিক্ষাশিল্পের দুইটি দিক্ আছে, যথা—ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক। তত্ত্বশিক্ষা-দ্বারা ক্লাস আরম্ভ করা হইবে কিন্তু দুইটিরই শিক্ষাকার্য একযোগে চলিবে, একটিকে অপরটি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না। দুইটি অভিন্ন। ইহাদিগকে একযোগে বিদ্যার্থীর শারীরিক ও মানসিক উন্নতির পরিপোষক হইতে হইবে। এই দুইএর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকিবে না। এই তথ্যটি মনে রাখিয়া বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অল্পবয়সে বসিয়া দীর্ঘকাল একটানা লেখা পড়ার কাজ করা কষ্টকর হয়, যদিও বয়স্কদের বেলায় উহা সহজতর। সেইজন্য শিল্পকাজে শরীরের চর্চায় দেহ ও মন সজীব হইয়া উঠে। শরীর মন গঠনে ব্যায়াম ও খেলাধূলার যেমন স্থান আছে তেমনি শিল্পচর্চারও স্থান আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে শিল্পচর্চার উদ্দেশ্য আত্মসংস্কৃতি ও জীবনকে ছন্দোময় করা। এ সম্বন্ধে পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় বাণী উদ্ধৃত হইয়াছে।

শিল্পমুদ্রা :—যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করার বেলায় শরীরের অঙ্গভঙ্গী যাহাতে শারীরিক ক্ষতি না করে সে জন্য বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ছুতারের কোমর-ব্যথার দৃষ্টান্ত আছে। বসিয়া কাজ করিবার

কালে দেহের পক্ষে ক্ষতিকর অঙ্গভঙ্গীর জন্যই এরূপ স্বাস্থ্যহানিকর ব্যাধির কবলে পড়িতে হয়। প্রত্যেকটি যন্ত্র চালনাকালে অঙ্গভঙ্গী যথাযথ হইতে হইবে। যে অঙ্গভঙ্গীতে কাজ করিবার কালে অনবরত তাহা স্মরণ করিয়া আড়ষ্ট থাকিতে বা বিশেষ অঙ্গভঙ্গী রক্ষা করিতে সদা সচেষ্ট থাকিতে হয় তাহাই অস্বাভাবিক, তাহাই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর জানিতে হইবে। শিল্পকাজ শিক্ষাকালে বা শিক্ষাদানকালে স্বাস্থ্যরক্ষার নীতি অনুসরণ করিয়া শিল্পসাধনা করিতে হইবে। কাজ করিবার সময় শরীরের প্রধান তিনটি অংশের অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত থাকিতে হইবে যথা ঃ—বুক, মাথা ও পা। কাজ করার সময়ে বুকটিকে সামনের দিকে সটান রাখিতে হয়, একবার ইহা অভ্যাসে পরিণত হইলে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়, কারণ এই বুকের মধ্যে হৃদযন্ত্র ও ফুসফুস থাকে এবং সমগ্র দেহটির স্বাচ্ছন্দ্য ইহাদের স্বচ্ছন্দ সক্রিয়তার উপর নির্ভরশীল। ইহারা যথাক্রমে রক্তচলাচল ও শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়ার আধার।

দুই ঃ—মাথাটিকে সর্বদাই যথাসম্ভব উন্নত রাখার অভ্যাস করিতে হইবে। মাথাটির ওজন আছে এবং মাথা নত করিয়া কাজ করিলে মেরুদণ্ডের সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, মাথা সোজা করিয়া কাজ করিতে অভ্যস্ত হইলে তাহা ঘটিতে পারে না। কাজের সময় মাথা ঠিক না রাখিলে মাংসপেশীর সবলতাও কমিয়া যায়। গ্রীবাদেশে কোনো আড়ষ্টতা থাকা অবাঞ্ছনীয়, গ্রীবা সহজ না রাখিলে স্নায়ুর উপর কৃত্রিম চাপ পড়ে এবং রক্তচলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। মস্তক সোজা ও উন্নত না রাখিলে চোখের দৃষ্টিও ঠিক থাকে না। শিল্পকর্মটি ১ফুট বা ৩০ সেণ্টিমিটারের অধিক দূরে থাকা উচিত নয়। সে-জন্য কাজের ডেস্ক বা বেঞ্চের খাড়াইএর মাপ ঠিক রাখিতে হয়। বসিয়া শিল্পকাজ করিতে হইলে মেরুদণ্ড সোজা ও শির উন্নত করিয়া সুখকর আসনে বসিতে হইবে। দাঁড়াইয়া কাজ করিবার কালে পদদ্বয়ের অবস্থান এমন থাকিবে যাহাতে শরীরের ভারসাম্য ঠিক থাকে। যেদিকে

ঝুঁকিয়া কাজ করিতে হয় সেইদিকেই লাইন করিয়া পদ স্থাপন করিতে হয়। সম্মুখদিকে ঝুঁকিতে হইলে পা দুইটির একটিকে অন্যটির পিছনে রাখিতে হয়। ডাইনে বাঁয়ে ঝুঁকিতে হইলে পদদ্বয় ফাঁক করিয়া শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখিতে হয়।

শিল্পকাজে শরীরের উভয় পার্শ্ব সমান ভাবে ব্যবহার করা শিখিতে হয়। অল্পবয়সে ইহা অভ্যাস করিলে ডান বাম দুই হাতই সমান ভাবে কাজ করিতে পারে। মোটের উপর উভয় হস্ত সমভাবে পরিচালনা অভ্যাসসাপেক্ষ এবং অভ্যাসের ফলে তাহা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়।

শিক্ষাশিল্পপদ্ধতি

শিক্ষাশিল্প শিক্ষার পদ্ধতি নির্দিষ্ট করণীয় বস্তুর উপর নির্ভরশীল নহে। বাস্তব আকারবিশিষ্ট কতকগুলি বস্তুর মাধ্যমে কাজের ধাপগুলি বা টেক্‌নিক শিখানো হয়। কোন পুস্তকের 'মডেল সিরিজ' এর একটিও না করাইয়া শিক্ষাশিল্প শিখানো যায়। আবার 'মডেল সিরিজের' সকলগুলি করাইয়াও শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে পারে। যুক্তিপূর্ণ নীতির উপর শিল্পশিক্ষা-পদ্ধতি নির্ভরশীল, শুধু কতকগুলি পদার্থের উপর নহে। গৃহ নির্মাণের পদ্ধতির গোড়ার কথা গৃহের বনিয়াদ। এই বনিয়াদের সহিত শিল্পশিক্ষা-নীতির উপমা চলে। গৃহের বনিয়াদ ঠিক না হইলে গৃহ দাবিয়া যায়; সেরূপ শিক্ষাশিল্পের মৌলিক পদ্ধতি ঠিক না থাকিলে সকল প্রয়াসই বিফলতায় পর্যবসিত হয়। আবার নিকৃষ্ট বনিয়াদের ঘর দাবিয়া গেলেও যেমন কখনও কখনও ইহার ব্যবহার চলে, তেমনি কখনও কখনও ভ্রান্তনীতির সাহায্যে শিল্পকাজ করিয়া ও আপাতদৃষ্টিতে ভাল ফল দেখানো যায়। সেই সকল ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রথম ভুলটি সংশোধন করার জন্য অন্য আর একটি ভুল নীতির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে; যেমন—ঘরের খুঁটি ঘরের চাল বহনে

অসমর্থ হইলে অতিরিক্ত খুঁটি ব্যবহার করা হয়। দুইই প্রকৃতপক্ষে ভুল কাজ, যদিও ঘর দাঁড়াইয়া থাকে।

আসল কথা, মৌলিক নীতির সারবত্তা বিচার করিয়া নীতির গুণাগুন সমালোচনা করিতে হয়। শিক্ষাশিল্পের মূলনীতি ও পদ্ধতি শিক্ষার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে কিনা সেই দিক্ দিয়াই শিল্পের গুণাগুন যাচাই করিতে হয়।

শিক্ষাশিল্পের চর্চাতে যথার্থ শিল্পী গড়িয়া উঠে না মনে করা ঠিক নয়, যদিও নিছক কারিগর সৃষ্টি শিক্ষাশিল্পের উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষাশিল্পে বস্তুবিশেষ তৈরি করা শিখান হয়, কারণ বস্তুবিশেষ তৈরি করার মাধ্যমেই শারীরিক ও মানসিক শক্তি বিকশিত হয় কিন্তু বাজারে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে শিখান হয় না।

শিক্ষাশিল্প ব্যবসায়াত্মক নহে, শিক্ষাশিল্পের মাধ্যমে হাত পাগুলি দক্ষতা অর্জন করে কিন্তু ব্যবসায়ী তৈরি করে না। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে শিল্পচর্চা হয়। শিক্ষাশিল্পের উদ্দেশ্য যেমন শিক্ষানৈতিক তেমনি আবার গৃহশিল্প আছে। অবকাশবিনোদন গৃহের শিল্পচর্চার উদ্দেশ্য। কারুশিল্পচর্চাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন, এক—ব্যবসায়ের বা জীবিকার্জনের জন্য শিল্পচর্চা, দুই—নৈতিক কারণে শিল্পের চর্চা, আর তিন—শিক্ষাশিল্প-চর্চা।

শিক্ষানৈতিক যে-কোনো বিষয়ের চর্চা মানুষকে উন্নত করে, অবনত করে না। কোনও যথার্থ শিক্ষার আদর্শ নীচ হইতে পারে না।

কোনো পদ্ধতি ব্যক্তিবিশেষকে 'শিক্ষিত' বা উন্নত না করিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের মঙ্গলার্থেই নীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে প্রচেষ্টা করা হয়। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ শিক্ষার উদ্দেশ্য হইলে পরিপূর্ণ মহৎ হওয়াই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অমৃতময় পরিপূর্ণ জীবন লাভ শিক্ষার উদ্দেশ্য হইলে সেই পথে অগ্রসর হইবার সাধনা মানুষের চিরকাল থাকিবে। সেইজন্যই শিক্ষা প্রগতিশীল হওয়া প্রয়োজন।

মানবশিশুর স্বভাব আমাদিগকে জানিতে ও বুঝিতে হইবে। আমরা কি শিশুর সত্তাকে সাদা কাগজের মতো মনে করিব? সাদা কাগজের মতো মনে করিলেও বুঝিতে হইবে যে, শুভ্র শুদ্ধ শিশুমনে যাহা কিছু আঁকিয়া দেওয়া হয় তাহা কখনই একেবারে মুছিয়া ফেলা যায় না, দাগ বা চিহ্ন থাকিয়াই যায়। শিশু সম্বন্ধে এভাবে চিন্তা করিলে মানুষকে একটা নিষ্ক্রিয় জীব বুঝিতে হয়, বাহির হইতে যাহা শিখান যায় তাহাই শিখে, শিশুর জন্মগত গুণের স্বীকৃতি থাকেনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জন্মগত গুণ শিশুর থাকে।

আবার শিশুকে স্বভাবদত্ত গুণ বা শক্তি বিশিষ্ট স্বীকার করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, বহির্জগতের প্রভাব মানুষের উপর সামান্য নয়; সেজন্য সদ্বৃত্তির পূর্ণ অনুশীলনে সহায়তার জন্যই শিক্ষা, যাহার ফলে মন্দবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় হয় বা লোপ পায়। অর্থাৎ সদ্বৃত্তিগুলির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য। মানুষের সুপ্ত মহৎ বা সদ্বৃত্তির প্রকাশ শিক্ষার লক্ষ্য চিরকাল থাকিবে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমাজজীবনের দিক্ দিয়া যাচাই করিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, আদর্শ নাগরিক হওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একাধিক বিপরীত মত আছে। একদলের মত এই যে, এই জীবনেই জীবনের শেষ, জীবনের পরবর্তী কোন সত্তা নাই। কিন্তু অনেকেরই একটা বোধ থাকে যে, এই জীবনের পরিসমাপ্তিই জীবনের শেষ নহে। যে বস্তু সত্তাহীন, তাহার কোনো ধারণা করাও সম্ভব নয়। যে জিনিষের বাস্তব সত্তা নাই সেই জিনিষ মানুষের ধারণাতীত। কিন্তু মানুষের অনন্ত সত্তার ধারণা আছে, সেইজন্য স্বীকার করিতে হইবে যে দেহের পতনের জীবনের শেষ নহে। জীবনের পূর্ণ হইতে পূর্ণতর সুসঙ্গত বিকাশের দ্বারা মানুষ আপন জীবনের নিগূঢ় রহস্যের আলোর সন্ধান পায়। সদ্বৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ সেই জন্য

প্রয়োজন। সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ দুই পথে সম্ভব। সৈন্যদলের সামঞ্জস্যপূর্ণ গতির কথা আমরা জানি; আবার জানি সঙ্গীতচর্চায় ঐকতানে বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার। বিভিন্ন যন্ত্রের শব্দ বিভিন্ন কিন্তু একযোগে একতানে কি অপূর্ব স্বরের ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়। সেই বৈচিত্র্যের সমন্বয় সমাজশিক্ষার মূল কথা। সৈন্যদলের সংহতি শিক্ষানৈতিক জীবনে কাম্য হইতে পারে না, কিন্তু সমাজজীবনে বৈচিত্র্যের মধ্যে যে সংহতি তাহা অবশ্যই কাম্য। মানুষের সকল সদ্বৃত্তির পূর্ণবিকাশ কাম্য কিন্তু মূল্যের তারতম্যানুযায়ী বিশেষ বৃত্তির বিকাশ প্রয়োজনীয় বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, বিভিন্ন সদ্বৃত্তির বিকাশ বিভিন্ন বয়সে হইয়া থাকে।

আমরা মনস্তত্ত্ব ও শরীরতত্ত্বের চর্চাদ্বারা মানুষ-সাধারণের পরিচয় পাইতে সচেষ্ট হই। প্রত্যেকটি মানবশিশু কতকগুলি নিজস্ব শক্তি লইয়া জন্মলাভ করে। সকল মানুষেরই যেমন কতকগুলি সাধারণ গুণ থাকে আবার তেমনি বা তদপেক্ষা বেশী ব্যক্তিগত গুণ থাকে। বিধাতা নিজের সৃষ্টিতে ঠিক একরূপ করিয়া কিছুই গড়েন নাই। দুইটি নুড়ি বা দুইটি পাতা বা দুইটি একজাতীয় ফুলও ঠিক একরূপ হয় না, ইহাই সৃষ্টির বৈচিত্র্য। মানবশিশুর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য স্মরণ করিয়াই শিক্ষাশিল্পের চর্চার তারতম্য করিতে হয়। যাহাদের শিক্ষার জন্য শিক্ষক কাজ করেন তাহাদিগকে ভাল করিয়া জানা শিক্ষকের একটি প্রধান কর্তব্য। ফ্রোয়েবেল বলিয়াছেন, 'আমার শিশুবিদ্যালয় আমার বিশ্ববিদ্যালয়, শিশুগণ আমার অধ্যাপক।' অর্থাৎ শিখাইতে যাইয়া আমরা অনবরতই শিখিবার ও জানিবার সুযোগ পাই।

শিশুর নিজস্ব পৃথক সত্তাকে স্বীকার করিয়াই শিক্ষা চলিবে। প্রত্যেক শিশুর নিজস্ব গ্রহণশক্তিকে বুঝিয়াই তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। সমষ্টিগত ভাবে শিক্ষাদান চলে না। কারণ প্রত্যেক শিশুর নিজস্ব বিশিষ্ট শক্তি বা গুণ থাকে।

রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশু সকলকে এক ছাঁচে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়াস থাকে। কিন্তু প্রত্যেক শিশু স্বকীয় শিক্ষালাভের অধিকারী।

কোনো কোনো শিক্ষাবিদ্ (Uno Cygnaeus) মনে করেন একজন শিক্ষক বড়জোর ২৫ জনের ক্লাস লইতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ২৫ জনকে ঠিক একরূপ মনে করিয়া একই ভাবে শিক্ষা দেওয়া চলে না। শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক শিশুর স্বকীয় বৃত্তিগুলি বিকশিত হইলে তাহারা সমাজকে আপনাপন বৈচিত্র্যদ্বারা সমৃদ্ধ করিতে পারে ও করে।

প্রত্যেক শিশুর স্বভাবদত্ত নিজস্ব গুণগুলি যাহাতে পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারে শিক্ষানৈতিক শিল্পের ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য। সদ্‌বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ শিক্ষাশিল্পের প্রধান লক্ষ্য, সেজন্য ক্লাসের সকলকে একভাবে শিক্ষাদান দ্বারা শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে পারে না। ইহা খাঁটি শিক্ষানীতির বিপরীত।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার না করিলে শিল্পশিক্ষা শিক্ষানৈতিক রূপ পায় না।

শিক্ষামাত্রই একমাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকের মাধ্যমে হয় তাহা নয়। পরিবেশ, মানুষ ও প্রকৃতি শিশুর শিক্ষকের কাজ করে। শিশুর শিক্ষার উপর পারিপার্শ্বিক জলবায়ু প্রভাবও নগণ্য নয়। ধর্ম, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার ও রীতিনীতিগুলি মানুষকে কমবেশী প্রভাবিত করে। শিশুর প্রকৃতি বলিতে শিশুর জন্মগত শক্তি বুঝিতে হইবে, যে শক্তির বলে শিশু বড় হইয়া পূর্ণমানবে পরিণত হয়, যেমন বীজ আপন শক্তি বলে অঙ্কুরিত হইয়া পূর্ণবৃক্ষে পরিণত হয়। বিদ্যালয়ের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হইতেই আমরা অনেকে মনে করি যে, শিক্ষা সমাপ্ত হইল। বস্তুতঃ মাতৃক্রোড়ে শিক্ষার আরম্ভ, আর দেহ নিষ্পন্দ হইলেই শিক্ষার শেষ হয়। শক্তির বিকাশ অনুশীলনসাপেক্ষ। যে শক্তির অনুশীলন মানুষ করে না সেই শক্তি ক্রমশঃ নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়।

অনুশীলন করিতে গেলেই শ্রম করিতে হয়, অবশ্য অতিরিক্ত শ্রম সর্বদাই অবাঞ্ছনীয়।

ব্যবসায়াত্মিকদৃষ্টিশূন্য যে শিল্প অনুষ্ঠিত হয় তাহাকেই শিক্ষাশিল্প বলা যায়।

উদ্দেশ্য—মূলশিক্ষা (Fundamentel Education) জীবনের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষাদানের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ বৃত্তিগঠনমূলক (formative) অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি স্ফুরণের সহায়ক। বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষক হইতে চাহিলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দ্বিধাহীন হইতে হইবে। উদ্দেশ্যগুলি এইরূপ :—

এক—শিল্পে রুচি ও কর্মে প্রীতি সঞ্চার করা।

দুই—শারীরিক শ্রমকে শ্রদ্ধার চোখে দেখার সাধনা।

তিন—আত্মনির্ভরশীলতার সাধনা।

চার—গুছাইয়া, ঠিক মাপ-অনুযায়ী কাজ করিবার অভ্যাসসাধন।

পাঁচ—একাগ্রতার অভ্যাসসাধন।

ছয়—অধ্যবসায়ী হইতে পারার সাধনা।

সাত—চোখের দৃষ্টিকে ব্যবহার করিতে শেখা, সৌন্দর্য ও আকার-বোধের সাধনা।

আট—হাতে কাজ করিবার দক্ষতা অর্জন করা অর্থাৎ হাত দুইটিকে সবল কর্মঠ করিয়া তোলার সাধনা।

বাস্তব উদ্দেশ্য : যথারীতি যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া উত্তম শিল্পদ্রব্য তৈরি করিতে পারার দক্ষতা অর্জন।

এক—তৈরী শিল্পবস্তুর উপর প্রধানতঃ দৃষ্টি না দিয়া কর্মপ্রণালী অনুশীলনে এবং কর্মশক্তি বিকাশে ইহার কার্যকারিতার উপর জোর দিতে হইবে।

দুই—শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

তিন—বিদ্যার্থী যেন নিশ্চিতই বুঝিতে পারে যে, ব্যবহারযোগ্য বস্তু তৈরী করা হইতেছে অর্থাৎ কাজটি উদ্দেশ্যপূর্ণ হইবে।

চার—শিল্পকাজে বৈচিত্র্য থাকিবে।

পাঁচ—স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করার সুযোগ থাকিবে।

ছয়—কাজের গুরুত্ব বিদ্যার্থীর ক্ষমতা ও শারীরিক শক্তির সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইবে।

সাত—যথার্থ পরিমাপে কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।

আট—পুষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হইবে।

নয়—শিক্ষকের সতর্কদৃষ্টি ও পরিচালনা থাকিবে।

দশ—বিদ্যার্থীর চিন্তার খোরাক কাজে থাকিবে, কলের মত কাজ করিবে না।

এগারো—শিক্ষাকাজ যেন কখনও কোনো অবস্থায় বিদ্যার্থীর স্বাস্থ্যের প্রতিকূল না হয়।

বারো—কর্মে সহজ গতি থাকিবে।

তেরো—শিল্পকাজ শারীরিক উন্নতির পরিপোষক হইবে, শরীরের ক্ষতিকারক কোনো অঙ্গভঙ্গী করিবে না। কর্মানুশীলন যথাপদ্ধতিতে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

চৌদ্দ—শিল্পবস্তুর আকার ও সৌন্দর্যজ্ঞান স্ফুরণে নিশ্চিত সাহায্য করিবে।

পনেরো—যে যন্ত্র যে উদ্দেশ্যে নির্মিত সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে হইবে।

ষোলো—কর্ম গুছাইয়া ধাপ ঠিক রাখিয়া করিতে হইবে।

শিল্পশিক্ষক—শিক্ষকশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক এমন শিল্পকাজ শিখাইবেন যাহাতে শিক্ষাশিল্পের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। শিল্পকাজ ভিন্ন অন্য বিষয়ও শিখাইতে পারেন এমন শিক্ষক হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

একজন শিক্ষক একজাতীয় শিল্পকাজ শিখাইবেন। যেমন কার্পাসশিল্প অথবা দারুশিল্প বা ধাতুশিল্প।

শিক্ষাপ্রকরণ বা পদ্ধতি—সহজতম কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া ধাপে ধাপে কাজের মাধ্যমে কর্মপ্রকরণগুলি শিখাইতে হইবে। শুধু মুখে বলিয়া কর্মকৌশল শিখান তাৎপর্যহীন। প্রতি কর্মপ্রকরণ ঠিকমতো করিবার সুযোগ দিতে হইবে। শিল্পশিক্ষাদানের বেলায় এই প্রকরণগুলি বাস্তবে করিয়া দেখাইতে হইবে। যে বস্তুটি তৈরী করিবে সেরূপ বস্তু একটি দেখাইয়া কাজের নির্দেশ দিতে হইবে।

শিল্পকাজের ড্রইং সম্ভবমতো শিখাইতে হইবে। প্রথম প্রথম শুধু হাতে, পরে স্কেলের সাহায্যে। গ্রাফ্ কাগজ ব্যবহার করিলে ড্রইংএর যন্ত্রাদির প্রয়োজন হইবে না। এগারো বারো বৎসর বয়স্ককে এইভাবেই কাজের ড্রইং শিখাইতে হয়। বয়নের কাজ শিখাইবার সময় ড্রইং শিখাইতে হইবে, কোনো প্যাটার্ন ব্যবহার করা চলিবে না। ড্রইংএর মাপ অনুযায়ী শিল্পকাজ করার অভ্যাস করিতে হইবে।

প্রথম এমন ছোট আকারের সহজ কাজ বিদ্যার্থীরা করিবে—যাহা অল্পসময়ে স্বল্পায়াসে সম্পন্ন হয়। ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে বড় কাজ হাতে নিবে, যে কাজে অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন হইবে।

বিদ্যার্থীদিগকে পরিমিত যন্ত্রের দ্বারা কাজ শিখাইতে হইবে।

কার্পাসশিল্পে তূলা হইতে আরম্ভ করিয়া সূতা কাটা ও বয়নে সূতার ব্যবহার যথারীতি শিখাইতে হইবে। তূলা নির্বাচন, রঞ্জনের জিনিষ ইত্যাদি নির্বাচন করা শিক্ষকের দায়িত্ব।

বিদ্যালয়ে যাহা কিছু তৈরী করা হয় তাহার প্রথম ও প্রধান দাবী বিদ্যার্থীর। সেজন্য এমন বস্তু তৈরী করিতে হইবে যে, তাহা গৃহে ব্যবহার-যোগ্য। শিক্ষার দিক্ দিয়া এসকল বিষয় বিচার করিতে হইবে। ইহার কোনো একটা ব্যবস্থাকে সমগ্র নীতি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিলে নীতিই অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হইতে পারে; সেজন্য শিক্ষানৈতিক সমগ্র দৃষ্টিতে নীতির বিচার করিতে হইবে।

শিল্পজ্ঞান ও সমন্বয়—অঙ্ক, ভূগোলের ন্যায় শিল্প একটি শিক্ষণীয় বিষয়। অন্যপক্ষে শিল্পের মাধ্যমে অঙ্ক, ভূগোল, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ইত্যাদি বহু বিষয়ের জ্ঞান হয় ও হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন বিদ্যালয়ে অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ই শিল্পের মাধ্যমে শিখান উচিত। এক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগ আছে। আবার কেহ কেহ শিল্পকে একটি পৃথক্ বিষয় রূপে শিখানোরই পক্ষপাতী।

আমাদের মতে শিক্ষকদের এবিষয়ে মধ্যপথ অবলম্বন করা বিধেয়; অর্থাৎ শিল্প শিখিতে অন্য যে সকল বিষয়—অঙ্ক হোক, ভূগোল হোক বা অন্য যে বিষয় হোক—শিখিতে হয় তাহা ভাল করিয়াই শিখাইতে হইবে। কৃত্রিম ভাবে জ্ঞানসমন্বয় অর্থহীন।

প্রত্যেক শিক্ষাপদ্ধতিই জটিল। যে আদর্শ ও পদ্ধতি বিদ্যার্থীর জীবনকে সমৃদ্ধ করে, জ্ঞান স্পৃহাকে প্রজ্জ্বলিত ও চরিতার্থ করে, তাহাই উত্তম বিবেচনা করিতে হইবে। সেজন্য মধ্যপথ অনুসরণ করা সমীচীন; অর্থাৎ পাত্র বুঝিয়া পথ নির্দেশ করাই সঙ্গত।

শিল্পকাজ

বাজারের রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিল্পদ্রব্য সম্পূর্ণ করা ব্যবসায়ী কারিগরের লক্ষ্য। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য নয়। অপর পক্ষে শিক্ষাপ্রকরণ ঠিক হইলে উৎপন্ন দ্রব্য সকল দিক্ দিয়াই উৎকৃষ্ট হয়। শিক্ষকের লক্ষ্য হইবে বিদ্যার্থীকে দক্ষতা দান। এই দক্ষতার মাপকাঠি— সুরুচির বিকাশ, হাতের দক্ষতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সঠিক মাপে কাজ করিতে পারার, সঠিক ভাষায় কাজের বর্ণনা দিবার ও সঠিক ভাবে চিন্তা করিয়া কাজের পরিকল্পনা করার শক্তিলাভ। বিদ্যার্থীর তৈরি বস্তুই তাহার বিকাশের যথার্থ পরিচয়। বাদকের পরিচয় যন্ত্রের বাহুল্যে নহে—তাহার

বাজানোর দক্ষতায়, চিত্রকরের পরিচয় চিত্রে ; সেইরূপ সম্পূর্ণ কাজই বিদ্যার্থীর অর্জিত জ্ঞানের মাপকাঠি হয়।

বিদ্যালয়ে আবশ্যিক অথবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শিল্পচর্চা

এদেশে এই প্রশ্নের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা প্রয়োজন। শিল্পচর্চা রাষ্ট্রীয় নির্দেশে আবশ্যিক হওয়ার ফল সকল দেশে ভাল হয় নাই। ফ্রান্সে ও ফিনল্যাণ্ডে ইহা আবশ্যিক ; সেজন্য সেখানে উপযুক্ত শিল্পশিক্ষকের অভাবে শিক্ষাশিল্পের ব্যাপক উন্নতি সম্ভব হয় নাই। আইনের মর্যাদা রক্ষার জন্য শিক্ষককে—শিখাইবার মতো জ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক, ইচ্ছা করুক আর নাই করুক—ক্লাস করিতেই হয়। সেজন্য শিল্পচর্চায় উৎসাহের অভাব লক্ষিত হয়। অপরপক্ষে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গরূপে শিল্পচর্চার মূল্যবোধ শিক্ষকশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচারিত হইলে শিক্ষকগণই একাজ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া থাকেন। আইন দেশে দুইভাবে বলবৎ করা যায় : এক, নৈতিক আইন, যে আইন আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া মনুষকে সমাজের সেবায় প্রবৃত্ত করায়, আর এক রাষ্ট্রীয় আইন, যাহা ভয় দেখাইয়া কাজ করায়। ধর্মশিক্ষার কথা ধরা যাক। যে শিক্ষক নিজে ধর্মে অনুরাগী নহেন, তাঁহাকে ধর্মশিক্ষায় নিয়োজিত করিলে ইহার ফল কি দাঁড়াইবে? বিদ্যার্থীরা কতকগুলি মামুলী ধর্মীয় বুলি শিখিবে মাত্র কিন্তু উহার সারবত্তার কোনো পরিচয় পাইবে না।

শিক্ষক নিজে ব্যায়ামচর্চায় শিক্ষিত না হইলে ব্যায়াম শিখাইতে যাওয়া যেমন বিপজ্জনক তেমনি কেহ শিক্ষাশিল্পে দক্ষতা না লইয়া তাহা শিখাইতে গেলে ফল কখনই ভাল হয় না। সুতরাং শিক্ষাশিল্পে-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক ভিন্ন শিল্পকে আবশ্যিক করার বিপদসম্বন্ধে রাষ্ট্র ও বিদ্যালয়কে অবহিত হইতে হইবেই। অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহা জানা যায় যে, কোনো কোনো বিদ্যার্থী লেখাপড়ায় যথাযথ আনন্দ পায় না কিন্তু শিল্পচর্চায় অসাধারণ অধ্যবসায়ী হয়।

অনেকে মনে করেন শিল্পও অবশ্য শিক্ষণীয়। আমি নিজে শিল্পশিক্ষক হইলেও মনে করি যে, এবিষয়ে বিদ্যার্থীদের নিজের রুচির প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কারণ অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, ব্যবস্থা ও সুযোগ পাইলে সকলেই শিল্পচর্চায় উৎসাহী হয়। বিদ্যালয়ে শিল্পচর্চায় আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং শিল্পচর্চার সার্থকতাও সকল বিদ্যার্থী বুঝিতে পারে।

যথাযথ কাজ করা ও অপচয় না করা শিক্ষাশিল্পের একটা বিশেষ দিক্। অপচয় না করার অভ্যাস—শুধু অর্থনৈতিক কারণে নয়—শিক্ষানৈতিক কারণেই করা উচিত। সৌকর্যবোধ, অনপচয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাজ সংস্কৃতির বুনিয়াদ।

অশুদ্ধ কাজ—মানে সুষমাহীন কদাকার কাজ—ক্লাসে কদাচ না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা শিক্ষকের কর্তব্য। বলা যাইতে পারে যে, কোনো কোনো কাজে সামান্য মাপের ভুল হইলেও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এরূপ অভ্যাস হইয়া গেলে পরে তাহা শোধরান খুব কঠিন হয়। ইহাতে সময়ও বৃথা নষ্ট হয়।

সেজন্য প্রতিটি বিদ্যার্থীর সামর্থ্যের অনুপাতে বস্তু তৈরী করিতে দিতে হইবে। বিদ্যার্থীকে এমন কাজ দিতে হইবে যাহা তাহার পক্ষে করা অসম্ভব না হয়। সেজন্য প্রয়োজন, শিক্ষকের সতর্ক শিক্ষাদান, যাহাতে কদাকার কাজ করার কোনো অবকাশ কেহ না পায়।

পরিমিত সূক্ষ্মমাপে কাজ সম্পাদনের দ্বারাই বিদ্যার্থীর ব্যক্তিগত গুণ প্রকাশ পায়। শিক্ষকের পক্ষে অতিরিক্ত কাজ প্রত্যাশা করা যেমন অন্যায়, তেমনি সক্ষমকে কম কাজ করিতে দেওয়াও শিক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর।

যদি কোনো বিদ্যার্থী প্রথম কাজটি একাধিকবার প্রচেষ্টার ফলেও সম্পূর্ণ করিতে না পারে তবে তাহাকে অন্য দুই একটি সহজতর কাজ করাইয়া পরে আবার প্রথম কাজটি সম্পূর্ণ করিতে দিতে হইবে।

শিক্ষণীয় শিল্পবস্তুর ধাপ এমন হইবে যাহাতে প্রত্যেক বিদ্যার্থী নিজে চিন্তা ও বিচার করিয়া কাজ করিবার সুযোগ পায়।

বিদ্যার্থীকে একাগ্র ও অধ্যবসায়ী করিয়া তুলিতে হইবে। সেজন্য শিক্ষাদান এমন হইবে যে বিদ্যার্থী তাহাতে আনন্দ ও রস পায়।

বাস্তব শিল্পকাজের ধাপ ঠিক থাকিলে ফল সর্বদাই উত্তম হয়। একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের অভাব তখন পরিলক্ষিত হয় না। কখনও একাগ্রতার অভাব ঘটিলে নিজের কাজের ক্ষতি যাহা হয় তাহা তখন বিদ্যার্থী বুঝিতে পারে। বস্তুতঃ শিল্পকাজ সঠিক পথে শিক্ষা দিলে বিদ্যার্থীরা কাজে আত্মহারা হয়, অবকাশের ঘণ্টার ধ্বনি পর্যন্ত কানে পৌছায় না। সে বিষয়ে শিক্ষকের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, কারণ আত্মহারা হইয়া দীর্ঘকাল একটানা কাজে লাগিয়া থাকিলে শারীরিক ক্ষতি হইতে পারে। তা ছাড়া যথারীতি অবকাশ লইয়া কাজ করিলে কাজও বেশী হয়।

বিদ্যার্থীর প্রয়োজন-ভিন্ন কাজ সম্বন্ধে অতিরিক্ত বক্তৃতা অবাঞ্ছনীয়। পাত্র ও সময় না বুঝিয়া বুঝাইলে কোনো কাজেই লাগে না। নিরর্থক সময় নষ্ট হয়।

শিক্ষাশিল্পচর্চার তিনটি শত্রু

এক—বিদ্যার্থীদের কাজ বাছিয়া বাছিয়া শিল্পপ্রদর্শনীতে প্রেরণ করা।

দুই—যাহা ব্যবহার করা যায় না তেমন ফ্যান্সি কাজ করা, ইহা প্রকৃত কাজের পক্ষে অমর্যাদাজনক।

তিন—নিকৃষ্ট শ্রেণীর শিক্ষা অর্থাৎ শ্রদ্ধাহীন হইয়া অসতর্কভাবে শিক্ষাদান।

শিল্পের ক্লাস পরিচালনার দুইটি দিক্ আছে।

এক—সকল ছাত্রকে একযোগে একরকমের জিনিষ শিখাইবার উদ্দেশ্যে একবার শিক্ষার বিষয় বলা ও কাজের নির্দেশ দেওয়া।

দুই—পৃথক্ ভাবে প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে বলা।

যে বিষয় সকল বিদ্যার্থীরই জানা প্রয়োজন এবং যে বিষয়ে বিদ্যার্থিগণও পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, শুধু সেই সকল বিষয়েই এক বক্তৃতায় কাজ হইতে পারে, কিন্তু এরূপ সাধারণ নির্দেশদান যে-সকল কারণে সর্বদা উচিত নহে তাহার মধ্যে কয়েকটির বর্ণনা করা হইতেছে :

এক—শিক্ষামাত্রই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সেজন্য শিক্ষার দিক্ দিয়া প্রত্যেককে পৃথক্ কিছু কথা বলিবার প্রয়োজন আছে।

দুই—দুইজন বিদ্যার্থীরও বুঝিবার ক্ষমতা ও কাজের দক্ষতা সমান হয় না। সেজন্য সকল নির্দেশই পৃথক্ ভাবে প্রায়োজনমতো দিতে হইবে। সমগ্র-ভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন। সমগ্রভাবে সকলকে একভাবে বলিলে শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের স্থান সঙ্কুচিত হইয়া যায়, অর্থাৎ বিদ্যার্থীদের মধ্যে যাহার যে বিষয় জানা দরকার তাহাকে তাহাই বলিতে হইবে।

তিন—বিদ্যার্থীকে বেশী বলা ও কম বলা—দুই-ই অবাঞ্ছনীয়। শক্তির বিকাশ শিল্পচর্চার উদ্দেশ্য ; শক্তিবিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় করণীয় কাজ করাইতে হইবে। বিকাশ একমাত্র অভিজ্ঞতা দ্বারাই সম্ভব।

চার—বিদ্যার্থীর অমনোযোগী হওয়া অবাঞ্ছনীয়। কাজে যখন বিদ্যার্থী রস পায় না তখনই অমনোযোগী হয়। কাজেই প্রত্যেক বিদ্যার্থীর ঠিক প্রয়োজনের সময়ে তাহাকে নির্দেশ দিতে হয়। কাজে রস সৃষ্টি করিতে পারার উপর শিক্ষকের শিক্ষাদানের সার্থকতা নির্ভর করে।

পাঁচ—নির্দেশ দিবার জন্য কাজে মসগুল ছাত্রকে কাজ বন্ধ করিতে বলা কখনই সুফল উৎপাদন করে না। রচনা লেখার সময় বাধা পড়িলে যেমন চিন্তার সূত্র কটিয়া যায়, তেমনি কাজের বেলায়ও হয়। কাজ করিবার সময় বিদ্যার্থীরা কতকগুলি ধারণা—সচেতন না থাকিয়াও রূপায়ণের উদ্দেশে চেষ্টা করে, তখন বাধা পড়িলে বিদ্যার্থী কাজের ধারার খেই হারাইয়া ফেলে,

ফলে সময়েরও অপচয় হয়। শুধু যখন কোনো একজন বিদ্যার্থীর কিছু ভুল করার সম্ভাবনা থাকে মাত্র তখনই তাহাকে যথোচিত নির্দেশ দিতে হয়। অপরপক্ষে ক্লাসের অন্যান্য বিদ্যার্থীদের সেই নির্দেশের প্রয়োজন নাও থাকিতে পারে।

ছয়—শিল্পকাজে সকলে একতালে একসঙ্গে চলিতে পারে না, গুণানুসারে বিদ্যার্থীদিগকে চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা:—

(১) যাহারা কাজে খুব ধীরগতি-সম্পন্ন এবং ভালও নয়।
(২) যাহারা কাজে খুব ধীরগতি-সম্পন্ন কিন্তু ভাল।
(৩) যাহারা কাজে খুব দ্রুতগতি-সম্পন্ন কিন্তু ভাল নয়।
(৪) যাহারা কাজে খুব দ্রুতগতি-সম্পন্ন এবং ভাল।

ক্লাসের সকলে সমান ভাবে যাহাতে অগ্রসর হইতে পারে সেজন্য বিভিন্ন পথ গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

যাহারা কাজে ভাল নয় অথচ ধীর তাহাদের কাজ শেষ করার অপেক্ষায় যাহারা দ্রুত ভাল কাজ করে তাহাদের অপেক্ষা করিতে দেওয়া উচিত নয়। সেজন্য কাজে দুর্বল ছাত্রদিগকে পৃথক্ ভাবে বিশেষ নির্দেশ দিতে হয়। সকল শ্রেণীর ছাত্রের সম্বন্ধে শিক্ষার দিক্ দিয়া সুবিচার করিতে হইলে আবার শিল্পশিক্ষানীতির গোড়াকার প্রশ্নে আসিতে হয়; অর্থাৎ শিল্প-শিক্ষা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হইবে। যাহারা কাজে ভাল ও দ্রুত তাহাদের আগাইয়া যাইবার পথ উন্মুক্ত রাখা চাই। শিক্ষার মান উন্নয়ন এপথেই সম্ভব।

সাত—একটি কাজ শেষ না করিয়া বিদ্যার্থীদের অন্য কাজে হাত দেওয়া কখনই উচিত নয়। জিনিসপত্রের অনটন হেতু যদি কোনো কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়, তবে অবশ্য নূতন কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে।

আট—যাহাদের কাজ উত্তম নহে, দ্রুতও নহে, তাহাদের সম্পন্ন কাজও শিক্ষকের সানন্দে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু শিক্ষার্থীকে তাড়া

দিয়া কাজ করাইতে নাই। তাড়াহুড়া করিয়া কাজ শেষ করিতে বাধ্য করিলে ফল কখনও ভাল না।

নয়—বিদ্যার্থীদের নিকট জোর করিয়া কখনই কাজ আদায় করিতে নাই। জোর করিলে অনেক সময় আত্মপ্রতারণার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইহা শিক্ষকের দিক্ দিয়াও প্রতারণাবিশেষ।

দশ—অল্পবয়স্ক বিদ্যার্থীরা প্রথম প্রথম কোনো কাজ সম্পন্ন করিলেই করিতে পারার আত্মপ্রসন্নতা লাভ করে। কাজেই সৌকর্য, সৌন্দর্য সম্বন্ধে তখনও প্রকৃত বোধ জন্মে না। সেজন্য প্রথম কাজটি সম্পন্ন করিয়া শিক্ষককে দিলে তাহা তিনি সানন্দে গ্রহণ করিবেন। এরূপ কাঠের বা ধাতুর কাজে পালিস না দিয়া যত্ন করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। পরে আর দুচারিটি বস্তু সম্পন্ন হইলে প্রথমে করা কাজের দোষত্রুটি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিতে আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। তখন প্রথমে করা কাজের সৌকর্য সম্বন্ধে বিদ্যার্থী নিজেই সচেতন হয় এবং নিজেই তাহা শোধরাইতে সচেষ্ট হয়। বিদ্যার্থীর নিজের দৃষ্টি এ পদ্ধতিতে বিকশিত হইবার পথ শিক্ষককে খোলা রাখিতে হইবে। ইহাতে নিজের বিচারক্ষমতা দ্রুত বাড়িতে পারে।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

কাজগুলির মাধ্যমে অনুশীলনের ধাপ এমন থাকিবে যাহাতে সহজ হইতে ক্রমশঃ কঠিন ও কঠিনতর কাজে বিদ্যার্থীরা বিনাক্লেশে অগ্রসর হইতে পারে। তেমনি জানা কাজ হইতে অজানা কাজে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে নিয়োগ করিতে হইবে।

শিক্ষাদান সম্পর্কে চারিটি মূলনীতি স্মরণ রাখিতে হইবে।

এক—পাত্র বা আধার বুঝিয়া নির্দেশ দেওয়া।

দুই—শিক্ষাদানকার্য সরস ও আনন্দময় করা।

তিন—শিল্পশিক্ষার বনিয়াদ দৃঢ় করা।

চার—বিদ্যার্থীকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা।

সহজ হইতে ক্রমশঃ কঠিন কাজের সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহা গুছাইয়া শিক্ষা দেওয়া সহজ নহে। অন্তর্দৃষ্টিজাত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আত্মবিচার দ্বারা এই জ্ঞান লাভ সম্ভব। শুধু দুইএকটি অভিজ্ঞতা—এমন কি দশবারোটি দ্বারাও পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিচার করা চলে না। শিক্ষককে সেইজন্য অনবরতঃ আত্মবিচার করিতে হয়। যাহা একজনের পক্ষে সম্পন্ন করা অতি সহজ অপরের পক্ষে তাহা সহজ নাও হইতে পারে। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী শিল্পীর নিকট সকল কাজই সহজ মনে হয়। সেজন্য জাত-ব্যবসায়ী তাঁতি, কামার, কুমার ও ছুতারেরা বিদ্যালয়ে প্রথম বিদ্যার্থীর কাজ বিচার করিয়া করাইতে সমর্থ হয় না।

তৈরি শিল্পবস্তুসমূহ শিল্পশিক্ষার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। একরাশ শিল্প-বস্তু বাহির হইতে দেখিয়া বুঝা কঠিন যে, কোন্‌টি সহজ আর কোন্‌টি সহজ নহে। সেজন্য জানা দরকার কি কি প্রকরণের দ্বারা কোন্ কোন্ কাজ কি ভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছে। শুধু যন্ত্রের সংখ্যার উপর যাচাই করা চলে না, যন্ত্র কিভাবে চালনা করা হইয়াছে জানিতে হয়।

কত বিভিন্ন রকমের অনুশীলন সমগ্র কাজে থাকিবে এই প্রশ্ন করা যায়। ভাষা শিখিতে গেলে প্রথমেই অক্ষর উচ্চারণ শিখিতে হয়। ইহাই ভাষাশিক্ষার প্রথম বনিয়াদ। কাজেরও প্রথম অনুশীলন অক্ষর উচ্চারণের সঙ্গে, পরবর্তী অনুশীলন শব্দের সঙ্গে—সম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ ছত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার যে সময় নির্দিষ্ট থাকে তাহা উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া অনুশীলনগুলিকে ভাগ করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দারুশিল্পের ডভ্‌টেলিং জোড়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বিচিত্র রকমের ডভ্‌টেলিং

জোড়ের কাজ হয়। সুতরাং দেখিতে হইবে যে, কোন্ কোন্ নমুনার ডভ্‌টেলিং আমাদের বাস্তবজীবনের কাজে লাগে এবং তাহাই ছাত্রদিগকে শিখাইতে হইবে। এই কথা সকল শিল্প সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

'সহজতম হইতে কঠিনতম' এই নীতির আনুপাতিক পার্থক্য আছে। কারণ একজনের নিকট যাহা করা কঠিন আর একজনের পক্ষে তাহা করা সহজ; আবার প্রাপ্তবয়স্কদের দৃষ্টিভঙ্গীতে কখনও যাহা করা কঠিন মনে হয় বাস্তবক্ষেত্রে অল্পবয়স্কদের পক্ষে তাহা মোটেই কঠিন হয় না।

শিল্পপরীক্ষার পদ্ধতি

প্রচলিত পরীক্ষার প্রথা সম্বন্ধে আজকাল দেশে আলোচনা চলিতেছে। চিরাচরিত পরীক্ষা প্রথা ত্রুটিহীন নহে, একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করিতেছেন, অথচ আদর্শ পদ্ধতি তেমন কিছু এখনও গড়িয়া উঠে নাই। যে পর্যন্ত উন্নততর পরীক্ষাপদ্ধতি চালু না হইতেছে, সে পর্যন্ত মামুলী পদ্ধতিকে অবাঞ্ছনীয় মনে করিলেও "সামাজিক রক্ষাকবচ" রূপে স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছে। কিন্তু একথা সত্য যে, শিল্পের বেলায় বৎসরান্তে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় সম্বৎসরের কাজের পরীক্ষা হইতেই পারে না, হইতে দেওয়াও উচিত নয়। এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, দৈনন্দিন ক্লাসের কাজকে ভিত্তি করিয়া বার্ষিক ফল নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত। যে পদ্ধতিতে ইহা করিতে হইবে তাহার বর্ণনা নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে। শিল্পের দৈনন্দিন কাজের ফলকে বিধিবদ্ধ ভাবে লিখিয়া রাখিতে হইবে এবং সেই ফল মাসান্তে যোগ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে (বিশেষতঃ বঙ্গদেশে) দুই মাস গ্রীষ্মাবকাশ ও এক মাস পূজার ছুটি থাকে। সুতরাং বৎসরের মধ্যে নয় মাসের ক্লাসের ফলের উপর নির্ভর করিয়া বাৎসরিক ফল নির্ণয় করিতে হইবে। প্রত্যেক শিল্পশিক্ষার্থীর এক বা একাধিক তথ্যের (থিয়োরীর) খাতা থাকিবে। একটি খাতাতে নিম্নোক্ত পর্যায়ে শিক্ষার অঙ্গরূপে প্রত্যেকের নিজ নিজ কাজের নিয়মিত বর্ণনা লিখিতে হইবে। যেমন ছাত্রের নাম, বস্তুর নাম, আরম্ভের তারিখ, নিষ্পন্ন তারিখ, কাজ সম্পন্ন করিতে কত সময় লাগিয়াছে——ইত্যাদি।

শিল্পবস্তুর কার্যকারিতা বা ব্যবহার (উদ্দেশ্য) বর্ণনা——

বস্তুর মাপ——

উপাদানের হিসাব——

অংশের মাপ	সংখ্যা বা ওজন	বাজার-দর

মোট

প্রয়োজনীয় যন্ত্রের তালিকা—১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

অনুশীলনের বর্ণনা :—(পর পর সাজাইয়া লিখিতে হয়)*

শিক্ষক সযত্নে এই খাতা দেখিয়া প্রয়োজনমতো সংশোধন করিবেন। খাতার বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া প্রত্যক্ষ শিল্পকাজের উপর মাসান্তে নম্বর দেওয়া হইবে।

প্রত্যেক ছাত্রের নামে মাসিক ও বাৎসরিক কাজের রেকর্ড রাখার একটি ফর্ম থাকিবে। পরের পৃষ্ঠায় ফর্মের নমুনা দেওয়া হইল।

---

*মন্তব্য : উপাদানের হিসাব করিতে গেলে বাস্তব অঙ্কশাস্ত্রের অনুশীলন হয়। কার্পাসের ওজনের মাপ, সূতার নম্বরের মাপ, কাঠের বর্গফুটের মাপ, ঘনফুটের হিসাব, বাজারদরে মূল্যনিরূপণ এবং আকার সম্পর্কে ড্রইং আঁকিতে গেলে জ্যামিতির জ্ঞানের চর্চা হয়। উদ্দেশ্যবর্ণনায় ও অনুশীলনরচনায় শিল্পবিষয়ক সাহিত্যের চর্চা হয়। শিল্প-সাহিত্য এদেশে অধিকাংশই লুপ্ত হইয়াছে। শিল্প-পরিভাষার দৈন্যও কম নহে। কিন্তু বিদ্যালয়ে শিল্পচর্চার মাধ্যমে উপযুক্ত পরিভাষা ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিবে, এই আশা অবশ্যই করা যায়। একাজে শিক্ষাশিল্পবিশারদকে শিক্ষাশিল্প-সাহিত্যের প্রগতির ধারক হইতে হইবে।

ব্যক্তিগত বাৎসরিক কাজের রেকর্ড

ক্লাস বিদ্যার্থীর নাম বয়স শিল্প বিভাগ বৎসর ১৯ ১৯

	জুলাই	অগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মোট	নোট	শিক্ষকের মন্তব্য
কাজের দিবস সংখ্যা											…দিন	…ঘণ্টা	
উপস্থিত দিবস সংখ্যা											…দিন	…ঘণ্টা	

বিষয়											ক্লাসের ফল					
											ক	খ	গ	ঘ	ঙ	
শিল্পের দক্ষতা																
উপাদান-জ্ঞান																
যন্ত্র-জ্ঞান																
সূক্ষ্মবোধ																
আত্মনির্ভরশীলতা																
অঙ্কন নৈপুণ্য																
সৌন্দর্যজ্ঞান																

শিক্ষক শিল্পবিশেষের জন্য বিষয়ের সংখ্যা বাড়াইতে বা কমাইতে পারেন।

নম্বর

সংখ্যায় নম্বর না দিয়া অক্ষর ব্যবহার করিতে হইবে। কারণ শিল্পকাজে সামান্য নম্বরের পার্থক্যের কোনো অর্থ হয় না। সেজন্য পাঁচটি বিভাগ ব্যবহার করা হয়। যথা :—

ক =অতি উত্তম —৭০ হইতে উর্ধ্বে
খ =উত্তম —৬০ হইতে ৬৯
গ =মধ্যম —৫০ হইতে ৫৯
ঘ =চলনসই —৪০ হইতে ৪৯
ঙ =অনুপযুক্ত

শারীরিক ও মানসিক বিশেষ দুর্বলতাভিন্ন শিল্পকাজে অনুপযুক্ত বিদ্যার্থী বড় দেখাই যায় না। নম্বরের মান শিক্ষকের নিজের শিক্ষার মানের উপর নির্ভরশীল। দেশময় এই প্রথা চালু করিতে হইলে শতকরা পয়েণ্টের হার স্থির করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। শিল্পকাজের নম্বরের মান সাহিত্য ভূগোল ইত্যাদির মানের মতো হইতে পারে না বরং অঙ্কের মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকিবে। কারণ দুইই সূক্ষ্ম হিসাববোধের উপর নির্ভরশীল। আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, শতকরা ১৫ জন ক, ৩০ জন খ, ৪০ জন গ, বাকী ১৫ জন ঘ পাইতে পারে। ক্লাসের স্বাভাবিক অবস্থায় এই মান চলিবে কিন্তু ছাত্রসংখ্যা কম হইলে এই হার চলিবে না।

উপরের চার্টে ক্লাসে প্রত্যেক বিদ্যার্থীর স্থান উল্লেখের ব্যবস্থা আছে। যেমন একটি ক্লাসে ১৫ জন বিদ্যার্থী আছে। দক্ষতায় ক পাইল ৩ জন, উপাদানজ্ঞানে খ পাইল ১০ জন ইত্যাদি।

বিশ্বভারতীর দারুশিল্পবিভাগে বয়স ও শিক্ষার সময়ের অনুপাতে শিল্প-কাজের গতি ও ফল নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি পৃথক্ ব্যবস্থা আছে। দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় এই পুস্তকে উহার বিশদ বিবরণ দেওয়া

হইল না। তবে শিক্ষাব্রতী কেহ এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা জানিতে ইচ্ছা করিলে বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া যাইতে পারেন।

ব্যক্তিগত বাৎসরিক শিল্পকাজের রেকর্ডের পরপৃষ্ঠায় বিদ্যার্থীর প্রত্যক্ষ কাজের হিসাব রাখা হয়। যেমন ঃ—

ক্লাস— নাম— বৎসর—

মাস	প্র্যাকটিক্যাল কাজের বর্ণনা	থিয়োরিটিক্যাল কাজের বর্ণনা
জুলাই		
অগষ্ট		
সেপ্টেম্বর		
অক্টোবর		
নভেম্বর		
ডিসেম্বর		
জানুয়ারী		
ফেব্রুয়ারী		
মার্চ		
এপ্রিল		

এই রেকর্ড যথাযথভাবে রাখিলে পরীক্ষার প্রশ্ন থাকিবে না। কিন্তু

ইচ্ছা করিলে এই পদ্ধতিতে ক্লাসের কাজের উপর শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিয়া বাকী ২৫ নম্বর মৌখিক পরীক্ষার জন্য রাখা যায় এবং মৌখিক পরীক্ষকদের মধ্যে বাহিরের একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক থাকিতে পারেন 'রক্ষা-কবচ' হিসাবে। বিদ্যালয় পরিদর্শককেও পরীক্ষক করিলে শিল্পপরীক্ষার সমতার সাহায্য করিবে।

এই রেকর্ড বিদ্যালয়সমূহে ঠিক ভাবে রাখিলে দেশময় নিম্নোক্ত বিষয়ে শিল্পের প্রগতির সহায়ক হইবে।

এক—শিক্ষাশিল্পের উপাদানের জন্য বার্ষিক খরচের একটা খাঁটি হিসাব পাওয়া যাইবে। সেই অনুপাতে বাজেট করা সহজ হইবে।

দুই—উপাদানসংগ্রহ ও ক্লাসের কাজের পরিকল্পনা করার সুবিধা হইবে।

তিন—শিল্পশিক্ষার জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করা হয় তাহা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে কিনা জানা যাইবে।

চার—শিক্ষার মান সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছিবার সহায়ক হইবে।

পাঁচ—বৎসরের কোন্ ঋতুতে শিল্পকাজ ভাল হয় এবং কেন হয় জানা যাইবে। সেই অনুপাতে শিল্পশিক্ষার বিষয় সূচী তৈরি করা সহজ হইবে।

ছয়—শিল্পশিক্ষায় অপচয়ের কারণ নির্ণয় করা সহজ হইবে।

সাত—শিল্পশিক্ষকের কৃতকার্যতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ভাবী শিক্ষাব্রতীর গবেষণার কাজও সহজতর হইবে।

শিক্ষকশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ও বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার পরিবেশ

যে কোনো বিষয় বিদ্যালয়ে শিখাইতে গেলে প্রথমেই শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হয়, উপযুক্ত পরিবেশে বিদ্যার্থী আপন চেষ্টায়ই বহু জ্ঞান সহজে আয়ত্ত করে ও করিতে পারে। কারণ উত্তম পরিবেশ বিদ্যার্থীর ঔৎসুক্য জাগায় এবং সে তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য নিজেই সচেষ্ট হয়।

উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষকের শিক্ষাদান কাঁজ সহজ ও সরস হয়।

শিল্পশিক্ষার সহায়ক সামগ্রীর সংগ্রহ

মানুষ পড়িয়া শেখে, শুনিয়া শেখে, কিন্তু পড়িয়া শুনিয়াও সকল বিষয় ঠিক বুঝা বা জানা যায় না ; কিন্তু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে অঙ্ক, ভূগোল, সাহিত্য, ইতিহাস পড়াইবার বেলায় শিক্ষার সহায়ক বস্তুবিশেষের সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। শিল্প শিক্ষাদানের বেলায় এরূপ সহায়ক বস্তু শিক্ষাকে সজীব ও সরস করে।

আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে সংগ্রহশালার সার্থকতা অসাধারণ। সম্যক-রূপে শিল্পচর্চা করিতে গেলে যাহা জানা একান্ত প্রয়োজন তাহা 'সহায়ক' সামগ্রীর দ্বারা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে ; বিদ্যার্থী সহজে শিল্পজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও শিল্পচর্চার পথ সঠিক অনুসরণ করিতে পারে। ভূগোলের জ্ঞানও শিল্পচর্চাকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলে।

মৌলিক শিল্প উপাদানের গুণসকল নির্ণয়ের জন্য বিশেষ গবেষণাগার থাকে। গবেষণাগারের সংগ্রহশালায় উপাদানের গুণসমূহ প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন লৌহ-গবেষণাগারে লোহার আদিরূপ ও সর্ববিধ অবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়। কার্পাস-গবেষণাগারে বিভিন্ন কার্পাসের গুণসমূহ পৃথগ্‌ভাবে দেখা যায়। সেরূপ দারু-গবেষণাগারে সকল প্রকার কাঠের গুণাগুণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল গবেষণাগার প্রত্যক্ষ করা বিদ্যালয়ের সাধারণ বিদ্যার্থীদের পক্ষে সহজ নহে—সম্ভবও নহে। কিন্তু মৌলিক শিল্প-পদার্থ-সমূহ, ইহাদের সম্বন্ধে ভৌগোলিক বিবরণ ও বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান সহজে দিবার জন্য সহায়ক বস্তুর সংগ্রহ, মানচিত্র ইত্যাদি শিক্ষকগণ সহজেই করিতে পারেন। এরূপ শিল্পশিক্ষার সহায়ক দ্রব্যের সংগ্রহ ও ইহাদের শিক্ষানৈতিক বিন্যাসের কাজ কিভাবে করিতে হয় তাহা শিক্ষকসাধারণের জানা প্রয়োজন। শিক্ষকশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীতে বিষয়টি স্থান পাইলে শিক্ষকগণ সংগ্রহ ও বিন্যাসপদ্ধতি শিখিতে পারেন এবং পরে আপন আপন বিদ্যালয়ে অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন।
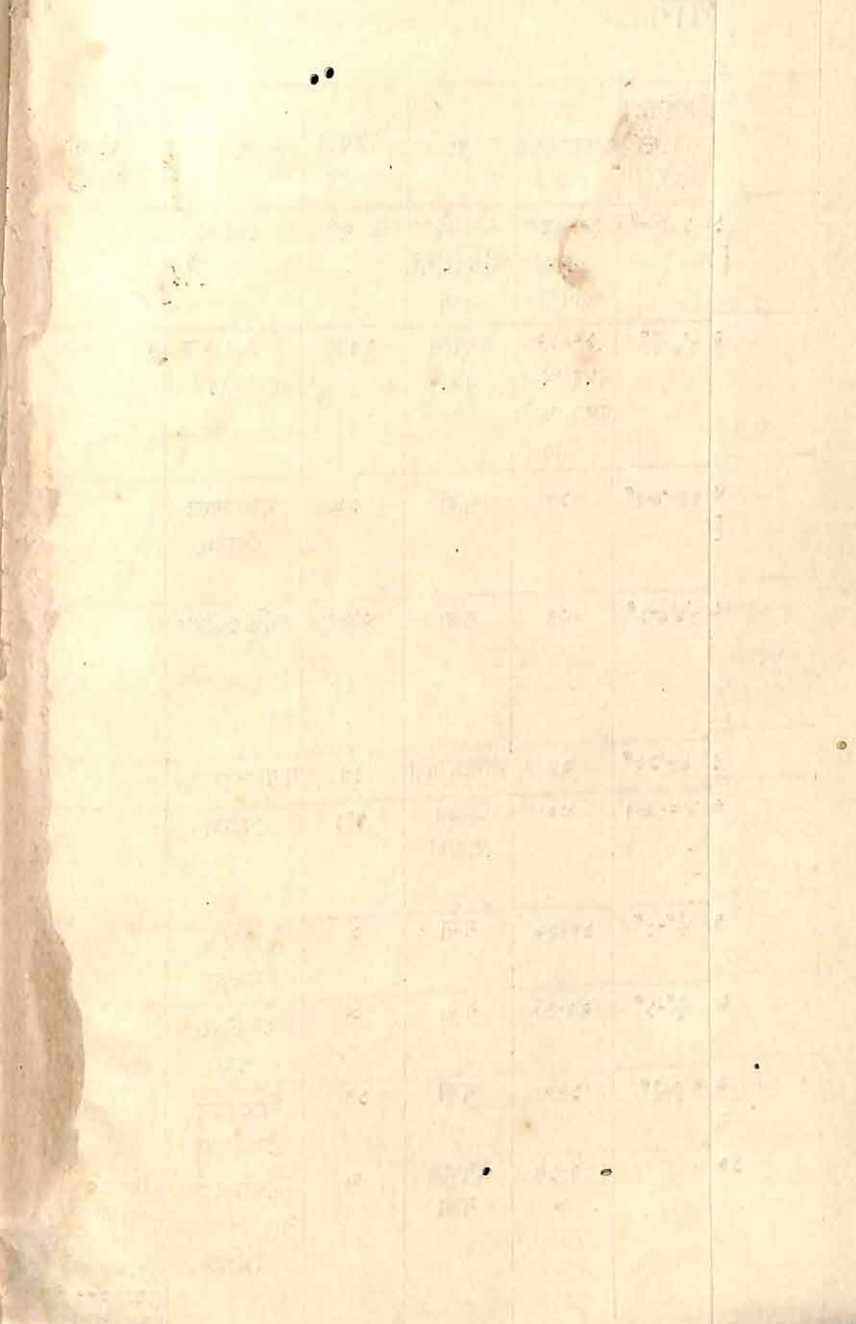
নাম	স্থান	জলবায়ু	জমি	বপ	মন্তব্য
১। ওয়েষ্টার্ণ [Western H. 1]	ভেল্লীর জেলা, অনন্তপুর, তামিলনাদ।	২০" বারিপাত ১০২°F উত্তাপ	দোঁয়াশ কালো	সে	
২। পত্থপত্তি	গঞ্জাম, ভিজাগাপত্তম।	৬০"-৮০" বারিপাত	পাহাড়ী, ঢালু	সম্বং	
৩। উপ্পম [Uppam 2619]	কোয়েম্বাটুর রামনাদ, তিরো-নেল ভেল্লী।	২৫" বারিপাত	কালো মাটি	সে ন	
৪। কাম্বো-ডিয়া	কোয়েম্বাটুর, মাদুরা, সালেম, রামনাদ, তিরো-নেল ভেল্লী।	২৫" বারিপাত ৬০°-৯০°F উত্তাপ	দোঅাঁশ মাটি	সে ন	
৫। কোকনাদ	গুণ্টুর নেল্লার।	৩৫" বারিপাত	কালো মাটি	সে	
৬। বারুঙ্গানী [K. I]	কোয়েম্বাটুর, মাদুরা, রামনাদ, তিরোনেলভেল্লী।	৩০" বারিপাত ৫৬°-৯৯°F উত্তাপ		সে ন	
৭। ওদ্দি-পাতি	ভিজাগাপত্তম, কোরাপাত।	শুষ্ক, প্রায় বারিশূন্য		জুন,	
৮। বেল্মা	গঞ্জাম, ভিজাগা-পত্তম।	শুষ্ক, প্রায় বারিশূন্য	পাহাড়ী, ঢালু	জুন,	
৯। কন্দাপতি বা পটুশালী	গঞ্জাম, ভিজাগা-পত্তম।	৬০"-৮০" বারিপাত		সার	
১০। নাদাম বা দেশী	ত্রিবাঙ্কুর।			বৃষ্টি এপ্রি জু	রা বৎসরের কল সময় কিছু কিছু পাওয়া য়, দক্ষ কাটুনীর তে ১০০ নম্বর র্যন্ত সূতা হয়

কার্পাসবিজ্ঞান শিক্ষার সহায়ক দ্রব্য, ম্যাপ ও চার্টের সম্বন্ধে এখানে নমুনা-স্বরূপ একটি তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

কার্পাস-বিজ্ঞান শিক্ষার সহায়ক বস্তু ও বিবরণ সংগ্রহ

(১) স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিভিন্ন জাতের তূলা সংগ্রহ, ইহাদের নাম ও বিবরণ, যথা—গাছের আয়তন, উৎপাদনহার, জলবায়ু ও তূলার হার, বীজবপনকাল, চয়নকাল, আঁশের দৈর্ঘ্য, কত নম্বর সূতা কাটা সম্ভব, তূলার গুণ ইত্যাদি। নমুনা-স্বরূপ শুধু দাক্ষিণাত্যের কার্পাসের বিবরণ চার্টের আকারে দেওয়া হইল।

(২) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রসিদ্ধ তূলার নমুনা।

(৩) উপর্যুক্ত তূলার পাঁজ ও উহাদের সূতার নমুনা।

(৪) তুলার উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত মাটির নমুনা ও গুণের বর্ণনা।

(৫) তূলার পাতা, ফল ও ফুলের নমুনা শুকাইয়া বিবরণ ও (যথা—ফলের আকার, ফুলের আকার ইত্যাদি) চিত্র আঁকিয়া সংগ্রহালয়ে রক্ষা করা।

মানচিত্র ও চার্ট

(৬) জেলা, রাজ্য ও দেশের মানচিত্র বড় আকারে আঁকিয়া তূলার উৎপত্তিস্থানসমূহ চিহ্নিত করা এবং মানচিত্রের এক পার্শ্বে তূলার নাম ও বারিপাতের বিবরণ, খেতীর পরিমাণ, উৎপাদনহার ইত্যাদির বিবরণ লিখিয়া রাখা। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রদেশহিসাবে তূলা উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলি মানচিত্রের সাহায্যে দেখান হইতেছে। মানচিত্রের নীচে প্রতি অঞ্চলের চাষের পরিমাণ, উৎপাদন প্রভৃতি তথ্য পরিবেশন করিতে হইবে।

(৭) পৃথিবীর মোট উৎপাদন ও বিভিন্ন দেশের উৎপাদনহার চার্টের দ্বারা দেখাইতে হইবে।

(৮) (ক) আমেরিকার মানচিত্র আঁকিয়া তূলা উৎপাদনের স্থানগুলি চিহ্নিত করিয়া নীচে বিবরণ দিতে হইবে।

(খ) অনুরূপ ইজিপ্টের তূলা চাষের মানচিত্র ও বিবরণ দিতে হইবে।

অবিভক্ত ভারতবর্ষের (ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের) মানচিত্র
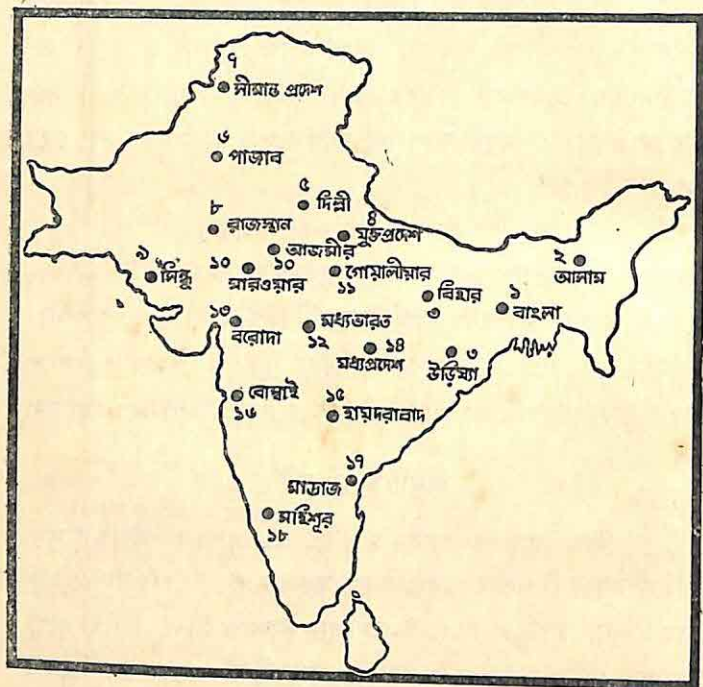
মানচিত্রে কার্পাসের চাষের জন্য প্রসিদ্ধ অঞ্চলগুলির নাম ও নম্বর দেওয়া হইয়াছে। নম্বর অনুসারে প্রতিঅঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণও লিখিয়া দিতে হইবে।

(৯) পৃথিবীর উভয় গোলার্ধের মানচিত্র আঁকিয়া বিভিন্ন দেশের তূলা উৎপাদনের স্থান ও সমগ্র উৎপাদনের হার উল্লেখ করিতে হইবে।

(১০) উপরে তূলাসংগ্রহ, মানচিত্র ও চার্টের কথা যাহা বলা হইল, ঠিক

তেমনি পদ্ধতিতে রেশম, পশম, পাট, শণ প্রভৃতির বিবরণ মানচিত্রের সাহায্যে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(১১) মাথাপিছু কত গজ কার্পাসবস্ত্র এদেশে ও অন্যান্য দেশে প্রয়োজন হয় তাহা চার্টের ও চিত্রের সাহায্যে দেখাইতে হইবে।

(১২) এদেশে কুটিরশিল্পের দ্বারা উৎপাদিত কার্পাস, রেশম, পশম ইত্যাদির বস্ত্রের পরিমাণ চার্ট ও চিত্রের সাহায্যে দেখাইতে হইবে।

(১৩) রঞ্জন করার জন্য যেসকল গাছগাছ্‌ড়া ব্যবহৃত হয় তাহা চার্ট ও চিত্রের সাহায্যে দেখাইতে হইবে।

(১৪) বাটিক-পদ্ধতি চিত্রের সাহায্যে দেখাইতে হইবে।

(১৫) রঞ্জন করার জন্য রাসায়নিক বস্তুর নাম ও চিত্র দিতে হইবে।

(১৬) প্রয়োজনীয় গ্যালিং পদ্ধতির বর্ণনা (চিত্র সহ) দিতে হইবে।

কার্পাস ও বয়নশিল্পের অন্যান্য উপকরণ

(১৭) পাট ও শণের সূতা পাকাইবার জন্য পল্লী অঞ্চলে ব্যবহৃত তক্‌লির নমুনা। কোথায় কোন্ অঞ্চলে এরূপ তক্‌লি ব্যবহৃত হয় তাহার বিবরণ চাই।

(১৮) কার্পাস তূলায় মিহি সূতা কাটিবার বাঁশের তক্‌লির নমুনা। চার্টে কোথায় ঐ তক্‌লি ব্যবহৃত হইত ও এখনও হয় সেই বিবরণ দিতে হইবে।

(১৯) শ্লেট ও পোড়া মাটির চাক্‌তি বিশিষ্ট তক্‌লি ও ইহাদের ব্যবহারের বর্ণনা দিতে হইবে।

(২০) আধুনিক তক্‌লির নমুনা—কোথায় তৈরি হয়, মূল্য ইত্যাদির বিবরণ দিতে হইবে।

(২১) ধনুষ তক্‌লি ও ইহার ব্যবহার-পদ্ধতি বুঝাইতে হইবে।

(২২) বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন ধরনের চরকার নমুনা ও উহাদের গুণাগুণের বর্ণনা (চিত্রসহ) দিতে হইবে।

(২৩) আধুনিক চরকাসমূহের নমুনা ও গুণাগুণের বর্ণনা দিতে হইবে।
(২৪) বিভিন্ন ধরনের ধুনকীর নমুনা (চিত্রসহ) দিতে হইবে।
(২৫) বিভিন্ন ধরনের লপেটার নমুনা (চিত্রসহ) দিতে হইবে।

শিল্পবস্তু, মানচিত্র, চার্ট ইত্যাদি এমনভাবে সাজাইয়া রাখিতে হইবে যে কোনো দর্শকের পক্ষে দেখিবার ও পড়িবার কোনো প্রকার অসুবিধা না হয়। শিক্ষকশিক্ষণ কেন্দ্রে সাজাইবার পদ্ধতিও ভাবী শিক্ষককে শিখিতে হইবে। বিন্যাস ও সৌন্দর্যের চর্চাও ইহাতে হইবে। বিদ্যালয়ের শিল্পপরিবেশ-রচনা উত্তম হইলে ইহার প্রভাব পল্লীবাসীর উপর বিস্তার লাভ করিবে। লোক-দেখানো সাময়িক প্রদর্শনীর বদলে বিদ্যালয়সমূহে এরূপ মিউজিয়ম গড়িয়া উঠিলে লোকশিক্ষার ব্যাপকতর পথও ক্রমশঃ প্রশস্ত হইবে।

সংবাদপত্রের বিবরণ সংগ্রহ

সাময়িক সংবাদপত্রে কার্পাস, শণ, পশম, রেশম ও শিল্পযন্ত্রাদি সম্পর্কে যে সকল সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সেগুলি শিল্পবিশারদ সংগ্রহ করিবেন এবং বিদ্যার্থিগণকে পড়িয়া শুনাইবেন। কার্পাসবিজ্ঞান-শিক্ষার সহায়ক বিবরণগুলি সংগ্রহালয়ে সুবিন্যস্তভাবে সাজাইয়া রাখিবেন যাহাতে বিদ্যার্থীরা অবকাশসময়ে ঐগুলি পড়িতে পারে।

শিক্ষানৈতিক বয়নশিল্প, নক্সা ও কলাকৌশল

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ মনোরম নক্সার ও বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রাচীন ও আধুনিক বয়নপদ্ধতি প্রচলিত আছে। শিল্পশিক্ষা-ব্রতিগণ উদ্যোগী হইলে নক্সা সংগ্রহ ও বিভিন্ন আঙ্গিক সম্বন্ধে জ্ঞান অঙ্কনের সাহায্যে সংগ্রহালয়ের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিতরণ করিতে পারেন। এইভাবে ভারতীয় কার্পাসশিল্পের ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য প্রচারও শিল্পশিক্ষাব্রতীর করণীয়।

ইউরোপের যে-সকল দেশ গৃহশিল্পকে নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে স্থান দিতে সমর্থ হইয়াছে সেই-সকল দেশের শিক্ষাব্রতীগণ সযত্নে প্রাচীন নক্সা ও কলাকৌশল সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। সেই গবেষণার ফল শিক্ষাশিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে দেশময় প্রচারলাভ করিতেছে। আধুনিক নক্সার উপরও প্রাচীন লোকশিল্পের নক্সার প্রভাব নগণ্য নহে।

উপযুক্ত শিল্পশিক্ষাপদ্ধতিসম্মত উপায়ে কার্পাসবিজ্ঞানের চর্চা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইলে ইহার উপকারিতা বিদ্যার্থী ও তাহাদের অভিভাবক সকলেই বুঝিতে পারেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের নিত্যব্যবহার্য বস্ত্র তথা কার্পাস-বিজ্ঞানের চর্চায় দেশের শিক্ষাশিল্পও সমৃদ্ধ হইতে পারে।

জাতির জনকের বুনিয়াদি-শিক্ষা-পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ এই পথেই সম্ভব।